আধুনিক ইউরোপ

[১৮১৫—১৯৩৯]

অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
শ্যামল সেন

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা পঁচিশ ন. প.

ভূমিকা

আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে লিখিত এই বইখানি ওয়াটার্লু-যুদ্ধ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত ১২৪ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্য-বিস্তার এবং সমস্ত মহাদেশে হস্তক্ষেপ ছিল ইউরোপীয় রাজনীতির বিশেষত্ব। চীন, জাপান, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাজনীতির প্রভাব এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বইখানি যাহাতে সাধারণ পাঠক এবং বি. এ. পরীক্ষার্থী উভয়েরই কাজে লাগে সেইভাবে লিখিত হইয়াছে।

বইটি লেখায় নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হইয়াছে এবং কেটেলবির A History of Modern Timesএর ষ্টাইল অনুসরণ করা হইয়াছে—

(১) Crane Brinton, John Christopher and Robert Lee Wolff —Modern Civilisation.

(২) R. R. Palmer—A History of Modern World.

(৩) Maurice Bruce—The Shaping of the Modern World. (1870—1939)

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আধুনিক ইউরোপ

ওয়াটার্লু হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভিয়েনা কংগ্রেস

ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিল। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই ইউরোপের জনসাধারণের মনে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই দাবীর প্রকাশ হইতেছিল দুইটি ধারায়—প্রথমতঃ, যে সব জাতি নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিল, তাহারা চাহিতেছিল গণতান্ত্রিক অধিকার। যেমন, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড; দ্বিতীয়তঃ, যে সব জাতি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছিল অথবা বিভিন্ন জাতি এক সরকারের অধীন হইয়াছিল তাহারা চাহিতেছিল জাতীয় রাষ্ট্র। ইতালি এবং জর্ম্মান জাতি বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল, উহাদের বেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঐক্য সাধনের রূপ ধারণ করিল। আবার, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের বহু বিভিন্ন জাতি জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিল।

ইউরোপের বৃহৎ শক্তিরা গণতান্ত্রিক এবং জাতীয় আন্দোলনে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন সঙ্ঘশক্তি ছাড়া এই দুই আন্দোলনের গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তখন প্রথম ফ্রান্সিস। তাঁহার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেটারনিক। মেটারনিকের পরামর্শে ফ্রান্সিস ভিয়েনায় ইউরোপীয় রাজাদের এক কংগ্রেস আহ্বান করিলেন। কংগ্রেসে অভ্যাগত রাজকীয় অতিথিসেবায় ... লক্ষ

পাউণ্ড ব্যয় হইল। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিলেন মেটারনিক। উপস্থিত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার, প্রুশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, ফ্রান্সের তালের‍ঁা, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ওয়েলিংটন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাস্‌লরিগ। বৃটিশ প্রতিনিধিদের পিছনে তাঁহাদের পার্লামেণ্টের পূর্ণ সমর্থন ছিল না, তা ছাড়া অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ মতানৈক্যও ছিল না। ফলে মেটারনিক এবং আলেকজাণ্ডার প্রকৃতপক্ষে ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিলেন। তালের‍ঁার কূটনীতি ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রথম কাজ হইল ওয়াটার্লু যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের রাজ্যের অংশ কাটিয়া বিজেতাদের মধ্যে বিতরণ। দ্বিতীয় কাজ, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন। তৃতীয় কাজ, যেখানে যতটা সম্ভব প্রাক্ বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন।

ওয়াটার্লু যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় সাধন করিয়াছিল ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া এবং কতকাংশে সুইডেন। তাহাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হইল এইরূপ—

(১) রাশিয়াকে কেন্দ্রীয় পোলাণ্ড দেওয়া হইল। তবে সর্ত্ত হইল এই যে পোলাণ্ড রাশিয়ার প্রদেশ হইবে না, স্বতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজ্য হইবে এবং রাশিয়ার যিনি জার থাকিবেন তিনিই পোলাণ্ডের রাজা হইবেন। তুরস্কের নিকট হইতে কয়েকটি ছোট জায়গাও রাশিয়া পাইল। সুইডেনের নিকট হইতে ফিনল্যাণ্ড নিয়া রাশিয়াকে দেওয়া হইল।

(২) প্রুশিয়াকে দেওয়া হইল সাক্সোনির কতকাংশ, ফ্রান্সের সম্পদশালী রাইন প্রদেশ আলসাস এবং লোরেন। সুইডেনের নিকট হইতে পশ্চিম পোমেরানিয়া নিয়া প্রুশিয়াকে দেওয়া হইল।

(৩) অষ্ট্রিয়ার যে সমস্ত অংশ অপহৃত হইয়াছিল তার মধ্যে বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ জার্ম্মেনীর কয়েকটি ছোট জায়গা ভিন্ন সমস্ত ফেরৎ দেওয়া হইল। উহাদের পরিবর্ত্তে অষ্ট্রিয়া পাইল ভেনেসিয়া।

(৪) ইংলণ্ড কোন বৃহৎ ভূখণ্ড চাহিল না। ইংলণ্ড ইতিমধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌ শক্তি এবং বাণিজ্যপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সে চাহিল কয়েকটি ছোট দ্বীপ—ভূমধ্য সাগরের মাঝখানে মাণ্টা, জার্ম্মেনীর বহির্গমনের মুখে হেলিগোলাণ্ড এবং আড্রিয়াতিক সাগরের প্রবেশ পথে আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ—এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ। ইঙ্গ ভারত বাণিজ্যপথে উত্তমাশা অন্তরীপেব গুরুত্ব অসামান্য। সুয়েজ খাল নির্ম্মিত হইলে মাণ্টার গুরুত্ব হইবে অসাধারণ। জার্ম্মেনী বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলে উহার নির্গমপথে এল্‌ব নদীর মুখে থাকিবে বৃটিশ হেলিগোলাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া সমুদ্রের অধীশ্বরী হইতে চাহিলে তাহাকে আড্রিয়াতিক সাগরপথে বাহির হইতে হইবে এবং সেখানে পাহারা দিবে বৃটিশ আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। ইংলণ্ড তখন ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়িতেছে, এই সংগ্রামে তাহাকে সমর্থন করিয়া ঘোষণা জারী করিতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সম্মত হইল।

(৫) সুইডেন রাশিয়াকে ফিনল্যাণ্ড এবং প্রুশিয়াকে পশ্চিম পোমেরানিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাইল সমগ্র নরওয়ে।

(৬) স্যাক্সোনির আয়তন অনেক কমিয়া গেল কিন্তু উহার রাজা থাকিতে দেওয়া হইল।

(৭) ওয়েষ্ট ফেলিয়া রাজ্য তুলিয়া দেওয়া হইল।

(৮) ওয়ারস' র গ্রাণ্ড ডিউকডম তুলিয়া দেওয়া হইল।

(৯) সুইজারল্যাণ্ড পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

(১০) পোপ ইতালিতে ফিরিয়া গেলেন।

(১১) ফ্রান্স, স্পেন এবং নেপল্‌সের সিংহাসনে বুর্ব্বন রাজবংশের পুনরায় আরোহণ অনুমোদিত হইল।

(১২) ফ্রান্সকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিজেতাদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু তাহা গৃহীত হইল না। আলসাস এবং লোরেন এই দুটি প্রদেশ ভিন্ন আর কোন জমি ফ্রান্সকে হারাইতে হইল না। কিন্তু ফ্রান্স

আবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারে এই আতঙ্কও দূর হইল না। ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব্ব এবং দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইল। উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে বেলজিয়াম এবং হলাণ্ড সংযুক্ত করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠিত হইল এবং দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তের সার্দ্দিনিয়া পিদমোন্ত রাজ্যটিকে আরও শক্তিশালী করা হইল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত রাজনীতিক দিক হইতে তিন কারণে গুরুত্বপূর্ণ—

(১) পবিত্র রোমসাম্রাজ্যের অবসানের সরকারী স্বীকৃতি,

(২) ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার অভ্যুদয়,

(৩) সুইডেনকে বাল্টিক উপসাগরের অপর তীরে ঠেলিয়া দিয়া উহার প্রভাব হ্রাস।

পবিত্র চুক্তি—ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি যাহাতে অব্যাহত থাকিতে পারে তার জন্য ভিয়েনা কংগ্রেসে দুইটি প্রস্তাব হইল—পবিত্র চুক্তি সম্পাদন এবং একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন।

জার আলেকজাণ্ডার একটি পবিত্র চুক্তির (Holy Alliance) প্রস্তাব করিলেন। ব্যারনেস ভন ক্রুডেনার নাম্নী এক ধার্ম্মিক মহিলার প্রতি আলেকজাণ্ডার শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া জার ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। "পবিত্র চুক্তি"র মূল কথা ছিল এইরূপ—

(১) চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা "পবিত্র ধর্ম্মে"র নির্দ্দেশে সমুদয় রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মের পবিত্র ত্রয়ীর নামে সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন।

(২) চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং এক বিরাট খ্রীষ্টান পরিবারের সদস্যরূপে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন।

(৩) চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা কেহ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিবেন না, পারস্পরিক সেবা বলপ্রয়োগের স্থান গ্রহণ করিবে।

(৪) চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাজারা নিজের দেশের সকল লোককে এক-পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, নিজেকে প্রজাদের পিতৃস্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন, রাজা প্রজাদের নেতৃত্ব করিবেন এবং ধর্ম্ম, ন্যায় ও শান্তি রক্ষা করিবেন।

(৫) চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের আচরণ এমন হইবে যে সমস্ত বিশ্বের লোক যেন বুঝিতে পারে ঈশ্বর ছাড়া আর কোন সার্ব্বভৌম শক্তি নাই; সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী মানুষ নহে, ঈশ্বর স্বয়ং।

পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্য তুরস্কের সুলতান আমন্ত্রিত কারণ তিনি খ্রীষ্টান নহেন। রোমের পোপকেও ডাকা হয় নাই। ভিয়েনা কংগ্রেসে আমন্ত্রিত প্রত্যেক দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল, কেহ উৎসাহের সঙ্গে, কেহ বা মামুলী দায় সারা গোছের। আপত্তি করিল শুধু ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের প্রিন্স রিজেন্ট এক পত্রে জানাইলেন যে পবিত্র চুক্তির ভাল ভাল কথার প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু এত অস্পষ্ট চুক্তিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করিতে পারেন না এই কারণে যে এই ধরণের দলিলে রাজার স্বাক্ষরের সঙ্গে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর স্বাক্ষর নিতে হয়, এবং কোন মন্ত্রী এত অস্পষ্ট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে রাজী হইবেন না।

রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার রাজারা পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষর করিবার পরে ১৮১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্যারিসের নিকটে মিত্রশক্তির এক বিরাট সৈন্য সমাবেশে উহার কথা ঘোষণা করা হইল।

পবিত্র চুক্তি আসলে কোন সন্ধিপত্র নহে, উহা ইউরোপীয় কয়েকজন রাজার সদিচ্ছা সম্বলিত এক ঘোষণাপত্র মাত্র। চুক্তিতে কয়েকজন রাজার আন্তরিকতা বা উদারতার অভাব ছিল না। জার আলেকজাণ্ডার বলিয়াছিলেন যে রাজারা এই চুক্তি মানিয়া চলিলে প্রজাদের সংবিধানের দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। তবে আলেকজাণ্ডার পবিত্র চুক্তির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, আর কোন রাজা ততটা করেন নাই। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাস্‌লরিগ পবিত্র চুক্তিকে ননসেন্স এবং মেটারনিক ফাঁকা শব্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কোন কোন রাজা প্রকাশ্যে চুক্তিতে

স্বাক্ষর করিলেও অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এই চুক্তি মারফৎ আলেকজাণ্ডার সমগ্র ইউরোপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন, এই সন্দেহ অনেকের মনে জাগিয়াছিল। তুরস্কের সুলতান খ্রীষ্টান নহেন এই কারণে তাঁহাকে বাদ দেওয়াও অনেকে পছন্দ করেন নাই। তুরস্কের রাজ্য অক্ষত রাখিতে চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের দায়িত্ব না থাকিলে রাশিয়ার সুবিধা সবচেয়ে বেশী। কনষ্টান্টিনোপলের উপর রাশিয়ার শ্যেন দৃষ্টি অবিদিত ছিল না এবং তাহা লাভ করিতে হইলে তুরস্কের ধ্বংস প্রয়োজন।

পবিত্র চুক্তি কোন সময়েই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। উহা কাগজপত্রেই সমাহিত রহিয়া গেল। বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে এই চুক্তি প্রযুক্ত না হইলেও আদর্শ হিসাবে উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

ইউরোপীয় কনসার্ট—মেটারনিক ছিলেন বাস্তববাদী। চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি অষ্ট্রিয়ার ন্যায় বিরাট সাম্রাজ্যের রাজনীতির নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি ভিয়েনা কংগ্রেসকে বাস্তবরূপ দান করিলেন। পবিত্র চুক্তির তর্কবিতর্কে দুই মাস সময় দিয়া ১৮১৫ সালের নভেম্বর মাসে মেটারনিকের উদ্যোগে এক চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হইল। উহাতে স্বাক্ষর করিল অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া এবং ইংলণ্ড।

ভিয়েনা চুক্তি যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা দেখিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। এইরূপ একটি সংগঠন থাকিলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা বাড়িবে, ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী রাজারাও ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ওয়াটালু যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপীয় কনসার্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী জাতিসঙ্ঘের অগ্রদূত। কেহ কেহ এই কনসার্টের বাঙ্গলা করিয়াছেন—সাঙ্গীতি। ইহার সঙ্গে সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক নাই। স্থির হইল মাঝে মাঝে কনসার্টের বৈঠক বসিবে. উহাতে ইউরোপের সাধারণ সমস্যা আলোচিত হইবে। বৈঠকে ভিয়েনা চুক্তি স্বাক্ষরকারী চতুঃশক্তি উপস্থিত থাকিবেন। রাজারা নিজেরা আসিতে না পারিলে মন্ত্রীদের পাঠাইবেন।

এতদিন ইউরোপীয় কূটনীতি বিভিন্ন রাজ্যের নিজ নিজ দল ও শক্তি অনুসারে চালিত হইত। এইবার কনসার্ট মারফৎ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেষ্টা আরম্ভ হইল।

কনসার্টের প্রথম কংগ্রেস বসিল ১৮১৮ সালে বেলজিয়ামের এ-লা-চাপেল সহরে। এই কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ। ওয়াটার্লু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্সে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছিল। এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হইল—ফ্রান্স হইতে সেনাদল সরাইয়া আনা হইবে এবং তাহাকে কনসার্টের সদস্য করা হইবে। পঞ্চশক্তির এই সমন্বয় অতঃপর পঞ্চশক্তি ইউনিয়ন নামে অভিহিত হইল।

পঞ্চশক্তি ইউনিয়ন এত শক্তিশালী হইল যে তাহারা ইউরোপের সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। সুইডেন চুক্তির ডেনমার্ক এবং নরওয়ে সংক্রান্ত সর্ত্ত মানিতেছিল না ; ইউনিয়ন তাহাকে উহা মানিতে আদেশ দিল। মোনাকার শাসকের বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ আসিল, ইউনিয়ন তাহাকে ভালভাবে গভর্ণমেণ্ট চালাইতে আদেশ দিল। হেসের শাসক 'রাজা' উপাধি চাহিতেছিলেন, ইউনিয়ন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। ব্যাভেরিয়ায় উত্তরাধিকার নিয়া বিরোধ চলিতেছিল। ইউনিয়ন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিল। সমগ্র ইউরোপ পঞ্চশক্তির শক্তিতে চমৎকৃত হইল। ছোট দেশগুলি খুসী হইল না। বৃহৎ শক্তিদের হস্তক্ষেপে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই দাপট বেশীদিন টিঁকিল না। পঞ্চশক্তির নিজেদের মধ্যেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে লাগিল। এই সংঘাতই শেষ পর্য্যন্ত কনসার্টের ধ্বংস ডাকিয়া আনিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলি নিয়া প্রথম মতবিরোধ দেখা দিল। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের অধীনস্থ দেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ইংলণ্ড উহাদের স্বাধীনতা সরকারীভাবে স্বীকার করে নাই কিন্তু উহাদের সঙ্গে তাহার বেশ বড় বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই উপনিবেশগুলি স্পেনকে আবার কি করিয়া ফিরাইয়া

দেওয়া যায়, এই প্রশ্ন উঠিলে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে ক্যাসেলরিগ বলিলেন যে, উহাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া কোন ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয় তবেই ইংলণ্ড তাহা মানিবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল—উত্তর আফ্রিকার জলদস্যুদের নিয়া। উত্তর আফ্রিকা হইতে জলদস্যু ভূমধ্য সাগরে আসিত এবং দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও লুঠতরাজ চালাইত। জলদস্যুদের উপদ্রবে অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া উহাদিগকে দমনের প্রস্তাব করিল। যৌথভাবে জলদস্যু দমনের প্রস্তাবও হইল। কিন্তু ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজ ঢুকিতে দিতে ভীষণ আপত্তি জানাইল। প্রতিবাদে ইংলণ্ড দাস ব্যবসায় দমনের নামে সমুদ্রে ভিন্ন দেশের জাহাজ আটক করিয়া তল্লাসী চালাইবার অনুমতি চাহিলে অন্যশক্তিরা আপত্তি করিল।

প্রথম কংগ্রেস এইভাবে শেষ হইল। পঞ্চশক্তির ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগাইতেছিলেন মেটারনিক। জর্ম্মান জাতি তখন ৩৯টি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত এবং এক দুর্ব্বল জর্ম্মান কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। অষ্ট্রিয়া এই কনফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট। জর্ম্মান কনফেডারেশনের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক উভয়বিধ আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতেছিল। মেটারনিক এই আন্দোলন দমনে পঞ্চশক্তি ইউনিয়নকে কাজে লাগাইলেন। ইংলণ্ড ইহাতে প্রতিবাদ জানাইল।

দ্বিতীয় কংগ্রেস আহূত হইল ১৮২০ সালে অষ্ট্রিয়ার ট্রোপ সহরে। ঐ বৎসর স্পেন, পর্টুগাল এবং নেপলসে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই তিনদেশেরই গণতন্ত্রবাদী বিপ্লবীরা তাহাদের "আইনসঙ্গত" রাজাদের সিংহাসন হইতে তাড়াইয়াছে। ১৮১২ সালে স্পেনের গণতন্ত্রবাদীরা একটি সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সংবিধানের আদর্শে সংবিধানের দাবী অন্যান্য দেশেও প্রবল হইয়া উঠিল।

পঞ্চশক্তির রাজারা এই তিন বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাব অবলম্বন করিলেন। সকলেই বিদ্রোহের নিন্দা করিলেন কিন্তু কোন সম্মিলিত কর্ম্মপন্থা

অবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্পেনে বিপ্লববাদ যে রূপ গ্রহণ করিল তাহাতে রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার ভয় পাইলেন সবচেয়ে বেশী। তিনি বলিলেন,—এই বিপ্লব সফল হইতে দিলে খ্রীষ্টান রাজ্য বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। আলেকজাণ্ডার প্রস্তাব করিলেন যে বিপ্লব দমন করিয়া বুর্ব্বন রাজা ফার্দ্দিনান্দকে আবার সিংহাসনে বসাইবার জন্য তিনি ১৫ হাজার সৈন্য স্পেনে পাঠাইতে প্রস্তুত। এই বিরাট রুশ সেনাবাহিনীকে স্পেনে যাইতে হইলে অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; ইহারা কেহই নিজ নিজ দেশে রাশিয়ার সামরিক শক্তি এত বিরাট ভাবে জাহির করিতে দিতে রাজী হইল না। মেটারনিক স্পেন বিপ্লবকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—তার জন্য রুশ সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন নাই। অষ্ট্রিয়া বলিল,—সেখানে পঞ্চশক্তির হস্তক্ষেপ উচিত হইবে না।

এইবার বিদ্রোহ দেখা দিল নেপলসে। মেটারনিক তখন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন নেপলসে বিপ্লবীরা জয়যুক্ত হইলে ঐখানেই থামিবে না, আরও উত্তরদিকে বিপ্লববাদ এবং গণতন্ত্র প্রসারিত হইবে। অষ্ট্রিয়া বিপন্ন হইবে। মেটারনিক নেপলসে সৈন্য পাঠাইতে চাহিলেন। ফ্রান্স এবং রাশিয়াকে মেটারনিক স্পেনে সৈন্য পাঠাইতে দেন নাই। এবার তাহারা অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক নেপলসে সৈন্য প্রেরণে আপত্তি করিয়া বসিল। মেটারনিক কংগ্রেসের বৈঠক ডাকিলেন। ইহাই ১৮২০ সালের ট্রোপ কংগ্রেস।

ট্রোপ কংগ্রেসে প্রথমেই একটি নীতিগত প্রস্তাব আনা হইল। উহাতে বলা হইল—যে সংবিধান আইনসঙ্গত রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইবে তাহা পঞ্চশক্তি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে না; পঞ্চশক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন দেশে বিপ্লবের ফলে গভর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং ঐ বিপ্লব অন্য শক্তিদের পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত হইলে অন্য শক্তিরা বিতাড়িত রাজাকে ফিরাইয়া আনিবে, তার জন্য প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিবে। যে দলিলে এই তিন নীতির উল্লেখ করা হইল তাহাকে বলা হয়

ট্রোপ প্রোটোকোল। অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং রাশিয়া ইহাতে স্বাক্ষর করিল, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড স্বাক্ষর করিল না। ইংলণ্ড জানাইয়া দিল যে তার নিজের দেশে এরূপ অবস্থায় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ সে নিজেও পছন্দ করে না। সুতরাং অন্য দেশে ঐ নীতির প্রয়োগে ইংলণ্ড রাজি নয়। মতভেদ এত তীব্র যে মেটারনিক ট্রোপ কংগ্রেস মুলতুবী করিতে বাধ্য হইলেন।

পর বৎসর মুলতুবী কংগ্রেসের বৈঠক বসিল লাইবাক সহরে। এইবার মেটারনিক নেপ্‌লসে হস্তক্ষেপ করিয়া রাজা ফার্দ্দিনান্দকে সিংহাসনে আবার বসাইবার জন্য সৈন্য প্রেরণের অনুমতি আদায় করিয়া নিলেন। অতঃপর নেপ্‌লস বিদ্রোহ দমন করিতে কয়েক সপ্তাহের বেশী লাগিল না।

১৮২২ সালে ভেরোনায় আবার কংগ্রেস আহূত হইল। স্পেন বিপ্লব তখনও চলিতেছে। ইতিমধ্যে গ্রীকরা তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের দাবী—তুরস্কের কবলমুক্ত স্বতন্ত্র গ্রীকরাষ্ট্র। জার আলেকজাণ্ডার বিদ্রোহী গ্রীকদের সাহায্য করিতেছিলেন। তুরস্কের ধ্বংস তাঁহার কাম্য।

ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া উভয়েই তুরস্ক ধ্বংসের বিরুদ্ধে ছিল। অষ্ট্রিয়ার আশঙ্কা তুরস্ক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে রাশিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশে পরিণত হইবে। ইংলণ্ডের আশঙ্কা তুরস্ক ধ্বংস হইলে দার্দ্দানেলিস প্রণালী রাশিয়ার হাতে পড়িবে, তখন ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রবেশে বাধা দান অসম্ভব হইবে।

রাশিয়া দাবী করিল—নেপ্‌লসে অষ্ট্রিয়া একা যে ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, গ্রীসে তাহাকেও তাহাই করিতে দেওয়া হউক। ভেরোনা কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে গ্রীস, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ভেরোনা কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা ইংলণ্ডের ছিল না, কিন্তু গ্রীস সমস্যার সিদ্ধান্ত তুরস্কের বিরুদ্ধে গেলে ইংলণ্ডের ক্ষতি, এই আশঙ্কায় বৃটিশ প্রতিনিধি ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত হইলেন। ওদিকে স্পেনের সিংহাসনচ্যুত বুর্ব্বন রাজা সপ্তম ফার্দ্দিনান্দ ফ্রান্সের বুর্ব্বন সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফ্রান্স স্পেনে সৈন্য পাঠাইবার দাবী তুলিল। ইংলণ্ড ফ্রান্সের

দাবীতে আপত্তি জানাইল। মতবিরোধ এত চরমে উঠিল যে ইংলণ্ড স্পেন সমস্যা আলোচনা হইতে সরিয়া গেল। ভেরোনা কংগ্রেসের মতভেদের ফলে ইউরোপীয় কনসার্ট ভাঙ্গিয়া গেল।

১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী সৈন্য স্পেনে ঢুকিল। রাজা ফার্দ্দিনান্দকে আবার সিংহাসনে বসাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। এইবার আবার দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া উহাদিগকে পুনরায় স্পেনের অধীনস্থ করিবার প্রশ্ন দেখা দিল। তখন ক্যাসলরিগের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। মনরো আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্ট মনরো তাঁর বিখ্যাত মনরো নীতি ঘোষণা করিয়া জানাইলেন যে ইউরোপীয় কোন শক্তি আমেরিকান মহাদেশে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে আমেরিকা তাহা সহ্য করিবে না। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড সদ্যমুক্ত স্পেনীয় উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া স্পেনে ফরাসী হস্তক্ষেপের প্রত্যুত্তর দিল।

১৮২৫ সালে জার আলেকজাণ্ডার প্রাচ্য সমস্যা আলোচনার জন্য সেণ্ট পিটার্সবার্গে দুইবার বৈঠক ডাকিলেন। আলোচনা হইল কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হইল না। তখন আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করিলেন, তিনি তাঁহার নিজ স্বার্থ অনুসারে প্রাচ্য সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার এই একমাত্র পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল। আবার সুরু হইল স্ব স্ব প্রধান রাজ্যের শক্তির ভারসাম্যের (ব্যালান্স অফ পাওয়ার) কূটনীতি।

ইউরোপীয় কনসার্ট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ—

(১) অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্সের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষ্যা,

(২) পররাজ্যে হস্তক্ষেপের যে নীতি মেটারনিক কনসার্টকে দিয়া অনুমোদন করাইয়াছিলেন তাহা সমর্থনে ইংলণ্ডের অনিচ্ছা,

(৩) কনসার্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্ঘ ছিল না উহা ছিল রাজাদের জোট, তার পাঁচ জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন স্বৈরাচারী,

(৪) এই স্বেচ্ছাচারী রাজাদের জোটকে বিপ্লব দমনের নামে যে কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে সমগ্র ইউরোপে এক অসহ্য স্বৈরাচারের সৃষ্টি হইবে,—ইংলণ্ডের এই আশঙ্কা,

(৫) কনসার্টের সদস্যদের মধ্যে সর্ব্বসম্মত সাধারণ রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক নীতির অভাব,

(৬) গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের যে চ্যালেঞ্জ ফরাসী বিপ্লবের পর সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহা রোধ করিতে তিন স্বৈরাচারী রাজার দুরাশা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১৮১৫—৫০)

১৮১৫ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমস্ত ইউরোপ আলোড়িত করিয়াছে। কোন কোন দেশে আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এই যে অতঃপর কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আগের মত রাজদরবারে বা রাজার গোপন মন্ত্রণালয়ে হইত না, হইত সংবাদপত্রে এবং প্রকাশ্য রাজপথে। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর হইতে ১৮৪৮-এর ফরাসী-বিপ্লব পর্য্যন্ত রাজারা নব ভাব-ধারা এবং নূতন রাজনীতি ঠেকাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে রাজায় প্রজায় লড়াই এই ৩৫ বছরের ইতিহাসের বিশেষত্ব।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন এবং রাশিয়া জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র অর্থাৎ একজাতির এক রাষ্ট্র ছিল। এই সব দেশের জনসাধারণের প্রধান দাবী ছিল—

(১) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার,

(২) প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেণ্ট,

(৩) মেজরিটি গবর্ণমেণ্ট,

(৪) স্বাধীন সংবাদপত্র,

(৫) ধর্ম্মীয় সহিষ্ণুতা।

জার্ম্মানী এবং ইতালি ছিল জাতি হিসাবে এক, কিন্তু বহু স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। এই দুই দেশের আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, অর্থাৎ অখণ্ড জার্ম্মেনী এবং অখণ্ড ইতালি। এই দুই দেশে জাতীয়তাবাদ ঐক্যসাধনের রূপ ধরিল।

বেলজিয়াম, আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, গ্রীস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বহু দেশের জাতিরা অপর দেশের অধীন ছিল। ইহাদের দাবীও ছিল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, কিন্তু ইহাদের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ রূপ ধরিল বিচ্ছেদের।

কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একই সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনও চলিয়াছিল। যেমন, প্রুশিয়া।

ফ্রান্স

ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবে নিহত বুর্ব্বন রাজা ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা। নূতন রাজা শাসনভার গ্রহণ করিয়াই প্রজাদের এই কয়টি দাবী মানিয়া নিলেন—

(১) নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্ট,

(২) ব্যক্তিগত সমানাধিকার,

(৩) ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা,

(৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

সদিচ্ছা সত্ত্বেও রাজা সাফল্যলাভ করিতে পারিলেন না। প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত ও পাদ্রীরা তাঁহার উদারতাপূর্ণ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। সঙ্ঘবদ্ধ অভিজাত ও পাদ্রীরা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন কংগ্রিগেসন। উহার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির পথ ধরিল।

কারবোনারি নামে এক বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি তখন ইতালি, স্পেন ও জার্ম্মেনীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সেও উহার শাখা স্থাপিত হইল। সৈন্যদলেও এই গুপ্ত সমিতির প্রভাব বিস্তৃত হইল।

অষ্টাদশ লুইয়ের জীবিতকালে কোন বড় রকমের গোলযোগ ঘটিল না। তিনি শান্তিতে মারা গেলেন।

সিংহাসনে বসিলেন দশম চার্লস। এই ব্যক্তির সম্বন্ধেই ওয়েলিংটন লিখিয়াছিলেন—"রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা বলিয়া কোন বস্তু নাই। দ্বিতীয় জেমসের পরিণতি জানিয়াও ইনি পাদ্রীদের দ্বারা, পাদ্রীদের মারফৎ, পাদ্রীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিতেছেন।" বিপ্লবের সময় যাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, তাহারা আসিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার হইয়া বসিল। জেসুইট পাদ্রীরাও আসিয়া জুটিলেন। স্বাধীন নির্ব্বাচন বন্ধ হইল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রায় বন্ধ হইল। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সমানাধিকার খর্ব্ব হইল। অসন্তোষ চরমে উঠিল ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে। প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের নিয়া পলিগনাক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। চারিটি দমনমূলক অর্ডিনান্স জারী হইল। এইবার জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গেল। প্যারিসের রাস্তা এবং গলি তিন দিন ব্যারিকেড দিয়া আটকাইয়া রাখা হইল। ফ্রান্সে তখন বাস চলিতে সুরু করিয়াছে। এই বাসগুলিকে ব্যারিকেড হিসাবে ব্যবহার করা হইল। সৈন্যদলের অনেক রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী দলে যোগ দিল। অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া রাজা আপোষের প্রস্তাব করিলেন কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অঝোর ধারায় কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা দশম চার্লস প্রাণ বাঁচাইতে শেরবুর্গ বন্দরে জাহাজে উঠিয়া ইংলণ্ড রওনা হইলেন। দ্বিতীয় বার বুর্ব্বন বংশ ফরাসী সিংহাসন হইতে অপসারিত হইল।

এবার সিংহাসনে বসিলেন ষোড়শ ও অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা লুই ফিলিপ। ইহার পিতা লুই ফিলিপ ফরাসী বিপ্লবে গিলোটিনে নিহত হইয়াছিলেন। রাজাসনে বসিয়াই ফিলিপ নিজেকে সাধারণ নাগরিকরূপে জাহির করিতে সুরু করিলেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে ফরাসী রাজার করমর্দ্দন অচিন্ত্যনীয় ছিল।

ফিলিপের নিকট যে কোন ডেপুটেসন আসিলেই তিনি তাহাদের সঙ্গে করমর্দ্দন আরম্ভ করিলেন। বাহিরে গেলে গায়ে একটি জাতীয় পতাকা জড়াইয়া লইতেন। ছেলেদের পাবলিক স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দেশের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট অংশের সমর্থন তিনি লাভ করিতে পারিলেন না। প্রজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে গিয়াছেন বলিয়া অভিজাতেরা নূতন রাজার বিরুদ্ধে গেল। পাদ্রীদের আদেশে চলিতে অনিচ্ছুক বলিয়া তাহারাও রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। প্রজাতন্ত্রীরা লক্ষ্য করিল যে রাজা বাহিরে প্রজাদের অভিপ্রায় মানিয়া চলিবার ভান দেখাইতেছেন, আসলে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারেই শাসন চালাইতে চান। দেশে অর্থনৈতিক অসন্তোষের অন্ত ছিল না। উহা কাজে লাগাইতে সুরু করিল নবগঠিত সোসালিষ্ট দল। ফ্রান্সে এই সময়ে সোসালিষ্ট সাহিত্যের বন্যা বহিয়াছিল। লুই ব্লাঁ সোসালিষ্ট কর্ম্মসূচী দিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া বুর্জ্জোয়া প্লুটোক্রাসির বিরুদ্ধে সমাজ বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। বিপ্লবের পর হইতে ফরাসী জনসাধারণ বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয়ের অনিশ্চতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া নেপোলিয়ানকে স্মরণ করিতে লাগিল।

লুই ফিলিপের শাসনকালে নানাদিকে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। প্যারিসে কয়েকবার দাঙ্গা হইয়া গেল। অনেক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। রাজা এবং রাজপরিবারের লোকদের জীবননাশের চেষ্টাও কয়েকবার হইল। প্যারিস ছাড়া আরও অনেকগুলি সহরে প্রজা বিদ্রোহ ঘটিল। মন্ত্রীরা সারাটা দেশ শোষণ করিয়া নিজেরা বড়লোক হইতেছে দেখিয়া সাধারণ লোক চটিয়া আগুন হইল।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুরু হইল দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব। প্রথমেই বিপ্লবের শ্লোগান হইল—তাড়াও মন্ত্রীদের। এই বিপ্লবে প্রজারা বিভক্ত হইল দুই দলে—প্রজাতন্ত্রী বা রিপাবলিকান এবং সোসালিষ্ট। লুই ফিলিপ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হইল। অস্থায়ী রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট গঠিত

হইল। সোসালিষ্ট দলের প্রধান শক্তি ছিল শ্রমজীবী সম্প্রদায়। তাহারা রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সোসালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গঠনে অগ্রসর হইল। সুরু হইল রিপাবলিকান ত্রিবর্ণ পতাকা এবং সোসালিষ্ট লাল পতাকার সংগ্রাম। রিপাবলিকানদের সমর্থক ছিল কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই সংগ্রামে সোসালিষ্টরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন তখন ইংলণ্ডে। বিপ্লবের সংবাদ পাইয়াই তিনি সিংহাসন অধিকারের আশায় প্যারিসে আসিলেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন,—এখনও সময় হয় নাই, রিপাবলিকান এবং সোসালিষ্টদের লড়াই আরও কিছুদিন চলুক। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের চারিটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র তাঁহাকে জাতীয় পরিষদে (National Assembly) নির্ব্বাচিত করিল। লুই নেপোলিয়ন আসিলেন না। অতঃপর আরও পাঁচটি কেন্দ্র তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিল। নেপোলিয়ান আসিয়া পরিষদে আসন গ্রহণ করিলেন। তিন মাস পর তিনি দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

চারি বৎসর বাদে লুই নেপোলিয়ন নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করিলেন। প্রথম নেপোলিয়নের পুত্র দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ১৮১১ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত রোমের রাজা ছিলেন। লুই নেপোলিয়ন হইলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

ইতালি

ইতালি ছিল সাতটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত এবং দুইটি প্রদেশ ছিল অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইতালিয়ান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সার্দ্দিনিয়া পিদমোন্ত, উহার রাজা ছিলেন ইতালিয়ান, সাভয় বংশের ভিক্টর ইমানুয়েল। সার্দ্দিনিয়া পিদমোন্তের পূর্ব্বে ভেনেসিয়া এবং লম্বার্দ্দি ছিল ইতালিয়ান প্রদেশ। উহাদের দক্ষিণে ছিল চারিটি ছোট রাজ্য—পারমা, মোদেনা, তাসকেনি এবং ল্যুক্কা। উহারা ছিল ডিউক শাসিত রাজ্য। পারমার ডাচেস ছিলেন

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পত্নী মেরী লুইস। মোদেনা এবং তাসকেনির ডিউকেরাও ছিলেন অষ্ট্রিয়ান রাজবংশের লোক। উহাদের দক্ষিণে ছিল পোপের রাজ্য, ইতালির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রসারিত একটি সরু লম্বা রাজ্য। উহা ছিল পুরাদস্তুর থিওক্রাটিক। শাসক পোপ নিজে ধর্ম্মগুরু, সমস্ত রাজকর্ম্মচারী পাদ্রী, আইন পোপের হুকুম। ইতালির দক্ষিণাংশে ছিল নেপল্‌স ও সিসিলি রাজ্য। উহার রাজা ছিলেন বুর্ব্বন প্রথম ফার্দ্দিনান্দ।

বিভক্ত ইতালির উপরে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব খুব বেশী ছিল। উহার একটি প্রদেশ এবং তিনটি ডিউকিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব তো ছিলই, তার উপর নূতন পোপ নির্ব্বাচনের সময় মেটারনিক সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে অষ্ট্রিয়ার অনুরাগী পোপই সিংহাসনে বসিতে পারেন। বুর্ব্বন রাজা ফার্দ্দিনান্দও বুঝিয়া নিয়াছিলেন যে অষ্ট্রিয়াকে চটাইয়া তাঁহার পক্ষে গদীতে থাকা অসম্ভব। পিয়াসেনজা, ফেরারা এবং কোমাকিও এই তিন জায়গায় অষ্ট্রিয়ান সৈন্যও মোতায়েন ছিল। একমাত্র সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টের উপর অষ্ট্রিয়ার কোন প্রভাব ছিল না।

এই সব কয়টি রাজ্যেই জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রবল ছিল। নেপোলিয়নের শাসনকালে ইতালির জনসাধারণ ফরাসী যুদ্ধের জন্য টাকা ও লোক জোগাইয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়াটারলু যুদ্ধের পর রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের অসন্তোষ বহিয়া গেল। নেপোলিয়নের শাসনকালে স্বাধীনতা লাভের জন্য ইতালিতে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লব আন্দোলন জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ ধরিল। প্রথম ফার্দ্দিনান্দ সিংহাসনে বসিয়াই সিসিলির স্বায়ত্তশাসন কাড়িয়া নিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে নেপ্‌লসের প্রদেশে পরিণত করিলেন। পুলিশের কড়াকড়ি বাড়িয়া গেল। সংবাদপত্রের উপর সেন্সর বসিল, পাদ্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল, উদার মতবাদ প্রচার অপরাধ হইয়া দাঁড়াইল। পোপের রাজ্যে দুর্নীতির চরম শুরু হইল,

প্রজাদের অধিকার বলিয়া কোন জিনিষ রহিল না। ডিউক শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে মোদেনাতে চরম স্বেচ্ছাচার চলিল। পারমাতে মেরী লুইসের শাসন তবু অনেকটা ভাল রহিল। ভেনেসিয়া এবং লম্বার্ডিতে প্রতিপদে ভিয়েনার হুকুম অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টে অসন্তোষ ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজা প্রথম ভিক্টর ইমান্নয়েল বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম শিক্ষা ছিল জাতি হিসাবে চিন্তাধারার প্রসার। লোকে নিজেদের সিসিলিয়ান নিয়াপলিটান পিদমোণ্টিজ বা ভেনেসিয়ান বলিয়া মনে করিত না, ইতালির যে কোন রাজ্যের লোক নিজেকে ইতালিয়ান বলিয়া পরিচয় দিত। সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক সমিতির নাম ছিল কারবোনারি। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ইতালি হইতে বিদেশী-শাসক বহিষ্কার এবং নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন। অভিজাত, পাদ্রী, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামরিক অফিসার, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক এই গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কারবোনারির শাখা সমগ্র ইতালিতে ছড়াইয়া পড়িল। পরে উহা ইতালির বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছিল।

১৮২০ সালে বিপ্লব আন্দোলন সুরু হইয়া গেল। প্রথম বিদ্রোহ হইল নেপ্‌লসে। অষ্ট্রিয়ান সৈন্য এই বিদ্রোহ দমন করিল। নেপ্‌লস বিদ্রোহ দমনের আগেই পিদমোণ্টে বিদ্রোহ হইল, ভেনিসিয়াতেও বিদ্রোহের সূচনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই দুইটি অষ্ট্রিয়ান প্রদেশ, সুতরাং ওখানকার বিদ্রোহ দমনে অষ্ট্রিয়াকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। বিদ্রোহ দমিত হইল কিন্তু অসন্তোষ রহিয়া গেল।

১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইতালিতেও আসিয়া ধাক্কা দিল। পোপের রাজ্যে, পারমাতে মেরী লুইসের এবং মোদেনাতে ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল। মেরী লুইস এবং ফ্রান্সিস সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন, অষ্ট্রিয়ান সৈন্য আসিয়া আবার তাঁহাদের সিংহাসন ফিরাইয়া দিল। বিপ্লবীরা সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা প্রমাণ করিয়া

দিলেন যে বাহিরের শক্তির সাহায্য ভিন্ন ইতালির কোন রাজা বা ডিউকের পক্ষে প্রজাকে অসন্তুষ্ট করিয়া সিংহাসন রক্ষা সম্ভব নহে।

ইতালির সৌভাগ্য তাহারা উপযুক্ত নেতা লাভ করিয়াছিল। তরুণ বিপ্লবী যোসেফ ম্যাৎসিনি কারবোনারি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি বুঝিলেন বিপ্লব আন্দোলন সফল করিতে হইলে আরও সুস্পষ্ট আদর্শ এবং কর্ম্মসূচী প্রয়োজন। তিনি তরুণ ইতালি সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতি ক্রমে কারবোনারির স্থান গ্রহণ করিল। মাৎসিনি বলিলেন, "বিদ্রোহী জনতার নেতৃত্ব তরুণদের হাতে তুলিয়া দাও, তরুণ প্রাণে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহা তোমরা জান না।" তরুণ ইতালি সমিতির আদর্শ হইল জাতীয়তাবাদী রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা। মাৎসিনি সক্রিয়ভাবে ইতালিতে বসিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছে জেলে, অথবা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে নির্ব্বাসনে। তরুণ ইতালি সমিতির স্লোগান হইল—ঈশ্বর, জনসাধারণ এবং ইতালি। শিক্ষা, সাহিত্যিক প্রচারকার্য্য এবং প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ—হইল কর্ম্মসূচী। ইতালির নির্ব্বাসিত স্বদেশ প্রেমিকদের যিনি যে-দেশে ছিলেন, তিনিই সেখানে ইতালির পক্ষে নানা ভাবে প্রচার চালাইয়া ইতালির স্বাধীনতা এবং ঐক্য সাধন সংগ্রামের পক্ষে ইউরোপীয় জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রচারকার্য্য পরে খুব কাজে লাগিয়াছিল।

১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত এইভাবে চলিল। ঐ বৎসর পোপ নবম পায়াস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রজাদের অনেক দাবী মানিয়া নিলেন। পাদ্রী ছাড়া সাধারণ লোক সরকারী চাকুরি লাভের অধিকার পাইল, রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি মিলিল। গণতন্ত্রবাদীরা খুশী হইলেন। এই সামান্য সংস্কারেই অষ্ট্রিয়া ভয় পাইল। অষ্ট্রিয়ান সৈন্য ফেরারা সহর দখল করিল। ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিল।

পোপের শাসন সংস্কারের অনুকরণে টাসকেনি এবং সার্দ্দিনিয়া পিদ-মোণ্টেও শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল। অন্য কোন ইতালিয় রাজ্যের রাজা ও

ডিউকরা কোনরূপ উদারতা দেখাইলেন না। গণতান্ত্রিক দাবীর বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার মনোভাব এত উগ্রভাবে প্রকাশ পাইল যে সমগ্র ইতালিতে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। ১৮৪৭ সাল এইভাবে গেল। নেপ্‌লসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল। পোপের রাজ্য, তাসকেনি এবং পিদমোণ্টের জনসাধারণ সামান্য শাসন সংস্কারে সন্তুষ্ট রহিল না, তাহারা সংবিধান দাবী করিল। লম্বার্ডি এবং ভেনেসিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হইতে লাগিল।

১৮৪৮ সালে আবার সুরু হইল বিদ্রোহ। বিপ্লব আন্দোলন জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইল। প্রথম বিদ্রোহ ঘটিল সিসিলিতে। তাহাদের দাবী—সংবিধান চাই। রাজা ফার্দিনান্দ প্রথমটা বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহা অসম্ভব বুঝিয়া নেপ্‌লস এবং সিসিলি উভয়ের জন্যই সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই দাবী মানিয়া নেওয়ার অন্য কারণও ছিল। পোপ, তাসকেনির ডিউক এবং পিদমোণ্টের রাজা শাসন সংস্কারের 'কুদৃষ্টান্ত' স্থাপনের পরিণাম সিসিলি বিদ্রোহ—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আরও বেশী শাসন সংস্কার দিলেন এইজন্য যে উহার ধাক্কা এবার ঐ তিনজনকে পোহাইতে হইবে। হইলও তাই। নেপ্‌লস বিদ্রোহের সাফল্যের উৎসাহ আগুনের মত সারা ইতালিতে ছড়াইয়া পড়িল এবং ঐ তিন রাজ্যেই বিক্ষোভ প্রদর্শন সুরু হইল সব চেয়ে বেশী। তিনমাসের মধ্যে এই তিন দেশেই পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত হইল। ১৮৪৮-এর প্রথম তিনমাসের মধ্যেই ইতালিতে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

১৮৪৮-এর মার্চ্চ মাসে আর একটি বিরাট ঘটনা ঘটিল। ইউরোপে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে যে মেটারনিকের উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল অসীম, তাঁহারই রাজধানীতে বিদ্রোহ হইল এবং মেটারনিককে প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ডিতে বিদ্রোহ হইল এবং অষ্ট্রিয়ান ভাইসরয় পলায়ন করিলেন। ভেনেসিয়াতেও বিদ্রোহ হইল এবং

64788

সেখানে রিপাবলিক ঘোষিত হইল। মোদেনার ডিউক এবং পারমার ডাচেস পলায়ন করিলেন।

বিপ্লবীরা প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিলেও বুঝিলেন যে অষ্ট্রিয়া সহজে ছাড়িবে না, ইতালি হইতে অষ্ট্রিয়ান প্রভুত্ব মুছিয়া ফেলিতে হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে একা পিদমোণ্ট।

কাভুর তখন রিসরজিমেণ্টো পত্রিকার সম্পাদক। তিনি পিদমোণ্টের ইতালিয় রাজা চার্লস এলবার্টকে এই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন। রাজা এলবার্ট এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। ১৮৪৮-এর ২৩শে মার্চ্চ এলবার্ট অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাসকেনির ডিউক তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। পোপ এবং ফার্দ্দিনান্দ প্রজাদের চাপে এলবার্টকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পোপ এবং ফার্দ্দিনান্দ তাঁহাদের সৈন্য সরাইয়া নিলেন। স্বাধীন ইতালি গঠনের সংগ্রামে বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজন বুঝিয়া লম্বাডি, ভেনেসিয়া, পার্মা এবং মোদেনার জনসাধারণ পিদমোণ্টের সঙ্গে ইউনিয়নের দাবী জানাইল। পোপ এবং ফার্দ্দিনান্দ সরিয়া যাওয়ায় এলবার্ট দুর্ব্বল হইয়া পডিলেন, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটিল। লম্বার্ডি এবং ভেনেসিয়া আবার অষ্ট্রিয়ান শাসনে ফিরিতে বাধ্য হইল।

মাৎসিনি তখন ইতালিতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার রিপাবলিকান পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাৎসিনি বলিলেন,—রাজাদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এবার প্রজাদের যুদ্ধ স্বরু হইবে। মাৎসিনি নিজে পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটাইয়া রোমে রিপাবলিক স্থাপন করিলেন। পোপ নেপ্‌লস রাজ্যে পলায়ন করিলেন। তাসকেনির ডিউক লিওপোল্ডও সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তাসকেনিতেও রিপাবলিক স্থাপিত হইল। এই দুই রিপাবলিক মিলিত হইয়া সমগ্র স্বাধীন ইতালির জন্য একটি রিপাবলিকান সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইল।

পিদমোণ্টের রাজাকে তাঁর প্রজারা অব্যাহতি দিল না। আবার তাঁহাকে টানিয়া অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামাইল। ১৮৪৯-এর ১২ই মার্চ্চ এলবার্ট অষ্ট্রিয়ার

সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মাত্র ১১ দিনের মধ্যে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। অপমানজনক সর্ত্তে চুক্তি স্বাক্ষর করা অপেক্ষা তিনি সিংহাসন ত্যাগ শ্রেয় মনে করিলেন। সিংহাসনে বসিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল। ইমানুয়েল অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

পিদমোণ্টের এই পরাজয়ের পরিণাম বিষময় হইল। অষ্ট্রিয়ার দাপট আবার বাড়িয়া গেল। একে একে বিতাড়িত রাজা ও ডিউকেরা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। ফার্দ্দিনান্দ আবার সিসিলি জয় করিলেন। লিওপোল্ড তাসকেনিতে ফিরিয়া গেলেন।

রোমের রিপাবলিক রক্ষার জন্য মাৎসিনির প্রিয় সহকর্মী গ্যারিবল্ডি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। রোম রিপাবলিক ধ্বংস অষ্ট্রিয়া করিল না, করিল ফ্রান্স। দ্বিতীয় ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হইয়া লুই নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সে ফিরিয়াছেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়া ইতালিতে নিজের শক্তি জাহির করিতে উৎসুক হইলেন। ফরাসী রিপাবলিকের সৈন্য আসিয়া রোম রিপাবলিক ধ্বংস করিল। পোপ দেশে ফিরিলেন। এবার পোপের রাজ্যে সুরু হইল প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব।

পিদমোণ্ট ছাড়া ইতালির সর্ব্বত্র আবার স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। কেবলমাত্র পিদমোণ্টের রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল পিতৃদত্ত সংবিধান সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিলেন। বিপ্লব ব্যর্থ হইল। জনসাধারণ বুঝিল ইতালির ঐক্য সাধনের নেতৃত্ব পোপ করিতে পারিবেন না। সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টের উপরেই সকলের আস্থা বাড়িয়া গেল।

জার্ম্মেণী

ইতালির মত জার্ম্মেণীরও একটি বড় সমস্যা ছিল অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্ব। এক জর্ম্মাণ জাতি ৩৯টি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ ছিল প্রুশিয়া। ৩৯টি জার্ম্মাণ রাজ্য নিয়া একটি কনফেডারেশন গঠিত হইয়াছিল। উহার প্রেসিডেন্ট ছিল অষ্ট্রিয়া। কনফেডারেশনে কোন সাধারণ আইন, সাধারণ সেনাবাহিনী বা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট থাকে না। জার্ম্মাণ কনফেডারেশনের নিয়ম ছিল যে উহার একটি সদস্যও যদি আপত্তি করে তাহা হইলে আর সকলে চাহিলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না। জর্ম্মাণ জাতির পক্ষে কল্যাণকর কোন প্রস্তাব উঠিলেই কনফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট অষ্ট্রিয়া আপত্তি করিত।

অষ্ট্রিয়ার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ছিল একা প্রুশিয়ার কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ভয়ে প্রুশিয়ার শাসকমণ্ডলী এত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে অষ্ট্রিয়াব উপব নির্ভর করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী এই অবস্থা চলিয়াছে এবং অষ্ট্রিয়া এই দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। প্রুশিয়ার রাজনীতি ঠিক হইত ভিয়েনায়। মেটারনিকের উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মেণী যেন ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে। মাথার উপর এক বিরাট শক্তির অভ্যুদয় তিনি অষ্ট্রিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ রাষ্ট্র সমূহে গণতন্ত্রের প্রসারে বাধাদানও তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। প্রুশিয়ার উপর প্রভুত্ব ঘটাইয়া মেটারনিক এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেন।

জার্ম্মাণ কনফেডারেশনের একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে উহার অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্য ইচ্ছা করিলে সংবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। ভাইমারের রাজা উদারনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, গ্যেটেকে তিনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নিজ রাজ্যের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করিলে মেটারনিক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। আরও কয়েকটি জার্ম্মাণ রাজ্যের রাজারা কিছু কিছু

শাসন সংস্কার করিলেন। এই সব দৃষ্টান্তে প্রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক দাবী প্রবল হইয়া উঠিল। প্রুশিয়ার রাজা তৃতীয় ফেডারিক উইলিয়াম সংবিধান প্রণীত হইবে বলিয়া প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মেটারনিক প্রমাদ গণিলেন। ১৮১ সালের অক্টোবর মাসে প্রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক ছাত্রদের এক বিরাট উৎসব হইল। ১৮১৯ সালের মার্চ্চ মাসে এক প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যকার কোজেবু নিহত হইলেন। কোজেবু রাশিয়ার জারের চর ছিলেন। মেটারনিক এই দুই ঘটনাকে কাজে লাগাইলেন। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারকে বুঝাইয়া দিলেন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিলে এই অবস্থাই ঘটিবে। ফ্রেডারিক উইলিয়াম সংবিধান দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। কয়েকটি প্রধান জার্ম্মাণ রাজ্যকে দিয়া মেটারনিক কার্লসবাড ডিক্রী পাশ করাইলেন এবং কনফেডারেশনকে দিয়া উহা অনুমোদন করাইলেন। ১৮১৯ সালের কার্লসবাড ডিক্রীর প্রধান ধারাগুলি এইরূপ—

(১) ছাত্র সমিতি এবং ব্যায়ামাগার ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

(২) সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সর বসিবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রত্যেক ক্লাসে 'কিউরেটার' নামে সরকারী চর থাকিবে; অধ্যাপক এবং ছাত্রদের সমস্ত আলোচনা তাহারা শুনিবে এবং রিপোর্ট করিবে।

কার্লসবাড ডিক্রী এত কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইল যে ১৮২০ সালের স্পেন ও নেপ্‌লস বিদ্রোহ এবং ১৮৩০ সালের ফরাসী বিদ্রোহের ঢেউ জার্ম্মানীতে বিশেষ রেখাপাত করিতে পারিল না। কয়েকটি সহরে ছোটখাট বিক্ষোভ প্রকাশ হইল, এই মাত্র।

১৮১৯ সালের জার্ম্মেণীর ইতিহাস আরও একটি বিষয়ের জন্য তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সালে একটি ছোট ঘটনার ভিতর দিয়া জার্ম্মেণীর ঐক্য সাধনের প্রথম সূচনা দেখা দেয়। ৩৯টি জার্ম্মাণ খণ্ডরাজ্যে যাতায়াত এবং মালচলাচলের উপর স্থলশুল্ক ছিল। ইহাতে প্রত্যেক রাজ্যের লোকেরই যাতায়াতে হয়রাণি

এবং ক্ষতি হইত। এই বৎসর কয়েকটি রাজ্য স্থির করিল যে তাহারা কেহই শুল্ক আদায় করিবে না। প্রুশিয়া এই কাষ্টমস ইউনিয়নে উদ্যোগী হইল। ঘটনাটি প্রথমে এত তুচ্ছ মনে হইয়াছিল যে মেটারনিক উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহা অনুমোদন করিয়া বসিলেন। ১৮৫০ সালে দেখা গেল সমস্ত জর্ম্মাণ রাজ্য এই কাষ্টমস ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। উহারই জর্ম্মাণ নাম ৎসোলফেরাইন। অষ্ট্রিয়াকে এই ইউনিয়ন হইতে বাদ দেওয়া হইল। প্রথমে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া জার্ম্মানজাতি এইবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হইল। ইহাই ভবিষ্যৎ জার্ম্মেণীর ভিত্তি।

মেটারনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাধা দিলেন কিন্তু চিন্তাজগতে উহার প্রসার ঠেকাইতে পারিলেন না। এই কালে জার্ম্মেণীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও দার্শনিকদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ফিক্‌টে, হেগেল জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। জাতীয়তাবাদ প্রচারে ইতিহাস চর্চার স্থান খুব উচ্চে, ইহা বুঝিয়া ষ্টাইন জর্ম্মাণ ইতিহাস চর্চার একটি কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। বার্লিন, ব্রেসলা, বন, মিউনিক, লাইপৎসিগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নব জাতীয়তাবাদের ঢেউ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর্ণড্ শ্লোগান দিলেন—

প্রশ্ন। জর্ম্মাণদের পিতৃভূর্মি কোথায়? উহা কি প্রুশিয়া? উহা কি সোয়াবিয়া?

উত্তর। ঈশ্বরের নামগানে জার্ম্মান ভাষা যতদূর ধ্বনিত হয়, তাহাই জার্ম্মেণীর পিতৃভূমি।

জার্ম্মান ছাত্রদের মুখে মুখে এই শ্লোগান ফিরিতে লাগিল। ভাষার ভিত্তিতে জার্ম্মেণীর সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইল। সঙ্গীতজ্ঞেরা গান লিখিলেন— ডয়েটশ্‌লাণ্ড, ডয়েটশ্‌লাণ্ড, উবের আলেস (জার্ম্মেণী, জার্ম্মেণী সবার উপর)।

সৈন্য, ছাত্র, গৃহস্থ সকলে এই সব গান গাহিতে লাগিল। জর্ম্মাণ কবি সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকেরা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের আদর্শ এমন ভাবে

তুলিয়া ধরিলেন যে মেটারনিকের পক্ষে প্রাদেশিকতার উস্কানি দিয়া জর্ম্মাণ জাতির মধ্যে বিভেদ জাগাইয়া রাখা সম্ভব হইল না।

বিপ্লবের এই প্রস্তুতি ব্যর্থ হইল না। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এবার সমগ্র জার্ম্মেণীতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। প্রুশিয়া, বাভেরিয়া, সাক্সোনি, হানোভার, বাডেন এবং শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইনে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিল। অষ্ট্রিয়াতেও এমন বিদ্রোহ ঘটিল যে মেটারনিককে পলায়ন করিতে হইল। ষোড়শ লুইয়ের কথা মনে করিয়া রাজারা সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। বাভেরিয়ার রাজা মেটারনিকের হাতের পুতুল ছিলেন, তিনিও পলায়ন করিলেন। সাক্সোনি এবং হানোভারের রাজারা প্রজাদের দাবী মানিয়া নিলেন।

প্রুশিয়ায় তখন চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম রাজা। তিনি প্রজাদের সংবিধান প্রণয়ন করিতে বলিলেন। ঘোষণাপত্র জারী করিয়া নিজেই জার্ম্মেণীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজপথে জনসাধারণের শোভাযাত্রার পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—প্রুশিয়া এখন হইতে শুধু নিজের স্বার্থই দেখিবে না, সমগ্র জার্ম্মেণীর মঙ্গলামঙ্গলকে প্রুশিয়া নিজের বলিয়া জ্ঞান করিবে।

বিপ্লবের প্রথম উৎসাহ কয়েক মাসেই শেষ হইল। সুরু হইল প্রতিক্রিয়া। অষ্ট্রিয়া এবং অনেকগুলি জর্ম্মাণ রাজ্যের বিদ্রোহ দমিত হইল। এই সময়ে জার্ম্মেণীর রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহার নাম বিসমার্ক। বিপ্লববাদের এত বড় শত্রু বোধ হয় আধুনিককালে আর জন্মে নাই। ফ্রেডারিক উইলিয়াম ইঁহার পরামর্শে চালিত হইতে লাগিলেন।

জার্ম্মেণীর রাজনৈতিক নেতারাও বিপ্লবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁহারা সংবিধান রচনায় ব্যস্ত হইয়া সংবিধানের থিওরী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা আলোচনায় মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে নির্ব্বাচিত এই গণপরিষদ শুধু

বেপরোয়া বক্তৃতার জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এক বছর বাদে তৈরি হইল শুধু ইউনিয়নের একটি স্কীম। ততদিনে বিপ্লবের জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়া প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। গণপরিষদ তখন ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্ম্মেণীর মুকুট গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইল। রাজা দেখিলেন প্রজাদের হাত হইতে মুকুট গ্রহণ করিলে প্রজাদের অধিকার তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। তা ছাড়া অষ্ট্রিয়া এবং অন্যান্যকে জর্ম্মাণ রাজ্যে বিদ্রোহ দমিত হইয়াছে; তাহারাও উহা ভাল চক্ষে দেখিবে না। উইলিয়াম গণপরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গঠনের যে সুযোগ জার্ম্মেণীতে আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। গণতান্ত্রিক জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারিল না, উহা গড়িয়া উঠিল প্রুশিয়ার বাহুবলে।

ফ্রেডারিক উইলিয়াম কিন্তু জর্ম্মাণ ঐক্য সাধনের ইচ্ছা ছাড়িলেন না। হানোভার, সাক্সোনি, উর্টমবুর্গ, বাভেরিয়া এবং কয়েকটি ছোট রাজ্যের সঙ্গে প্রুশিয়া এক ইউনিয়ন গঠন করিল। ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট আহূত হইল এরফুর্টে। অষ্ট্রিয়া ইহার প্রতিবাদ করিল। অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করিল রাশিয়া। ফ্রেডারিক উইলিয়াম ভয় পাইয়া ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুরানো শাসনপদ্ধতি ফিরিয়া আসিল। জার্ম্মেণীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গেল।

অষ্ট্রিয়া

অষ্ট্রিয়া ছিল দুইটি রাজ্য—অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী—এবং জর্ম্মাণ, ম্যাগিয়ার, চেক, শ্লোভাক, পোল, রুথিন, ক্রোট, সার্ব্ব, শ্লোভিন, রুমানিয়, ইতালিয় এবং ইহুদী এই বারোটি জাতি লইয়া গঠিত এক বিশাল সাম্রাজ্য। রাজা ছিলেন হ্যাবসবুর্গ বংশীয়। ইউরোপে জাতীয়তাবোধ যত বাড়িতে লাগিল, অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের স্পৃহাও ততই অদম্য হইয়া

উঠিতে লাগিল। মেটারনিক এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে লাগাইয়া সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পোল সৈন্য এবং অফিসার পাঠাইলেন অষ্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরিয় সৈন্য ও অফিসার পাঠাইলেন ইতালিতে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে জাতিগত সংঘর্ষের পথে চালিত করিয়া তিনি উহা আয়ত্তে রাখিতে চাহিলেন। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের লোকদের মধ্যে বিদেশী প্রগতিশীল ভাবধারা যাহাতে ঢুকিতে না পারে তার জন্য কড়া সেন্সর বসাইলেন। ফল হইল বিপরীত। যে সব বইয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল সেইগুলি বেশী করিয়া চোরাপথে আমদানী হইতে লাগিল। মেটারনিকের দমননীতি এত নিখুঁত ছিল যে অষ্ট্রিয়ায় ইনফ্লেশন ও মূল্য বৃদ্ধিজনিত তীব্র অসন্তোষ সত্বেও ফ্রান্সের ১৮৩০ সালের আন্দোলন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না বরং ইতালি এবং জার্ম্মেণীতে যে কয়টি বিদ্রোহ ঘটিল, অষ্ট্রিয়ান সৈন্য গিয়া তাহা থামাইয়া আসিল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি দাবী মেটারনিক মানিয়া নিয়াছিলেন। উহা এত গুরুতর হইয়া উঠিবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বিভিন্ন জাতির শিক্ষা নিজ নিজ ভাষায় হইবে, এই অনুমতি তিনি দিয়াছিলেন। মেটারনিক ভাবিয়াছিলেন, লেখাপড়া নিয়া ব্যস্ত থাকিলে এদের মন রাজনীতির দিকে বেশী ঝুঁকিবে না। অল্প দিনের মধ্যে দেশের সর্ব্বত্র ভাষাতত্ত্ব সমিতি গড়িয়া উঠিল এবং ঐগুলি হইয়া দাঁড়াইল জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রচ্ছন্ন কেন্দ্র। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ কত গভীর ও ব্যাপক হইয়াছিল তাহা ধরা পড়িল ১৮৪৬ সালে গ্যালিসিয়ার কৃষক বিদ্রোহে।

বারুদ তৈরী ছিল। ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সর্ব্বত্র আগুন জ্বালিয়া দিল। এই বিপ্লব প্রধানতঃ পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত হইল—

(১) প্রথম বিদ্রোহ ঘটিল ভিয়েনায়। ভিয়েনার বিপ্লব পরিচালনা করিল কতকটা জনসাধারণ, কতকটা শিক্ষিত শ্রেণী। বিদ্রোহীদের সকলেই ছিল জার্ম্মাণ। ইহাদের দাবী ছিল গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। ইহারা জার্ম্মেনীর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন

ছিল এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট গণপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহিয়াছিল। বিদ্রোহের প্রধান ধাক্কাতে মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন, দ্বিতীয় ধাক্কাতে স্বয়ং সম্রাটকে ভিয়েনা ছাড়িয়া ইন্‌সব্রাকে সরিয়া যাইতে হইল।

(২) দ্বিতীয় বিদ্রোহ ঘটিল ইতালিতে। মিলান এবং ভেনিসে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইল।

(৩) তৃতীয় বিদ্রোহ ঘটিল বোহেমিয়ার প্রাগ সহরে। চেক জাতীয়তাবাদ কিছুদিন হইতেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা প্রথমে চেক অটোনমি দাবী করিল। পরে পশ্চিমী স্লাভজাতিদের সঙ্গে ইউনিয়ন গঠন করিতে উদ্যোগী হইল। জার্ম্মেনীর ফ্রাঙ্কফুর্ট গণপরিষদের অনুকরণে প্রাগে একটি প্যান-স্লাভ কংগ্রেস আহূত হইল। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী।

(৪) চতুর্থ বিদ্রোহ ঘটিল হাঙ্গেরীতে। বুডাপেষ্ট সহর হইল বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। এই বিদ্রোহের দাবী হইল দুইটি—জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার। হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও দীর্ঘকাল স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়াছে। হাঙ্গেরী বিপ্লবের নেতা ছিলেন কসুথ। তিনি হাঙ্গেরীর জন্য স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট চাহিলেন। অষ্ট্রিয়ান সম্রাট এই দাবী মানিতে বাধ্য হইলেন। হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবের একটি বৈচিত্র্য ছিল এই যে অষ্ট্রিয়া হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিয়াছে কিন্তু হাঙ্গেরীর সীমানার মধ্যে অন্য যে সব জাতি পড়িয়াছে তাহাদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকার করে নাই। হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ারেরা নিজের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যে দাবী তুলিয়া ধরিল, ক্রোট, স্লোভিন এবং সার্ব্বদের বেলায় তাহা অস্বীকার করিল।

(৫) পঞ্চম বিদ্রোহ ইহারই ফল। এই বিদ্রোহ ঘটিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নয়, হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল ইলিরিয়া। ইলিরিয়ার রাজনৈতিক সাংবাদিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন লুই গজ। লুই গজ ক্রোট, স্লোভিন এবং সার্ব্বদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া ম্যাগিয়ারদের অন্যায় জিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলেন। এই আন্দোলনের কেন্দ্র হইল আগ্রাম।

এই ভাবে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে পঞ্চমুখী বিদ্রোহের কেন্দ্র দাঁড়াইল পাঁচটি—ভিয়েনা, মিলান, প্রাগ, বুডাপেষ্ট এবং আগ্রাম। ইহাদের কাহারো সঙ্গে কাহারও সহযোগিতা ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা ছিল। কেবল একটি বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য ছিল এক—অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন। বিপ্লববাদীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সংগঠনের অভাবের ফলে এত বিরাট আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়া বল প্রয়োগে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ দমন করিল।

কেবলমাত্র হাঙ্গেরীতে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল না। কসুথ তখনও সেখানে নেতৃত্ব করিতেছেন। সম্রাট ফার্দ্দিনান্দ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সিস যোসেফকে সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন হয়ত ইহাতে হাঙ্গেরী শান্ত হইবে। কিন্তু কসুথ নূতন রাজাকে স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। তিনি চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। আরও আট মাস বিদ্রোহ চলিল। এবার অষ্ট্রিয়ায় সাহায্যে আসিল রাশিয়ান সৈন্য। হাঙ্গেরী বিপ্লব শেষ হইল। কসুথ প্রথমে তুরস্কে, পরে সেখান হইতে ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। হাঙ্গেরীকে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহৃত হইল।

১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় বিপ্লবে কেবলমাত্র পিদমোণ্ট, প্রুশিয়া, বাভেরিয়া এবং হানোভারের শাসন সংস্কার বজায় রহিল। আর আর সর্ব্বত্র বিপ্লব শুধু যে ব্যর্থ হইল তাহা নহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিল বিষম প্রতিক্রিয়া।

গ্রীস

১৮১৫ হইতে ১৮৫০ সালের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তিনটি দেশে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল—গ্রীস, বেলজিয়াম এবং সুইজারলণ্ডে। তন্মধ্যে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রীকরা ছিল তুরস্কের অধীন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সংগঠন ছিল অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর মত, তদুপরি সেখানে আর একটি জটিলতা ছিল। তুরস্কের শাসক ছিলেন মুসলমান, প্রজাদের অধিকাংশ খৃষ্টান। তুরস্ক ছিল থিওক্রাসি; শরিয়ৎ-শাসিত দেশ। আইন প্রণয়ন বা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনে জনসাধারণের সুদূরতম সম্পর্কও ছিল না। তবে গ্রীস শাসনে তুরস্কের সুলতান কিছুটা উদারতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রীকরা শাসন বিভাগে এবং বৈদেশিক বিভাগে অনেকে উচ্চপদ পাইয়াছিল, তুরস্কের নৌবহরে প্রকৃতপক্ষে গ্রীকরাই কর্তৃত্ব করিত। গ্রীকদের ধর্ম্মাচরণেও সুলতান হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রীসের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারেও তাহাদের অনেক স্বাধীনতা ছিল।

তৎসত্ত্বেও গ্রীকরা সন্তুষ্ট ছিল না। অতি প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রীকজাতির নিয়তি তুরস্কের দাসত্ব,—এই চেতনা তাহাদিগকে সব সময় পীড়িত করিত। ইতালির মত তাহারাও স্বাধীনতা লাভের জন্য গুপ্ত সমিতির পথ অবলম্বন করিল। প্রথম গুপ্ত সমিতির নাম দিল ফিলিকে হেতাইরিয়া অথবা বন্ধু সমিতি।

গ্রীকরা সাহায্যের জন্য তাকাইল রাশিয়ার দিকে। জার আলেক-জাণ্ডারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন গ্রীক, নাম কাপো দ্য ইস্ত্রিয়া। তিনি ফিলিকে হেতাইরিয়ার সভ্য ছিলেন।

১৮২১ সালে মোলডাভিয়ায় প্রিন্স হিপসিলান্তি গ্রীসের স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন করিলেন। মোলডাভিয়া তখন ছিল তুরস্কের অধীনস্থ; এখন রুমানিয়ার অন্তর্গত। উহার অধিবাসীরা রুমানিয়ান। গ্রীক স্বাধীনতা

সংগ্রামে তাহারা বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করিল না। হিপসিলান্তি রাশিয়ান সাহায্য আশা করিয়াছিলেন। তাহাও আসিল না। আন্দোলন অল্পদিনেই শেষ হইল। হিপসিলান্তি গেলেন নির্ব্বাসনে।

গ্রীকদের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হইল গ্রীসের অন্তর্গত মোরিয়ায় এবং ঈজিয়ান সাগরের কয়েকটি গ্রীক দ্বীপে। প্রথমেই গ্রীকরা এমন একটি কাজ করিয়া বসিল যাহার পালটা জবাব পরিণামে গ্রীসের পক্ষেই পরম ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীকরা মোরিয়ার মুসলমানদের হত্যা করিল। তুর্কীরা থেসালি এবং মাসিডোনিয়ার সমস্ত গ্রীক পুরুষদের কাটিয়া ফেলিল, গ্রীক স্ত্রীলোকদের ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিয়া দিল, কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রধান গ্রীক পাদ্রীকে এবং আর তিনজন আর্চ্চবিশপকে ফাঁসি দিল। সুরু হইল তুর্কী এবং গ্রীক হত্যার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা।

১৮২৪-এ সুলতান মিশরের মহম্মদ আলির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ আলি ছিলেন তুরস্কের করদ রাজা। তিনি তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে সুলতানের সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন। ইব্রাহিম এমন ভয়াবহভাবে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড এবং ধ্বংস আরম্ভ করিলেন যে গ্রীকরা কাবু হইয়া পড়িল এবং ইব্রাহিমের নাম দিলা 'কালো নরক।" তিন বৎসর এই পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড চলিল।

গ্রীকরা খৃষ্টান। তাহাদের উপর এই অত্যাচার ইউরোপীয় শক্তিরা নীরবে দর্শন করিতে লাগিল। একমাত্র রাশিয়া গ্রীসকে সাহায্য করিতে চাহিল। অষ্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ড কেহই চায় না রাশিয়া এই সাহায্য দেয়, কারণ তাহাতে তুরস্ক দুর্ব্বল হইবে, রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার ঘরের কাছে আসিবে। দার্দ্দানেলিসে বৃটিশ স্বার্থ বিপন্ন হইবে। ১৮২২ সালেই আলেকজাণ্ডার গ্রীক বিপ্লবীদের সাহায্য পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মেটারনিক এবং ক্যাস্‌লরিগ তাহাতে বাধা দিলেন।

১৮২৭ সালে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন প্রথম নিকোলাস। নিকোলাস আলেকজাণ্ডারের মত দোলায়মান চিত্তের লোক ছিলেন না।

ওদিকে ইংলণ্ডে ক্যাস্‌ল্‌রিগের জায়গায় আসিলেন উদারনৈতিক লর্ড ক্যানিং। নিকোলাস তুরস্কের জয় চাহেন না, ক্যানিং গ্রীক জাতির ধ্বংস চাহেন না। এই গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামেই বায়রন প্রাণ দিয়াছেন, বৃটিশ জনসাধারণ বহু টাকা ও লোক পাঠাইয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণ গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু মেটারনিক জিদ ধরিয়া রহিলেন—গ্রীকরা বিদ্রোহী, বিদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে। প্রুশিয়া মেটারনিককে সমর্থন করিল।

১৮২৭ সালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া তুরস্কের নিকট একটি নোট পাঠাইয়া যুদ্ধবিরতির দাবী জানাইল এবং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ফরাসী এবং বৃটিশ নৌবহরকে গ্রীসের নিকটবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরে থাকিতে বলা হইল। সেখানে তখন ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক এবং মিশরের রণতরী ঘুরিতেছে। একদিন নাভারিনো উপসাগরে দুই নৌবহরে প্রবল যুদ্ধ হইয়া গেল। ইংলণ্ড যুদ্ধের আদেশ দেয় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন। এই একটি ঘটনায় সমস্ত কূটনৈতিক পরিস্থিতি বদলাইয়া গেল। ক্যানিং অল্পদিন হইল মারা গিয়াছেন। ডিউক অফ ওয়েলিংটন হইয়াছেন প্রধান মন্ত্রী। নাভারিনোর ঘটনার জন্য ওয়েলিংটন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং গ্রীক সংগ্রামে হস্তক্ষেপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হইলেন। ক্যানিং যাহা চাহেন নাই তাহাই হইল। বলকানের নেতৃত্ব চলিয়া গেল রাশিয়ার হাতে।

এইবার রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করিল। অল্পদিনেই তুরস্ক সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১৮২৯ সালের আড্রিয়ানোপল সন্ধিতে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ১৮৩৩ সালে বাভেরিয়ার প্রিন্স অটো গ্রীসের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

সার্ব্বিয়া

পাঁচ শতাব্দী সার্ব্বিয়া ছিল তুরস্কের অধীন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উহার সহরগুলি জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোক তুর্কী ফিউড্যাল লর্ডদের

শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অনেকে অষ্ট্রিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান এলাকায় পলায়ন করিল। কিন্তু সেখানেও শান্তি ছিল না।

১৮০৪ সালে কারা জর্জের নেতৃত্বে সার্ব্বিয়ান কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তুর্কী লর্ডদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাশিয়ার সাহায্যে তাহারা অনেকটা জায়গায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল। ১৮১৩ সালে তুরস্ক এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ঐ এলাকায় আবার নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ১৮১৫ সালে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হইল। মাইলস ওব্রেনোভিচ প্রিন্স উপাধি ধারণ করিলেন এবং তুরস্ক তিনটি সার্ব্বিয়ান জেলায় তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইল। ১৮৩০-এ তুরস্ক এই সার্ব্বিয়ান এলাকাকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান করিল। বার্লিন কংগ্রেসে সার্ব্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। সার্ব্বিয়ার বিদ্রোহ বল্কানের প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান।

স্পেন

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ন স্পেনকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্পেনকে ঘাঁটি করিয়া পর্টুগাল জয়ের প্ল্যানও তাঁর ছিল। চতুর্থ চার্লস তখন স্পেনের রাজা। তিনি নেপোলিয়নের হাতের পুতুল হইতে অস্বীকার করিলেন। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ন চার্লসকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করিলেন এবং নিজের ভ্রাতা যোসেফকে সিংহাসনে বসাইলেন। যোসেফ বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না। দেশের লোকের মতের বিরুদ্ধে একটি বাহিরের শক্তির পক্ষে সিংহাসনে নিজের ইচ্ছামত লোক বহাল রাখা বেশীদিন সম্ভব হইল না। জনসাধারণ বিদ্রোহ করিল এবং তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ লইল বৃটেন। একদিকে স্পেনীয় গরিলা বাহিনী অপরদিকে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের অধীনে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ১৮১৩ সালে ফরাসীদের স্পেন হইতে বিতাড়িত করিল।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর চার্লসের পুত্র সপ্তম ফার্দ্দিনান্দ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যোসেফ যখন রাজা তখন স্পেনের নেতারা একটি সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন। উহার মূল বিষয় ছিল দুইটি—(১) আইন

সভা এবং শাসনবিভাগ পৃথক করিতে হইবে এবং (২) পার্লামেন্টের কোন সভ্য দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

স্পেনের সিংহাসনে বসিবার আগে ফার্দ্দিনান্দ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে রাজা হইলে তিনি এই সংবিধান গ্রহণ করিবেন? কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন। উদারনৈতিক নেতারা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। সুরু হইল বিদ্রোহ।

১৮২০ সালে প্রজাবিদ্রোহে ফার্দ্দিনান্দ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন। ফ্রান্সে তখন আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘরের পাশে প্রজাবিদ্রোহ বুর্ব্বন রাজা পছন্দ করিলেন না। ফ্রান্স স্পেনে সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করিল। ফার্দ্দিনান্দকে আবার সিংহাসনে বসাইয়া ফরাসী সৈন্য দেশে ফিরিয়া গেল। ফার্দ্দিনান্দ আরও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর স্পেনের ইতিহাস শুধু ষড়যন্ত্র এবং বিশৃঙ্খলার কাহিনী। শাসন সংস্কারের কোন চেষ্টাই সফল হইল না। ১৮৩৩-এ রাজা ফার্দ্দিনান্দের মৃত্যু হইল। সুরু হইল সিংহাসন নিয়া গৃহযুদ্ধ।

ফার্দ্দিনান্দ মৃত্যুকালে রাখিয়া গিয়াছিলেন তিন বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যা ইসাবেলা এবং ভ্রাতা ডন কার্লস। ১৮৩৩ হইতে ১৮৩৯ পর্য্যন্ত সিংহাসন নিয়া ইসাবেলা এবং তাঁহার খুল্লতাতের মধ্যে লড়াই চলিল। ইহাই স্পেনের কার্লিষ্ট যুদ্ধ নামে খ্যাত। ডন কার্লসকে সমর্থন করিল পাদ্রী এবং অপরিমিত রাজক্ষমতাকাঙ্ক্ষীর দল। ইসাবেলার পক্ষ অবলম্বন করিল নিয়মতন্ত্রবাদী জনসাধারণ। ইসাবেলার মাতা ক্রিষ্টিনা দৃঢ়চরিত্রা নারী ছিলেন। তিনি শেষোক্ত দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্স এবং বৃটেন ইসাবেলাকে সমর্থন দিল। সাত বৎসর গৃহযুদ্ধের পর ডন কার্লস পরাজয় স্বীকার করিয়া স্পেন ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ইসাবেলা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কাডিজের ডিউকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার বুদ্ধি-বিবেচনা বিশেষ ছিল না। পামারষ্টন ইহাকে একটি absolute and Absolutist fool বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

ইসাবেলার রাজত্ব সুখের হয় নাই, প্রজারাও শান্তি পায় নাই। এই রাজত্বে ষড়যন্ত্র এবং কেলেঙ্কারির চরম ঘটিয়াছে। রাজকোষের অর্থ বেপরোয়া অপচয় হইয়াছে। রাণীর প্রিয়পাত্র কতকগুলি লোক অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৫৪ সালে সামরিক বিদ্রোহ ঘটিল কিন্তু অল্পদিনেই উহা শেষ হইয়া গেল। অবশেষে ১৮৬৮ সালে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিল। ইসাবেলা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন।

পর্টুগাল

১৮০৭ সালে নেপোলিয়ন পর্টুগাল অধিকার করেন। পর্টুগালের রাজা সপরিবারে ব্রেজিলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ব্রেজিল ছিল পর্টুগালের অধীনস্থ সাম্রাজ্য। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পেনিনসুলার যুদ্ধে পর্টুগাল স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পর্টুগালের ইতিহাস বহুলাংশে স্পেনের অনুরূপ। ১৮১৫ সালে ব্রেজিল আলাদা রাজ্যরূপে গঠিত হইল এবং ১৮২২-এ ইহা সম্পূর্ণরূপে পর্টুগাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পর্টুগালের রাজা তখন ষষ্ঠ জন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডম পেড্রো হইলেন ব্রেজিলের রাজা। পর্টুগালের উপনিবেশ চলিয়া যাওয়ার পর স্পেনের ন্যায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুরু হইল। উদারনৈতিক নেতারা সংবিধানের দাবী তুলিলেন। ষষ্ঠ জন গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করিলেন। সুরু হইল গণতন্ত্রবাদী এবং রাজতন্ত্র-বাদীদের লড়াই।

১৮২৬-এ ষষ্ঠ জনের মৃত্যু হইল। ডম পেড্রো তাঁর সপ্তমবর্ষীয় কন্যা ডোনা মেরিয়াকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ডম মিগুয়েল ইহাতে আপত্তি করিলেন। স্পেনের মত এখানেও সিংহাসনে খুল্লতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর দাবী নিয়া গৃহযুদ্ধ সুরু হইল। এখানেও ডম মিগুয়েলের পক্ষাবলম্বন করিল পাদ্রী এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা, ডোনা

মেরিয়ার পক্ষে দাঁড়াইল নিয়মতন্ত্রবাদীরা। ডম মিগুয়েল সিংহাসন অধিকার করিলেন। ডম পেড্রো ব্রেজিল হইতে পর্টুগালে আসিলেন এবং বৃটিশ ও ফরাসী সাহায্যে ভ্রাতাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া কন্যাকে বসাইলেন।

ডোনা মেরিয়ার রাজত্বও সুখের হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

১৮৪৮-এর বিপ্লব পর্য্যন্ত ইউরোপের শক্তিকেন্দ্র ছিল মেটারনিকের নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়া। মেটারনিকের পলায়নের পর শক্তিকেন্দ্র হইল বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রুশিয়া। ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হইয়াছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের যৌক্তিকতা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড ক্রোমার বলিয়াছেন যে এই যুদ্ধ না ঘটিলে বলকানের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অভ্যুদয় হইত না এবং রাশিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল দখল করিয়া লইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অসামান্য প্রভাব পড়িয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচ্যের সমস্যা এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বার্থের সংঘাত, জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিরোধ এখানে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সমস্যার কেন্দ্র ছিল তুরস্ক। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ জুড়িয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল; ইউরোপের কোন মন্ত্রণাসভায় তুরস্কের নিমন্ত্রণ হইত না। এশিয়ার এক শক্তি উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা গ্রাস করিয়া ইউরোপে ঢুকিয়াছে, সেখানেও বিরাট অংশ কুক্ষিগত করিয়া প্রতি শতাব্দী ধরিয়া শাসন করিতেছে, ইহা ইউরোপীয়েরা পছন্দ করিত না। তুরস্ক যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন সমস্যা তীব্র হয় নাই। তুরস্কের শক্তি হ্রাস পাইতে

আরম্ভ করিলে প্রাচ্য সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। তুরস্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত এই বিরাট সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খল এবং ঐক্যবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে তুর্কীরা কোন সময়েই পারে নাই। সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এত বেশী ছিল, দুর্নীতি এবং শাসনে অক্ষমতা এত ব্যাপক হইয়া উঠিল যে সামরিক শক্তি বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

দুর্ব্বল হইয়াও তুরস্ক দুইটি কারণে ইউরোপে টিঁকিয়া রহিল—একটি সামরিক, অপরটি ভৌগোলিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ড বা স্পেনের সামরিক শক্তি যত নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তুরস্কের ততটা শোচনীয় অবস্থা হয় নাই। তুর্কী সৈন্য অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে লড়িতে পারিয়াছে, ১৭৮৮ সালেও অষ্ট্রিয়ান সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছে।

ভৌগোলিক সুবিধার প্রথম কারণ, ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিদের স্বার্থের এলাকা হইতে তুরস্ক অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। একমাত্র ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের সুযোগ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে প্রতিবেশী তুরস্ক হইতে আশঙ্কার কারণ ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতেই বেশী মন দিয়াছে, তুরস্ককে গ্রাহ্য করে নাই।

রাশিয়ার অভ্যুদয়—অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া বৃহৎ শক্তিরূপে আবির্ভূত হইবার পর তুরস্কের পরিস্থিতি একেবারে বদলাইয়া গেল। রাশিয়াও পশ্চিম ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিতে উৎসুক হইল এবং তার যাত্রাপথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল তুরস্ক। রাশিয়ার পশ্চিম-যাত্রা পথে পোলাণ্ড এবং সুইডেনও পড়িল বলিয়া উহাদেরও বিপদ বাড়িয়া গেল। এই কারণেই রাশিয়া ফিনলাণ্ড অধিকার করিল, এই কারণেই পোলাণ্ড পার্টিসন করিয়া উহার একাংশ দখল করিল। তারপর রাশিয়া দৃষ্টি দিল কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের দিকে। কৃষ্ণসাগরে অখণ্ড প্রভুত্ব এবং ভূমধ্যসাগরে অবাধ যাতায়াত করিতে পারিলে রাশিয়া অতীতের বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের

ন্যায় সভ্য জগৎ শাসন করিতে পারিবে—এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। ক্যাথলিক খৃষ্টানরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—রোমান ক্যাথলিক এবং গ্রীক ক্যাথলিক। রাশিয়া ছিল গ্রীক ক্যাথলিকদের মুরব্বী। তুরস্কের খৃষ্টান অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক ক্যাথলিক। রাশিয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল কনষ্টাণ্টিনোপলকে জারগ্রাড করিতে হইবে।

কুজুক কাইনারজির সন্ধি—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দ্বিতীয় ক্যাথেরিণের আমলে রাশিয়া পশ্চিমদিকে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিল। তুরস্কের সঙ্গে ছয় বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর ১৭৭৪ সালে কুজুক কাইনারজির সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিবলে রাশিয়া এই কয়টি সুবিধা অর্জ্জন করিল :

(১) কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূল রাশিয়ার অধিকারে আসিল,

(২) ডন এবং নীপার নদীব মোহানায় রাশিয়ার কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইল,

(৩) তুরস্কের সীমানা বা গ নদী পর্য্যন্ত হটিয়া আসিল,

(৪) কৃষ্ণসাগরের তুরস্ক উপকূল এবং ডানিয়ুব নদীতে বাণিজ্যের অধিকার স্থাপিত হইল,

(৫) কনষ্টাণ্টিনোপলে স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক দূত রাখিবার এবং যেখানে খুসী সেখানে কনসাল এবং ভাইসকনসাল মোতায়েন করিবার অধিকার মিলিল,

(৬) ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়ার উপর কিছুটা কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইল,

(৭) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রীক ক্যাথলিকদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকৃত হইল।

এক কথায় কুজুক কাইনারজি সন্ধির বলে রাশিয়া তুরস্কের অনেকখানি ভূমি কাড়িয়া নিল, ভূমধ্যসাগরের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করিল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় কর্ত্তৃত্ব আদায় করিল।

যাসির সন্ধি—ক্যাথেরিণ এবার আরও অগ্রসর হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে একযোগে ১৭৮৮ সালে তিনি আবার তুরস্ক আক্রমণ করিলেন।

পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জকে তিনি কৌশলে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিব্রত রাখিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তুরস্ক আক্রমণে কেহ বাধা দিতে আসিল না। অষ্ট্রিয়ান সৈন্য তুর্কীদের হাতে পরাজিত হইয়া এবং দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে বিব্রত হইয়া রহিল। রাশিয়াও আর এক বৎসরের বেশী লড়িতে পারিল না, সুইডেনের যুদ্ধ এবং পোলাণ্ড বিদ্রোহে বিব্রত হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। যাসিতে ১৭৯২ সালে সন্ধি হইল। এই সন্ধিপত্র অনুসারে রাশিয়া ক্রিমিয়া অধিকার করিল। আজব, ক্রিমিয়া এবং ইউক্রেণ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল।

জার আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসিয়া আবার তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি ফ্রান্সের সাহায্য আশা করিয়াছিলেন কিন্তু রাশিয়াকে বলকানের প্রভু হইতে দেওয়ার অভিপ্রায় নেপোলিয়ানের ছিল না। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানের প্রাক্কালে আলেকজাণ্ডার তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ইহাই বুখারেষ্ট সন্ধি। এই সন্ধিপত্র বলে রাশিয়া বেসারাবিয়া দখল করিল।

১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত রাশিয়া এইভাবে অগ্রসর হইয়া প্রুথ নদীর সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

তুরস্কের দিকে ফ্রান্সের দৃষ্টি—নেপোলিয়নের দৃষ্টি ছিল প্রাচ্যের দিকে। তুরস্কে নেপোলিয়ানের স্বার্থ উপলব্ধি করিতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের খুব বেশী বিলম্ব হইল না। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে ঠেকাইয়া রাশিয়া তুরস্ককে যে সাহায্য করিয়াছিল তার প্রতিদানে তুরস্ক ফ্রান্সকে তাহার সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের সুবিধা দিয়াছিল এবং প্যালেষ্টাইনের পবিত্র গির্জ্জায় রোমান ক্যাথলিকদের আসিতে দিয়াছিল।

নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের তুরস্ক-নীতিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল তুরস্কের পার্টিশান, তবে এই পার্টিশানে যাহাতে রাশিয়ার সুবিধা না হইয়া ফ্রান্সের সুবিধা হয় তাহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথম ঘাঁটি হিসাবে আইয়োনিয়ান

দ্বীপপুঞ্জ দখল করিলেন। তুরস্কের ঘাড়ের উপর বসিয়া রাশিয়ার উপর প্রভুত্ব—ইহাই ছিল নেপোলিয়নের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা।

ওয়াটারলু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন হইল বটে কিন্তু রাশিয়া প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় শক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ায় আর এক জটিলতার সৃষ্টি হইল। রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির ভয়ে মেটারনিক ভিয়েনা কংগ্রেসে তুরস্ক অখণ্ড রাখিবার নীতি অবলম্বন করিলেন।

ইংলণ্ডের প্রাচ্যনীতি—ভিয়েনা কংগ্রেসের ভাগ বাঁটোয়ারায় ইংলণ্ড আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় সকলেই বুঝিল তার নজর কোন দিকে। ইংলণ্ডের প্রাচ্যনীতি হইল—রাশিয়াকে ঠেকাইতে হইবে এবং রাশিয়াকে ঠেকাইতে হইলে তুরস্ক সাম্রাজ্য অক্ষত রাখিতে হইবে। ক্যাস্‌লরিগ, ক্যানিং, পামারষ্টোন এবং ডিসরায়েলি সকলেই এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

সার্ব্বিয়া এবং গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমী শক্তিরা খুব বিপদে পড়িল। তুরস্ক অখণ্ড রাখিতে হইলে খৃষ্টান জনসাধারণকে কচুকাটা হইতে দিতে হয়। তাহাদের সাহায্য করিতে গেলে তুরস্ক খণ্ডিত হয়। ছয় বৎসর ইহারা কোন পথ ঠিক করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে রাশিয়া ১৮২৯ সালের আদ্রিয়ানোপলের সন্ধিতে তুরস্কের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করিয়া রাশিয়া যে গৌরব অর্জ্জন করিল, চার বৎসরের মধ্যে উহা আরও বাড়াইবার সুযোগ তাহার হাতে আসিয়া গেল।

মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ—মিশরের মহম্মদ আলি গ্রীক যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিতে গিয়া সুলতানের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নিলেন। মহম্মদ আলি ছিলেন এক সামান্য তামাক বিক্রেতা। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের গোলযোগে তিনি নিজেকে মিশরের পাশা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বসিলেন। তুরস্কের সুলতানও তাঁহাকে পাশা বলিয়া স্বীকার করিলেন। মহম্মদ

আলি সুলতানকে প্রভু বলিয়া মানিয়া নিলেন। ইংরেজরা মিশরে আসিলে মহম্মদ আলি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। তিনি সুদান এবং আরব রাজ্য জয় করিলেন। মামলুক এবং ওয়াহাবি বিদ্রোহ দমন করিলেন। মহম্মদ আলি লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু এটুকু বুঝিতেন যে বাহুবলে রাজ্যজয় হইতে পারে কিন্তু রাজ্যরক্ষা হয় না। তাই নেপোলিয়ন মিশরে যে সব পাশ্চাত্য ভাবধারা আনিয়াছিলেন তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ফরাসীদের সাহায্যে মিশরের সেনাদল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা আধুনিক কায়দায় পুনর্গঠন করিলেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করিলেন। আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মিশর যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে মহম্মদ আলি সেদিকে মন দিলেন।

এই লোক গ্রীকযুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করিয়া পুরস্কার পাইলেন সামান্য ক্রীট দ্বীপ। মহম্মদ আলি চটিয়া আগুন হইলেন এবং দাবী করিলেন তাঁহাকে সিরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুলতান রাজি হইলেন না। মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম এবার সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৮৩১ সালে তিনি প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিলেন। দামাস্কাস দখল করিয়া তিনি সহজেই এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিপন্ন সুলতান ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাড়া দিল একমাত্র রাশিয়া। রাশিয়া তুরস্কের চিরশত্রু, অথচ একমাত্র তাহাকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া সুলতান রাশিয়ার সাহায্যই গ্রহণ করিলেন। রাশিয়ান সৈন্য এবং নৌবহর তুরস্কে ঢুকিল। এই দৃশ্যে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ সন্ত্রস্ত হইল। অবস্থা দাঁড়াইল এই যে ইব্রাহিম সিরিয়া না নিয়া সরিবেন না, রাশিয়াও ইব্রাহিম বিদায় না নিলে সৈন্য সরাইবে না। তখন ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়া তুরস্ককে চাপ দিয়া সিরিয়া মহম্মদ আলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিল। মহম্মদ আলি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন।

উঙ্কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি—রাশিয়া সৈন্য সরাইবার আগে তুরস্কের নিকট তাহার সাহায্যের মূল্য দাবী করিল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

ইহাই ১৮৩৩ সালের উঙ্কিয়ার স্কেলেসি সন্ধি। এই সন্ধিতে রাশিয়ার লাভ হইল এই—

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্য কার্য্যতঃ রাশিয়ার সামরিক অভিভাবকত্বে (Protectorate) আসিয়া গেল,

(২) রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজ অবাধে বসফোরাস এবং দার্দ্দানেলিস প্রণালী দিয়া যাতায়াতের অধিকার লাভ করিল,

(৩) যুদ্ধের সময় তুরস্ক দার্দ্দানেলিস দিয়া রাশিয়া ভিন্ন অন্য সকলের যুদ্ধ জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে এই সন্ধির সংবাদ রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন উঙ্কিয়ার স্কেলেসির সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

মিশরের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ—সুযোগ আসিল ১৮৩৯ সালে। তুরস্কের সুলতান ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছেন এবং প্রুশিয়ার বিখ্যাত জেনারেল ফন মোল্‌টেকে আনিয়া তাঁর সাহায্যে সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়াছেন। মহম্মদ আলির উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ঐ বৎসর তিনি সৈন্য পাঠাইলেন। তুর্কী সৈন্যের পোষাক ছিল রাশিয়ান, ড্রিলবই ছিল ফরাসী, বন্দুক ছিল বেলজিয়ান, ঘোড়ার সাজ ছিল হাঙ্গেরিয়ান, তরবারি ছিল ইংলণ্ডের। শুধু টুপিটা ছিল তুর্কীদের নিজস্ব। এই অপূর্ব্ব সৈন্যবাহিনী ইব্রাহিমের হাতে সহজেই পরাজিত হইল। তুর্কী নৌবহর মহম্মদ আলির নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

বৃদ্ধ সুলতান এই আঘাত সহিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যু হইল। সিংহাসনে বসিলেন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক আবদুল মজিদ।

পশ্চিমী শক্তিরা বুঝিল মহম্মদ আলি এই সুযোগ ছাড়িবেন না। মহম্মদ আলির মত শক্ত লোক কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়া বসেন ইহা ইংলণ্ডও চাহিল না, রাশিয়াও চাহিল না। ফ্রান্স তখন আলজিরিয়া জয় করিয়াছে। মহম্মদ আলি ফরাসীদের সাহায্যে এবং ফরাসী ধাঁচে মিশর

গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়া ফ্রান্স তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। ফ্রান্স ভাবিল মহম্মদ আলি কনষ্টাণ্টিনোপলে বসিলে তার লাভ হইবে। সুয়েজ খাল কাটিয়া ফ্রান্স ঐ পথে ভারত মহাসাগর যাওয়ার আয়োজন সুরু করিয়াছিল। মহম্মদ আলির সাহায্য পাইলে সুয়েজ খাল কাটা সহজ হইবে, ইংলণ্ড উত্তমাশা অন্তরীপ দখল করিয়া যাতায়াতের যে সুবিধা করিয়া নিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইবে। উত্তমাশা অন্তরীপের চেয়ে সুয়েজের গুরুত্ব অনেক বেশী হইবে। এই আশায় ফ্রান্স গোপনে মহম্মদ আলিকে সাহায্য করিতে লাগিল।

পামারষ্টনের কূটনীতি—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী পামারষ্টন কূটনীতির খেলা দেখাইলেন। তিনি বুঝিলেন মিশরে ফরাসী প্রাধান্যে ইংরেজের যে বিপদ ঘটিবে রাশিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিলেও সেই বিপদই দেখা দিবে। তিনি স্থির করিলেন তুরস্ককে রক্ষা করিতে হইবে।

রাশিয়াও বুঝিল কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিতে চাহিলে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড দুজনেই বাধা দিবে। তার চেয়ে তুর্কার হাতেই ওটা থাকা ভাল। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে তার লাভের আশা আছে। রাশিয়া ইংলণ্ডের দিকে ঝুঁকিল। ইংলণ্ডকে বলিল যে প্রাচ্য সমস্যায় ইংলণ্ড যদি রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে সে উঙ্কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি ছিঁড়িয়া ফেলিতে রাজী আছে।

লণ্ডন কনভেনসন—১৮৪০ সালে পামারষ্টন লণ্ডনে এক কনভেনসন ডাকিলেন। রাশিয়া প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া উহাতে যোগ দিল। ফ্রান্সকে বাদ দেওয়া হইল। চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্থির হইল দার্দানেলিস দিয়া যুদ্ধের সময় কাহারও যুদ্ধ জাহাজ যাইতে পারিবে না। সিরিয়া, ক্রীট এবং আরব তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে মহম্মদ আলি বাধ্য হইলেন। এই ক্ষতির বিনিময়ে তিনি লাভ করিলেন মিশরের বংশানুক্রমিক পাশা উপাধি। তাঁহাকে তুরস্কের করদ রাজা হিসাবেই থাকিতে হইল। ফ্রান্সকেও এই অপমান নীরবে হজম করিতে হইল। পর বৎসর ফ্রান্স চতুঃশক্তির সঙ্গে

গিয়া যোগ দিল। উঙ্কিয়ার স্কেলেসির সন্ধিপত্র বাতিল হইয়া গেল। তুরস্কের অখণ্ডতার নীতি ইউরোপের সকল শক্তি মানিয়া লইল। মহম্মদ আলি ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে সরিয়া গেলেন। পামারষ্টনের কূটনীতি সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইল। রাশিয়া এবং ফ্রান্স দুজনেই বুঝিল তুরস্কে একজনের এবং মিশরে অপরের প্রাধান্য ইংলণ্ড সহ্য করিবে না। পর বৎসর ১৮৪১ সালে মেলবোর্ণ মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া গেল। পামারষ্টন পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পামারষ্টন চলিয়া যাওয়ায় সবচেয়ে বেশী স্বস্তি বোধ করিলেন জার নিকোলাস।

লণ্ডন কনভেনসনের পর দশ বছর আর কোন গোলযোগ হইল না।

১৮৫২ সালে দ্বিতীয় ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট লুই নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আন্তর্জ্জাতিক গৌরব অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় নেপোলিয়ন প্রাচ্যের দিকে তাকাইলেন। সুযোগ মিলিতে দেরী হইল না।

প্যালেষ্টাইনে পাদ্রীদের বিরোধ—প্যালেষ্টাইন তখন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্যালেষ্টাইনের পবিত্র স্থানে রোমান এবং গ্রীক ক্যাথলিক উভয়বিধ পাদ্রীরাই ছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদের মুরুব্বী ছিল ফ্রান্স, গ্রীক ক্যাথলিকদের রাশিয়া। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। ফরাসী বিপ্লবে ধর্ম্মের দিকে মনোযোগ হ্রাস পাওয়ায় রোমান পাদ্রীদের মুরুব্বীর জোর কমিয়া যায় এবং গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রীরা তাহাদের সুবিধাগুলি অধিকার করে। নেপোলিয়ন দেখিলেন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের হইয়া তুরস্কে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তিনি ফ্রান্সের পাদ্রীদের সমর্থন পাইবেন এবং উহাদের পুরাণো সুবিধা ফিরাইয়া দিতে পারিলে নিকোলাস তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। প্রশ্নটা এক কথায় দাঁড়াইল এই—বেথলেহেমের প্রধান গির্জ্জার প্রধান দরজার চাবি রোমান ক্যাথলিক অথবা গ্রীক ক্যাথলিক, কার হাতে থাকিবে। নেপোলিয়ন সুলতানকে জানাইলেন রোমান ক্যাথলিকদের পুরাণো

অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া সুলতান রাজী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিকোলাস দাবী করিলেন যে গ্রীক ক্যাথলিকরা এতদিন যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা কাড়িয়া নেওয়া চলিবে না। দুই প্রবল শক্তির মাঝখানে পড়িয়া তুরস্ক প্রমাদ গণিল। আপোষের প্রস্তাব করিল, রাশিয়া রাজী হইল না। আপোষের অভিপ্রায় ফ্রান্স এবং রাশিয়া কাহারও ছিল না। ১৮৫৩ সালের মার্চ্চ মাসে রাশিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে দূত পাঠাইয়া দাবী করিল যে তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নিকোলাস জানাইলেন কুজুক কাইনারজির সন্ধিপত্র অনুসারে এই দাবী তুলিবার অধিকার তাঁহার আছে।

প্রাচ্য সমস্যা আবার তীব্র আকার ধারণ করিল। রাশিয়া ইংলণ্ডকে জানাইয়া দিল তুরস্কের অখণ্ডতা রাখার নীতি সে পরিত্যাগ করিয়াছে। নিকোলাস বলিলেন, "তুরস্ক এক সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে··· সারাটা দেশ ভাঙ্গিয়া টুকরা হইয়া পড়িতেছে···আমাদের হাতে রহিয়াছে এক রুগ্ন, অত্যন্ত রুগ্ন লোক, সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার আগে সে যদি সরিয়া পড়ে তবেই বিপদ।" নিকোলাস ইংলণ্ডের নিকট তুরস্ক বিভাগের প্রস্তাব পাঠাইয়া বলিলেন কনষ্টাণ্টিনোপল তিনি নিজে রাখিবেন, ইংলণ্ড মিশর এবং ক্রীট অধিকার করুক। ইংলণ্ড দৃঢ়তার সহিত রাশিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

ভিয়েনা নোট—১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া দখল করিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া ভিয়েনায় এক বৈঠকে সমবেত হইয়া তুরস্ক এবং রাশিয়ার নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ফরমূলা পাঠাইল। ইহাই ভিয়েনা নোট নামে বিখ্যাত। ভিয়েনা নোটে বলা হইল, কুজুক কাইনারজি এবং আড্রিয়ানোপল সন্ধিতে তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদের ধর্ম্মীয় অধিকার রক্ষার যে ফরমূলা দেওয়া হইয়াছে রাশিয়া এবং তুরস্ক উভয়কে তাহা মানিতে

হইবে। ভিয়েনা নোট খুব স্পষ্ট ছিল না বলিয়া রাশিয়া এবং তুরস্ক দুজনে দুইরকম ব্যাখ্যা করিল। নিকোলাস বলিলেন, খৃষ্টানদের রক্ষা করিবেন জার, সুলতান বলিলেন এই দায়িত্ব তাঁহার। রাশিয়া ভিয়েনা নোট মানিয়া নিল, তুরস্ক প্রত্যাখ্যান করিল।

রুশ তুরস্ক যুদ্ধ—তুরস্ক রাশিয়াকে ওয়ালাচিয়া মোলডাভিয়া হইতে সৈন্য সরাইতে বলিল। রাশিয়া সরাইল না। ২৩শে অক্টোবর তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

লর্ড এবারডিন তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তিনি বলিলেন—"তুর্কীরা বর্ব্বর বটে, তবে ধূর্ত্তের শিরোমণি; আমাদের এমন এক অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে তাহাদের সাহায্যে না গিয়া আমাদের উপায় নাই।" ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স দুজনেই বুঝিল এই যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য না করিলে উহার ধ্বংস অনিবার্য্য। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন দেখিলেন আন্তর্জ্জাতিক গৌরব অর্জ্জনের এবং নিজের সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার এই সুযোগ। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগে পামারষ্টন আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী; রাশিয়া তখন আফগানিস্থানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া সেখানে ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা করিতেছে। রাশিয়া আফগানিস্থানে বসিলে বৃটিশ ভারত বিপন্ন হইবে। ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে চটিয়াছিল। পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর উপর রাশিয়া যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহাতে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক জনমতও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সুতরাং পামারষ্টন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার প্রস্তাব করিতেই বৃটিশ জনমত তাঁহাকে সমর্থন করিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ—১৮৫৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বৃটিশ ও ফরাসী নৌবহর কৃষ্ণ সাগরে ঢুকিল। মার্চ্চ মাসে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

নিকোলাস দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথম ভুল তিনি করিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে ইংলণ্ড শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে নামিবে না। দ্বিতীয় ভুল, তিনি

ভাবিয়াছিলেন অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে না, হাঙ্গেরীর বিদ্রোহে রাশিয়া যে তাহাকে বাঁচাইয়াছিল তাহা মনে রাখিবে।

অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ রহিল বটে তবে রাশিয়া বুঝিল যে কোন সময় সে বিপক্ষ দলে যোগ দিতে পারে। ওয়ালাচিয়া মোলডাভিয়ায় রুশ সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ অষ্ট্রিয়াও করিয়াছিল। রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার উপর মর্ম্মান্তিক চটিল কিন্তু তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া বিপক্ষ দলে ঠেলিয়া দিতে সাহস পাইল না। অষ্ট্রিয়ার এই ব্যবহারের প্রতিশোধ রাশিয়া পরে নিয়াছিল।

প্রুশিয়ায় বিসমার্ক রাজাকে বুঝাইলেন চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরের স্বার্থে যুদ্ধে নামার কোন প্রয়োজন প্রুশিয়ার নাই। প্রাচ্যে প্রুশিয়ার নিজস্ব কোন স্বার্থ নাই। বরং রাশিয়ার বন্ধুত্বই তাহার কাম্য। প্রুশিয়ার এই সহানুভূতিও রাশিয়া ভুলিল না।

সার্দ্দিনিয়া-পিদমোণ্ট রাজ্যেরও প্রকাশ্য কোন স্বার্থ ছিল না। কিন্তু উহার প্রধানমন্ত্রী কাভুর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে ১৫ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ইতালির ঐক্যসাধন সংগ্রামে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, ইহাদিগকে এখন হইতেই খুসী রাখা ভাল। সার্দ্দিনিয়ার সৈন্যেরা যুদ্ধে খুব সাহায্য করিয়াছিল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রণকৌশল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নূতন কৌশলে অবলম্বন করিল। নেপোলিয়ানের মত ভুল না করিয়া তাহারা ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার জারের আঙ্গুল এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে সেই রক্তপাত ঠেকানো রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। রাশিয়ায় তখন রেল নাই, রাস্তা সামান্য। যুদ্ধে রসদ ও লোক সরবরাহ অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমুদ্রপথ খোলা—সৈন্য ও রসদ আনিতে কোন অসুবিধা নাই। রাশিয়ার আর একটি মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিল। সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার মাটি এত কাদা হইয়া যায় যে তাহার উপর দিয়া সৈন্য ও রসদ পাঠানো যায় না।

পাকা রাস্তা নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স টেলিগ্রামে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে, রাশিয়ার তাহাও নাই। ইংলণ্ড হইতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আসিয়া ইংরেজ ও ফরাসী আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাশিয়ার তেমন কোন বন্দোবস্ত নাই।

ক্রিমিয়ায় বালাক্লাভা এবং ইঙ্কারম্যান এই দুই যুদ্ধে রাশিয়ার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে রাশিয়ান এডমিরাল কর্ণিলভ খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সিবাষ্টোপোলের আত্মসমর্পণের পরে রাশিয়ার আর জয়ের আশা রহিল না।

১৮৫৫ সালে ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। লর্ড এবারডিনের স্থলে পামারষ্টন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইলেন। নেপোলিয়ান দোদুল্যমানচিত্ত হইয়াছেন বলিয়া বোঝা গেল। অষ্ট্রিয়া দু'দিকে তাল দিতে লাগিল। সার্দ্দিনিয়া ঠিক রহিল এবং এক কণ্টিঞ্জেণ্ট সৈন্য পাঠাইল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু।

প্যারিস সন্ধি

নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধ বন্ধ হইল। ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসে প্যারিসে শান্তি বৈঠক বসিল এবং প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। প্যারিস চুক্তির প্রধান ধারাগুলি এইরূপ—

(১) কৃষ্ণ সাগর নিরপেক্ষ এলাকা হইবে, সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ উহাতে অবাধে যাতায়াত করিবে,

(২) কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে রাশিয়া এবং তুরস্ক কেহই অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না,

(৩) ডানিয়ুব নদীতে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করিতে পারিবে,

(৪) তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদের উপর রাশিয়ার মুরুব্বীয়ানা থাকিবে না,

(৫) তুরস্ককে ইউরোপীয় শক্তিরূপে গণ্য করা হইবে এবং ভবিষ্যতে ইউরোপীয় রাজনৈতিক বৈঠকে তুরস্ককে যোগ দিতে দেওয়া হইবে,

(৬) তুরস্কের গভর্ণমেণ্ট আরও ভাল করা হইবে,

(৭) সার্ব্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। উহার প্রত্যক্ষ ফল :

(১) রাশিয়া অপমানিত হইল এবং উহার বহির্গমন চেষ্টা বন্ধ হইল,

(২) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রক্ষণাধীনে তুরস্কের পরমায়ু বাড়িয়া গেল,

(৩) তৃতীয় নেপোলিয়নের নাম বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল,

(৪) ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ অনেক বাড়িয়া গেল,

(৫) রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার পরম শত্রু হইয়া রহিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিমিয়ার কর্দ্দম হইতে নবীন ইতালি এবং নবীন জার্ম্মেনীর অভ্যুদয় ঘটিল। রাশিয়া শাসন-সংস্কারে এবং জাতীয় উন্নতিতে মন দিল। রাশিয়ার ইউরোপ অভিযান বন্ধ হইয়া এশিয়া অভিযান সুরু হইল। বলকান পুনর্গঠনের আয়োজন আরম্ভ হইল। ভিয়েনায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাহার ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতালির ঐক্য সাধন

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ইতালির ঐক্য সাধন।

১৮৪৮ সালের ইতালিয়ান বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর পিদমোণ্টের দিকে সকলে নেতৃত্বের জন্য তাকাইতে লাগিলেন। বিভিন্ন ইতালিয়ান রাজ্য হইতে পলায়িত এবং নির্ব্বাসিত বিপ্লবী নেতারা ধীরে ধীরে পিদমোণ্টে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। কাউণ্ট কাভুর এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৮৫২ সালে কাভুর সার্দ্দিনিয়া-পিদমোণ্টের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তৎকালীন ইয়োরোপে একমাত্র বিসমার্কের সঙ্গে কূটনীতিক হিসাবে কাভুরের তুলনা চলে। মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি এবং কাভুরের মিলন ইতালির ঐক্যসাধনের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

গৃহ সংস্কার

কাভুর প্রথমেই নিজ দেশের পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট সংগঠনে এবং জাতীয় উন্নতিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি রেলওয়ে তৈরি করিলেন, সেনাদল পুনর্গঠন করিলেন, ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতিতে উৎসাহ দিলেন, ব্যক্তি ও শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করিলেন, পাদ্রীদের ক্ষমতা কমাইলেন। তাঁর সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব হইল দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধন।

জাতিগঠনে কাভুর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ দিলেন কূটনৈতিক দক্ষতার।

ইতালির ঐক্যসাধন আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়া কিছু মতভেদ ছিল। সকলে পিদমোণ্টের নেতৃত্ব চায় নাই। একদল পোপের অধীনে অখণ্ড ইতালি গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। মাৎসিনি এবং গ্যারিবল্ডির সাহায্য পাইয়া কাভুরই অধিকতর শক্তিশালী হইলেন। মাৎসিনির রিপাবলিকান আদর্শ এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থার সঙ্গে কাভুর একমত হইতে পারেন নাই।

গ্যারিবল্ডি ছিলেন মাৎসিনির মতাবলম্বী। তবু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কাভুর নিজের মতবাদের উপর বেশী জোর না দিয়া তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কাভুর ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ইতালির রাজতক্তে ভিক্টর ইমানুয়েলের অভিষেক।

কাভুর বুঝিলেন, এই আন্দোলনে নামিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়িতে হইবে, ভেনেসিয়া এবং লম্বার্ডি হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে হইবে। তার জন্য চাই যুদ্ধ। যুদ্ধে নামিতে গেলে চাই ইউরোপীয় শক্তিদের সাহায্য এবং ইউরোপীয় জনমতের সমর্থন।

বৈদেশিক প্রচার

কাভুর প্রথমেই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল লেখকদের একত্র করিলেন। ইংলণ্ডের মর্ণিং পোষ্ট এবং টাইমস, প্যারিসের লা মাতিন এবং বেলজিয়ামের লা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বেলজে প্রভৃতি প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলিতে ইঁহারা ইতালির দাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম রিপাবলিক ধ্বংস করিয়া পোপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পোপকে রক্ষা করিবার জন্য রোমে ফরাসী সৈন্যও রাখিয়াছিলেন কিন্তু ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধিতেই কাভুর উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সাহায্যে সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাতে কাভুরের প্রথম লাভ হইল প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পার্শ্বে তিনি ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি ও স্থান লাভ করিলেন। কাভুরের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হইল। ইতালির স্বাধীনতা ইউরোপীয় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল। নেপোলিয়ন উহা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের উপর বোমা

১৮৫৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী একটি ঘটনায় ইতালির সংগ্রাম শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ঐ দিন অরসিনি নামে মাৎসিনির অনুরক্ত একজন রিপাবলিকান বিপ্লবী প্যারিসে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিলেন। নেপোলিয়নের দেহরক্ষীরা নিহত হইল, তিনি নিজে দৈবক্রমে বাঁচিয়া গেলেন। অরসিনি গ্রেপ্তার হইলেন। বোমাগুলি ইংলণ্ডে তৈরি হইয়াছে এবং ষড়যন্ত্রও সেখানেই হইয়াছে বলিয়া তদন্তে ধরা পড়িল। জেল হইতে অরসিনি নেপোলিয়নের নিকট একটি চিঠি দিলেন। চিঠিখানি অরসিনির এডভোকেট জুল ফভার রাজ দরবারে সম্রাটের সমক্ষে পাঠ করিলেন। অরসিনি লিখিয়াছিলেন,—"ইতালি যতদিন পরাধীন থাকিবে ততদিন ইউরোপের বা আপনার শান্তি অলীক কল্পনামাত্র হইয়া থাকিবে। আমার দেশকে উদ্ধার করুন, আড়াই কোটি নরনারীর আশীর্বাদ বংশানুক্রমে আপনার উপর বর্ষিত হইবে।" এই চিঠিতে নেপোলিয়নের মন ইতালি সম্পর্কে অনেক নরম হইয়া গেল। তিনি চটিলেন ইংলণ্ডের উপর। অরসিনির মৃত্যুদণ্ড হইল। ইতালির জয়ধ্বনি করিতে করিতে অরসিনি গিলোটিনের তলায় মাথা রাখিলেন।

প্লম্বিয়ার চুক্তি

মে মাসে কাভুর সংবাদ পাইলেন নেপোলিয়ন সার্দিনিয়া সীমান্তের খুব নিকটে সুইজারল্যাণ্ডের প্লম্বিয়ার নামক এক স্বাস্থ্য-নিবাসে আসিতেছেন। কাভুরের তৎক্ষণাৎ বিশ্রামের দরকার হইল। তিনিও প্লম্বিয়ারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্লম্বিয়ারের উষ্ণ প্রস্রবনের জলপানই যেন উভয়ের উদ্দেশ্য এই ভাব দেখাইয়া দুজনে মিলিত হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের চুক্তি হইয়া গেল। ইতালির স্বাধীনতায় নেপোলিয়নের সমর্থন ছিল কিন্তু ইতালির ঐক্য তিনি চাহেন নাই। অষ্ট্রিয়াকে তাড়াইয়া তৎস্থলে নিজের

প্রভাব বিস্তারই তাঁর আসল অভিপ্রায় ছিল। প্লম্বিয়ার চুক্তির প্রধান সর্তগুলি ছিল এইরূপ—

(১) লম্বার্ডি এবং ভেনেসিয়া হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে হইবে,

(২) আল্‌পস হইতে আদ্রিয়াতিক পর্য্যন্ত সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্ট রাজ্যের সীমানা প্রসারিত হইবে,

(৩) কেন্দ্রীয় ইতালির এক অংশে একটি রাজ্য সৃষ্টি করিয়া তাঁর খুড়তুতো ভ্রাতা প্রিন্স জেরোম বোনাপার্টকে তার রাজা করিতে হইবে, (এই রাজকুমারটি ভীষণ ভীতু বলিয়া লোকে তাঁহাকে প্রিন্স প্লন প্লন বলিয়া ঠাট্টা করিত),

(৪) পোপের রাজ্য এবং নেপ্‌লস ও সিসিলি রাজ্য যেমন ছিল তেমন থাকিবে,

(৫) নেপোলিয়নকে নাইস এবং সাভয় ছাড়িয়া দিতে হইবে,

(৬) ভিক্টর ইমানুয়েলের কন্যা ক্লথিল্ডের সহিত জেরোম বোনাপার্টের বিবাহ দিতে হইবে।

কাভুর বুঝিলেন ইতালি এখন সাত টুকরা আছে, নেপোলিয়ন উহাকে চার টুকরা করিয়া রাখিতে চান। খুড়তুতো ভাইকে ইতালির বুকের উপর বসাইয়া এবং সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া বিভক্ত ইতালির উপর কর্ত্তৃত্বের ইচ্ছা তাঁর আসল মতলব ইহা বুঝিতে কাভুরের কষ্ট হইল না। তথাপি তিনি নেপোলিয়নের সমস্ত সর্ত্তে রাজী হইলেন, কারণ ফ্রান্সের সাহায্য ভিন্ন অষ্ট্রিয়া বিতাড়ন অসম্ভব।

রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল এক অপদার্থের হাতে কন্যা সম্প্রদানে আপত্তি করিলেন। কাভুর তাঁহাকে বুঝাইলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য এক কন্যা বিসর্জ্জন বড় কথা নয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি

যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরু হইল। অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিতে হইবে অথচ ইউরোপকে দেখাইতে হইবে অষ্ট্রিয়াই আক্রমণকারী, সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টে আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে এবং এই আত্মরক্ষার সংগ্রামে ফ্রান্স সৈন্য পাঠাইয়াছে। ১৮৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উৎসবে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল অষ্ট্রিয়ার রাজদূতকে বলিলেন,—আপনার দেশের সঙ্গে আমাদের আগের মত ভালভাব থাকিতেছে না বলিয়া আমি দুঃখিত। কয়েকদিন বাদে সার্দ্দিনিয়ান পার্লামেণ্ট উদ্বোধনের সময় রাজা আবার অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে কড়া কড়া কথা শুনাইলেন। অষ্ট্রিয়া সব বুঝিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে, তবু অষ্ট্রিয়া কিছু বলে না। কাভুর যখন হতাশ হইয়া সৈন্য সরাইবার আদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন ঠিক সেই সময়ে অষ্ট্রিয়া এক চরমপত্র পাঠাইয়া বলিল যে অবিলম্বে সৈন্য না সরাইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

আনন্দে অধীর হইয়া কাভুর চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এইবার আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করিব। অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইউরোপ দেখিল আক্রমণকারী অষ্ট্রিয়া। ফ্রান্সও যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ভিলাফ্রাঙ্কার যুদ্ধ বিরতি

এক মাসের মধ্যে অষ্ট্রিয়া লম্বার্ডি হইতে হটিয়া গেল। ভেনেসিয়া হইতে অষ্ট্রিয়ার বিতাড়ন আসন্ন হইল ঠিক এমনি সময় নেপোলিয়ন যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া ফরাসী সৈন্যদের ফিরিতে আদেশ দিলেন। সার্দ্দিনিয়ান সৈন্যদের স্বদেশপ্রেম ও সমর-কুশলতায় নেপোলিয়ান ভীত হইয়া ভাবিয়াছিলেন এই রাজ্যকে বড় হইতে দিলে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সার্দ্দিনিয়া শক্তিশালী হইলে ইতালির ঐক্য সাধন বিফল হইবে না। ভিলাফ্রাঙ্কায় নিজে গিয়া নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের সঙ্গে দেখা করিয়া সন্ধির সর্ত্ত ঠিক করিয়া আসিলেন।

সুনিশ্চিত জয় নষ্ট হইয়া গেল। যুদ্ধবিরতির সময় নেপোলিয়ন কাভুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিলেন না।

জুরিখের চুক্তি

জুরিখের চুক্তিতে ভিলাফ্রাঙ্কার যুদ্ধ বিরতি সর্ত্ত অনুমোদিত হইল। দুইটি দুর্গ বাদে লম্বার্ডি পিদমোণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। ভেনেসিয়া ইতালির অধীনে রহিল। কেন্দ্রীয় যে সব ডিউক-শাসিত রাজ্য হইতে অষ্ট্রিয়ান ডিউকরা বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

কাভুরের পদত্যাগ

কাভুর চটিয়া আগুন হইলেন। এই চুক্তি মানিতে ভিক্টর ইমানুয়েলকে নিষেধ করিলেন। রাজা কাভুরের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। কাভুর বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করিলেন।

মাৎসিনির জাতীয় সমিতি

বেশীদিন কাভুর সরিয়া থাকিতে পারিলেন না। পর বৎসরই আবার প্রধান মন্ত্রীর পদে ফিরিয়া আসিলেন। পারমা মোদেনা তাসকেনিতে জাতীয় সমিতি আবার বিদ্রোহ বাধাইল। ডিউকেরা ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। জাতীয় সমিতির শ্লোগান ছিল—"ঐক্য, স্বাধীনতা এবং ভিক্টর ইমানুয়েল।" মাৎসিনির অনুচরদের অনেকে জাতীয় সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডিও উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মাৎসিনি নিজে উহাতে যোগ দেন নাই, তবে বাধাও দেন নাই। এই সমিতিকে কাভুর গোপনে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

ডিউকিত্রয়ের সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্ট ভুক্তি

জুরিখ চুক্তির যে সর্ত্তে ডিউক তিনজনের ফিরিয়া আসার প্রস্তাব ছিল তাহাতে আর একটি কথা ছিল যে তাঁহাদের প্রজারা ডিউকদের ফিরাইয়া

আনিবে। প্রজারা ঠিক করিল তাহারা ডিউকদের ডাকিয়া আনা তো দূরের কথা, তাহাদিগকে ঢুকিতেই দিবে না। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি হইল। পিদমোণ্ট হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক আসিল। ভিক্টর ইমানুয়েল জুরিখ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে এই বিদ্রোহে সাহায্য করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে পামারষ্টন ইতালির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য দানে বিরত রহিলেন। নেপোলিয়ন প্লম্বিয়ার চুক্তি পূর্ণ করেন নাই বলিয়া নাইস এবং সাভয় চাহিতে পারেন নাই। তিনি নাইস, সাভয়, পারমা, মোদেনা, তাসকেনি এবং পোপের রাজ্যে যে কয় জায়গায় বিদ্রোহ হইয়াছিল সেগুলিতে একসঙ্গে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। নাইস এবং সাভয় গণভোটে এত অসাধুতা হইল যে উহারা ফ্রান্সে যোগদানের মত দিল। অবশিষ্ট সব জায়গায় সার্দ্দিনিয়া ভুক্তির ভোট হইল।

১৮৬০ সালে ভিক্টর ইমানুয়েলের রাজ্য ভেনেসিয়া বাদে আল্পস হইতে পোপের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ভিক্টর ইমানুয়েল ছিলেন সাভয় রাজবংশের সন্তান। তাঁর মাতৃভূমি সাভয় এবং গ্যারিবল্ডির জন্মভূমি নাইস বিদেশ হইয়া গেল। এই কাজের জন্য গ্যারিবল্ডি কখনও কাভুরকে ক্ষমা করেন নাই।

কাভুরের নীতি পরিবর্ত্তন

কাভুর এইবার তাঁর নীতি পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি বুঝিলেন কূটনীতির সাহায্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া ইতালির ঐক্য সাধন অসম্ভব। তিনি বিপ্লবের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরে অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন। তিনি এবার তাকাইলেন মাৎসিনি গ্যারিবল্ডি এবং জনসাধারণের দিকে। রাজাদের সাহায্য এবং বৈদেশিক চুক্তির পথ ছাড়িয়া কাভুর বিপ্লবী ইতালিয়ানদের ডাক দিলেন। মাৎসিনি এবং গ্যারিবল্ডি দেশের ডাক উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

নেপলস ও সিসিলি রাজ্যে তখন অসন্তোষের চরম চলিতেছে। রাজা দ্বিতীয় ফার্দ্দিনান্দের মৃত্যু হইয়াছে, সিংহাসনে বসিয়াছেন তাঁহার পুত্র ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ছিলেন দুর্ব্বলচিত্ত এবং নির্ব্বোধ। সমগ্র দেশে চলিয়াছে পুলিশী রাজত্ব। দুর্নীতি সর্ব্বত্র। • সিসিলিতে অসন্তোষ ছিল সবচেয়ে বেশী। রাজার স্বৈরাচার, পুলিশী অত্যাচার এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সিসিলি বদ্ধপরিকর। জাতীয় সমিতির সেক্রেটারী—লা ফারিণা নিজে ছিলেন সিসিলির লোক।

লা ফারিণা স্থির করিলেন ভিলাফ্রাঙ্কার অপমানের জবাব দিতে হইবে সিসিলি বিদ্রোহে। মাৎসিনি উহা সমর্থন করিলেন। মাৎসিনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহচর ফ্রান্সেস্কো ক্রিস্পি বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। বিদ্রোহের সাফল্য আনিলেন অবশ্য দুটি লোক—কাভুর ও গ্যারিবল্ডি।

গ্যারিবল্ডির আগমন

বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বিপ্লবী নেতারা গ্যারিবল্ডির উপস্থিতি এবং সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গ্যারিবল্ডি রাজী হইলেন এই সর্ত্তে যে ইতালি এবং ভিক্টর ইমানুয়েলের নাম বিদ্রোহের শ্লোগান হইবে। চার বৎসর আগে কাভুরের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পরে গ্যারিবল্ডি কাভুরের নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিপ্লবী নেতারা কাভুরের সাহায্যও প্রার্থনা করিলেন। কাভুর বুঝিলেন প্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতে গেলে আন্তর্জ্জাতিক অসুবিধা দেখা দিবে, অথচ এই স্বর্ণ সুযোগ ছাড়িতেও তিনি রাজি নহেন। ভিলাফ্রাঙ্কার ঘটনায় তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল। কাভুর প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ রহিলেন কিন্তু গোপনে বিদ্রোহীদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গ্যারিবল্ডির সিসিলি অভিযান

নাইস, সাভয় এবং কেন্দ্রীয় ডিউকিগুলিতে গণভোট গ্রহণ সুরু হইয়াছে। গ্যারিবল্ডি নাইস গণভোটের রূপ দেখিয়া উহার ফল কি হইবে বুঝিয়াছিলেন।

তিনি সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় মেসিনায় বিদ্রোহ সুরু হইয়া গেল।

গ্যারিবল্ডি সিসিলি রওনা হইলেন। কাভুর তাঁহাকে স্বেচ্ছাসেবক, টাকা, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সাহায্য করিলেন। প্রকাশ্যে সমস্ত দেশের রাজদূতদের তিনি জানাইয়া দিলেন এই বিদ্রোহে সার্দ্দিনিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে। জেনোয়া বন্দর হইতে গ্যারিবল্ডি সদলবলে রওনা হইলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বন্দর কর্ত্তৃপক্ষকে গোপনে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। সার্দ্দিয়ান নৌবহরের এডমিরালকে বলিয়া দেওয়া হইল যে তিনি যেন তাঁহার যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সব সময় নেপ্‌লস নৌবহর এবং গ্যারিবল্ডির জাহাজের মাঝখানে রাখেন। রাজা ভিক্টর ইমান্থয়েল শুধু একটা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়া দিলেন যে সার্দ্দিনিয়া সেনাবাহিনীর কোন অফিসার যেন গ্যারিবল্ডির স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম না লেখায়।

১৮৬০ সালের ১১ই মে গ্যারিবল্ডি এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়া সিসিলির পশ্চিম উপকূলে মেসালায় অবতরণ করিলেন। একটি বৃটিশ নৌবহর পাহারায় রহিল। বৃটিশ নৌবহরের এই সাহায্য না পাইলে গ্যারিবল্ডির পক্ষে সিসিলি অবতরণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহা ইংলণ্ডের খুব বড় অবদান।

গ্যারিবল্ডির ছিল এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক, নেপলসের সৈন্য বাহিনীতে ছিল ২০ হাজার লোক। কিন্তু গ্যারিবল্ডির নামেই ভোজবাজি হইয়া গেল। এই বিপুল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া এক মাসের মধ্যে তিনি সিসিলি অধিকার করিয়া নিজকে ডিক্টেটর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

গ্যারিবল্ডির ইতালি আগমন

গ্যারিবল্ডি এইবার ইতালির মূল ভূখণ্ডে অবতরণের আয়োজন সুরু করিলেন। মাৎসিনি নিজে তখন ইতালিতে। ক্রিস্পি গ্যারিবল্ডিকে আবার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। ইংলণ্ড উৎসাহের

সঙ্গে গ্যারিবল্ডিকে সমর্থন করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ইংলণ্ড যেদিকে যাইবে তিনি সেদিকে ঝুঁকিবেন। অষ্ট্রিয়া নিজের দেশে বিদ্রোহের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। ইতালির বিপ্লবীরা হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অষ্ট্রিয়া ইতালিতে সৈন্য পাঠাইলেই হাঙ্গেরী বিদ্রোহ করিবে। একমাত্র রাশিয়া ধমকাইতে লাগিল। নেপলসের রাজা সাহায্যের জন্য শক্তিপুঞ্জের কাছে আবেদন করিলেন। কেহ সাড়া দিল না। কাভুর চুপ করিয়া রহিলেন। নেপলসের রাজা এত ভয় পাইয়াছিলেন যে পোপের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া একদিনে পাঁচটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন।

কাভুর ও গ্যারিবল্ডিতে মতভেদ

এইবার সুরু হইল গ্যারিবল্ডি এবং কাভুরে মতভেদ। কাভুর গ্যারিবল্ডিকে অবিলম্বে সিঁসিলি সার্দ্দিনিয়াভুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডি রাজী হইলেন না।

আগষ্ট মাসে গ্যারিবল্ডি নেপলস রাজ্যে পদার্পণ করিলেন। নেপোলিয়ন গ্যারিবল্ডিকে সিসিলিতে আটকাইবার জন্য মেসিনা প্রণালীতে জাহাজ পাঠাইতে চাহিলেন কিন্তু ইংলণ্ড জানাইল ইহা ইতালির অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইহাতে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ চলিবে না। ইংলণ্ডের এই দ্বিতীয় সাহায্য গ্যারিবল্ডির পক্ষে খুব কার্য্যকরী হইল।

নেপলসের শাসনযন্ত্র ও সেনাবাহিনী আগে হইতেই পচিয়া ছিল, গ্যারিবল্ডির স্পর্শ মাত্রে উহা ধ্বসিয়া পড়িল। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি নেপলসের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। গ্যারিবল্ডির অগ্রগতিতে একমাত্র বাধা হইল স্বাধীনতার আনন্দে উৎসাহিত জনতার অভিনন্দন। সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাধা দিতে আসিলে গ্যারিবল্ডি হাত জোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের চোখের উপর চোখ রাখিতেন। সৈন্যেরা অস্ত্র

নামাইয়া নিত। নেপ্‌লসের সেনাবাহিনীর বন্দুক হইতে একটি গুলিও বাহির হইল না। রাজা পলায়ন করিলেন।

গ্যারিবল্ডি নিজেকে নেপ্‌লসের ডিক্টেটর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি তখন পূরাপূরি রিপাবলিকান হইয়াছেন কিন্তু রাজার প্রতি আনুগত্য হারান নাই। নেপ্‌লসের নৌবহর তিনি সার্দ্দিনিয়ার এডমিরালের হাতে তুলিয়া দিলেন।

গ্যারিবল্ডি এইবার রোম এবং ভেনিস অভিযানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। কাভুর এবং ভিক্টর ইমানুয়েল বুঝিলেন রোম এবং ভেনিস প্রবেশের অর্থ ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ। তাঁহারা গ্যারিবল্ডিকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডি সম্মত হইলেন না।

কাভুর দেখিলেন গ্যারিবল্ডিকে ঠেকাইতে হইলে সার্দ্দিনিয়ান সৈন্য নিয়া পোপের রাজ্য পার হইতে হয়, গ্যারিবল্ডির রোম প্রবেশ বন্ধ করিতে হয়। পোপের রাজ্যে ঢুকিতে গেলে নেপোলিয়নের অনুমতি দরকার। কাভুর নেপোলিয়নের মত চাহিলেন। নেপোলিয়ন এক কথায় জবাব দিলেন— শীঘ্র ঢোক।

পোপের একটি কাজের ছুতা ধরিয়া কাভুর তাঁহার রাজ্যে সৈন্য পাঠাইলেন। ১৮ দিনের মধ্যে পোপের রাজ্য কাভুরের অধিকারে আসিল। কাভুর এবং গ্যারিবল্ডি দুজনে রোম অভিমুখে যেন দৌড় প্রতিযোগিতা সুরু করিলেন। কাপুয়া এবং গীটা দুর্গ গ্যারিবল্ডিকে বাধা দিয়া দেরী করিয়া দিল।

পোপের রাজ্য অধিকার করিয়াই কাভুর সেখানে এবং নেপলস ও সিসিলিতে গণভোট গ্রহণ করাইলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে এই তিন জায়গাই সার্দ্দিনিয়া ভুক্তির পক্ষে মত দিল। এই গণভোটে কাভুরের শক্তি বৃদ্ধি হইল।

রাজার নিকট গ্যারিবল্ডির আত্মসমর্পণ

১৮ই অক্টোবর ১৮৬০ ইতালির ইতিহাসে এবং গ্যারিবল্ডির জীবনের পরম গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন কাভুর নেপলস রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল। গ্যারিবল্ডি রাজার হাতে নিজের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তুলিয়া দিলেন। কাভুর এবং গ্যারিবল্ডির মিলিত শক্তিতে কাপুয়া এবং গীটা দুর্গ অধিকৃত হইল।

৯ই নবেম্বর নেপ্‌লসের রাজপ্রাসাদে ভিক্টর ইমানুয়েলকে নেপলস ও সিসিলির রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গ্যারিবল্ডি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার ডিক্টেটরশিপ ত্যাগ করিলেন।

পরদিন গ্যারিবল্ডি এক বস্তা বীজগম নিয়া তাঁহার কাপরেরা দ্বীপে চলিয়া গেলেন।

১৮৬১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সার্দ্দিনিয়া পিদমোন্টের রাজধানী তুরিনে সমগ্র ইতালির প্রথম পার্লামেণ্ট আহূত হইল। মার্চ্চ মাসে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ইতালির রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ভিলাফ্রাঙ্কার অপমানের দুই বৎসরেরও কম সময়ে ইতালির ঐক্য সাধন প্রায় সম্পূর্ণ হইল। বাদ রহিল শুধু রোম এবং ভেনেসিয়া।

তিন মাসের মধ্যে ১৮৬১ সালের ৬ই জুন কাভুর পরলোকগমন করিলেন।

১৮৬৬ সালে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রুশিয়াকে সাহায্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ ভেনেসিয়া লাভ করিল।

১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর রোমের ফরাসী সৈন্য দেশে চলিয়া গেল। ইতালিয়ান সৈন্য রোম অধিকার করিল।

ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পূর্ণ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জার্ম্মেনীর ঐক্য সাধন

ইতালি ও জার্ম্মেনীর ঐক্য সাধন সংগ্রামে সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেক সময় বলা হয়। যে সাদৃশ্য আছে তাহা অতি সামান্য। ইতালিতে সার্দ্দিনিয়া পিদমোণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রধান মন্ত্রী কাভুরের নেতৃত্বে এই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ভিক্টর ইমানুয়েল অখণ্ড ইতালির রাজা হন। জার্ম্মেনীতে প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের প্রধান মন্ত্রী বিসমার্কের নেতৃত্বে সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং রাজা উইলিয়াম অখণ্ড জার্ম্মেনীর সম্রাট হন। কাভুর প্রধান মন্ত্রী হন ১৮৫২ সালে এবং নয় বৎসর বাদে ১৮৬১ সালে তাঁহার সংগ্রাম শেষ হয়। বিসমার্ক প্রধান মন্ত্রী হন ১৮৬২ সালে এবং নয় বৎসর বাদে ১৮৭১ সালে তাঁহার সংগ্রাম শেষ হয়। এই দুইটি আপাত সাদৃশ্য ছাড়া আর সব বিষয়েই দুই সংগ্রামের রূপ আলাদা।

১৮৬১ সালে প্রথম উইলিয়াম প্রুশিয়ার রাজা হন। তিনি সৎ, সাহসী এবং দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন। উইলিয়াম প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন কিন্তু একথা মানিতেন যে ভালভাবে রাজ্য শাসন করিতে গেলে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। উইলিয়ামের একটা মস্ত বড় ক্ষমতা ছিল এই যে রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত লোক তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। বিসমার্ককে যখন তিনি ডাকিয়া আনেন তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল কিন্তু তিনি কাহারও কথা শোনেন নাই। বিসমার্ককে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং বিসমার্কও তাহার প্রতিদান দিয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্টে বিসমার্ক

(প্রথম উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের আমলে ১৮৫১ সালেই বিসমার্ক নেতৃত্বের অসামান্য ক্ষমতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন।)

ফ্রেডারিক উইলিয়াম তাঁহাকে প্রথমেই মন্ত্রীত্বে গ্রহণ করিলেন না। বিসমার্কের রাজনীতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে প্রুশিয়ার প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের ফেডারেল পার্লামেণ্টে। আট বৎসর ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকিয়া বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার রাজনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়া লইলেন। তারপর ফ্রেডারিক উইলিয়াম তাঁহাকে পাঠাইলেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানিয়া লইলেন। ইহার পর কয়েক মাস প্যারিস, কিছুদিন ভিয়েনা এবং লণ্ডনে কাটাইয়া আসিলেন। কাভুর ছাড়া ইউরোপের প্রত্যেক বড় রাজনীতিবিদের সঙ্গে বিসমার্কের ব্যক্তিগত পরিচয় হইয়া গেল।

ফ্রাঙ্কফুর্টে বিসমার্ক বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে জার্ম্মান ঐক্য সাধন করিতে গেলে প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সম্পর্ক আগে ঠিক করিতে হইবে, অন্য জর্ম্মান রাজ্যগুলির দিকে পরে মন দিলেই চলিবে। অষ্ট্রিয়া ছিল জর্ম্মান কনফেডারশনের প্রেসিডেণ্ট। সুযোগ পাইলেই প্রুশিয়াকে অপমান করিয়া অষ্ট্রিয়া বুঝাইয়া দিত যে প্রুশিয়ার স্থান অষ্ট্রিয়ার নীচে। অতি ছোটখাট ব্যাপারেও অষ্ট্রিয়ার এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিত। বিসমার্ক অত্যন্ত খুঁটিনাটি ঘটনাও উপেক্ষা করিতেন না। কনফেডারেশনের কমিটির বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধি ছাড়া কেহ ধূমপান করিত না। বিসমার্কও তাঁর সঙ্গে সিগার ধরাইতে শুরু করিলেন। একদিন বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ান প্রতিনিধির ঘরে আমন্ত্রিত হইয়া ঢুকিয়া দেখিলেন তিনি শুধু সার্ট গায়ে বসিয়া আছেন, বিসমার্ক তৎক্ষণাৎ নিজের কোটটি খুলিয়া নিয়া বলিলেন,—বাস্তবিকই বড্ড গরম পড়িয়াছে।

অষ্ট্রিয়া বহিষ্কারের সঙ্কল্প

বিসমার্ক প্রথমেই কাষ্টমস ইউনিয়ন ৎসোলফেরাইন হইতে অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া রাখিলেন। এই ইউনিয়নের গুরুত্ব অষ্ট্রিয়া যখন বুঝিল তখন উহা ভাঙ্গিবার মতলবে উহাতে ঢুকিতে চাহিল। বিসমার্ক কাষ্টমস

ইউনিয়নে অষ্ট্রিয়ার প্রবেশ বন্ধ করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। বিসমার্ক তাহা করিতে দিলেন না। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন প্রুশিয়ার ভাবী সংগ্রামে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়িতে হইবে এবং রাশিয়ার সাহায্য দরকার হইবে। বিসমার্ক নিজে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলেন। প্যারিসে কয়েক মাস থাকিয়াই তিনি তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং তাঁর মন্ত্রীদের চরিত্র বুঝিয়া নিয়াছিলেন।

(১৮৬২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিসমার্ক প্রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। প্রধান মন্ত্রী হইয়াই বিসমার্ক বলিলেন,—"আজিকার বৃহত্তম প্রশ্নের মীমাংসা দীর্ঘ বক্তৃতা এবং প্রস্তাবে হইবে না, তার জন্য চাই রক্ত আর ইস্পাত" (blood and iron). জর্ম্মান পার্লামেণ্টের বিরোধীদল ক্ষেপিয়া গেল। বিসমার্ক পার্লামেণ্টের নাম দিলেন "বাক্য গৃহ"—house of phrases। পার্লামেণ্টে যাওয়াই তিনি ছাড়িয়া দিলেন। চার বৎসর বিসমার্ক পার্লামেণ্ট বাদ দিয়া রাজ্য চালাইলেন। বাজেট পর্য্যন্ত পাশ করাইতেন না। বিরোধী দল বলিয়াছিল তাহারা এক বৎসরের বেশী বিসমার্ককে টিঁকিতে দিবে না, বিসমার্ক একাদিক্রমে ২৮ বৎসর প্রধান মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ডিসরায়েলি তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। ডিসরায়েলি বলিয়াছিলেন—ঐ লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিও, সে যাহা ভাবে তাহা করে।

রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জ্জন

(১৮৬৩ সালে পোলাণ্ডে বিদ্রোহ হইল। সমগ্র ইউরোপ বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল।) প্রুশিয়ার জনসাধারণ চাহিল তাহাদের গবর্ণমেণ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলদের সাহায্য করুক। বিসমার্ক বলিলেন— „নিজের দেশের ক্ষতি করিয়া পরের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা জর্ম্মানদের একটি রাজনৈতিক রোগ বিশেষ।"

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামে রাশিয়ার সাহায্য অপরিহার্য্য ছিল। পোলদের সাহায্য করিতে গেলে রাশিয়াকে হারাইতে হয়। বিসমার্ক রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিলেন। আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে সে-সব বিদ্রোহ দমন করিলেন। ওয়ারশ এবং বার্সিলোনার বিপ্লবী কমিটিরা বিসমার্কের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। প্রুশিয়ার প্রগতিশীলরা বিসমার্ককে একঘরে করিবার প্রস্তাব পাশ করিল। বিসমার্ক গ্রাহ্যও করিলেন না। জার্ম্মেনীর বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামে অপরিহার্য্য রাশিয়ার সাহায্য লাভ করিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত।

কনফেডারেশন সংস্কারের প্রস্তাব

১৮৬৩ সালে আর একটি বড় ঘটনা ঘটিল। অষ্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সিস যোসেফ জর্ম্মান কনফেডারেশন সংস্কারের জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে জর্ম্মান রাজাদের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন এবং প্রুশিয়ারাজ উইলিয়ামকে নিজে নিমন্ত্রণ করিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট সমবেতভাবে ও সাক্সোনির রাজাকে দিয়া আর এক দফা নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। উইলিয়াম অভিভূত হইলেন এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। আপত্তি করিলেন বিসমার্ক। বিসমার্ক বুঝিলেন উইলিয়ামকে সঙ্গে রাখিয়া কনফেডারেশনের নিয়মকানুন কিছুটা বদলাইয়া নিজের প্রেসিডেণ্ট পদ আরও পাকা করাই অষ্ট্রিয়ার আসল মতলব। উইলিয়াম সম্মেলনে গেলে ইহাতে বাধা দিতে পারিবেন না, মানিয়া আসিবেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—এই সম্মেলনে যাওয়া চলিবে না। রাণী বিসমার্কের উপর কোনদিনই প্রসন্ন ছিলেন না, তিনি রাজাকে সমর্থন করিলেন। বিসমার্ক পদত্যাগের ভয় দেখাইলেন। তখন বাধ্য হইয়া রাজা বিসমার্কের মতে মত দিয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্মেলনে যাত্রা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিসমার্ক লিখিতেছেন—"রাজাকে দিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইতে আমার মাথার ঘাম বাহির হইয়া গিয়াছিল। যখন রাজা আমার কথা মানিয়া নিলেন তখন আমি এত পরিশ্রান্ত যে দাঁড়াইতে পারিতেছি না। ঘর হইতে যখন বাহির হইলাম

তখন আমায় পা টলিতেছে। আমি এত উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে বাহির হইতে যখন দরজা ঠেলিয়া দিলাম তখন দরজার হাতল উড়িয়া গেল।" নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হইয়া উইলিয়াম কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিসমার্ক কতকগুলি কাঁচের বাসনপত্র ছুঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া মনের আবেগ সামলাইলেন। উইলিয়ামের অনুপস্থিতিতে অষ্ট্রিয়ার চাল ব্যর্থ হইয়া গেল, রাজন্য সম্মেলন জমিল না। অষ্ট্রিয়া বুঝিল জার্ম্মেনীর উপর কর্ত্তৃত্বের দিন তার ফুরাইয়াছে।

শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইন সমস্যা

শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইন প্রশ্নে বোঝা গেল বিসমার্ক কত বড় কূটনীতি বিশারদ।

ডেনমার্কের দক্ষিণে দুটি জর্ম্মান ডিউকি ছিল—শ্লেসউইগ এবং হোলষ্টাইন। ইহাদের শাসক ছিলেন ডেনমার্কের রাজা কিন্তু ডেনমার্ক রাজ্যের সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। যিনি ডেনমার্কের রাজা হইবেন তিনি ঐ সঙ্গে শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইনের ডিউকও থাকিবেন, রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকিবে ইহাই ছিল ব্যবস্থা। শ্লেসউইগের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ডেনিশ, হোলষ্টাইনের জর্ম্মান। শ্লেসউইগের ডেনিশ অধিবাসীরা চাহিল ডেনমার্কের সহিত উহা মিলিত হউক, হোলষ্টাইন চাহিল ডেনমার্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জার্ম্মেনীর সহিত মিলন।

এই যখন অবস্থা তখন দেখা দিল ডিউকিদ্বয়ের উত্তরাধিকার সমস্যা। ১৮৪৮ সালে ডেনমার্কের রাজা ও ডিউকিদ্বয়ের ডিউক সপ্তম ফ্রেডারিক ডেনিশ পার্টির প্ররোচনায় তিন রাজ্যের জন্য এক সংবিধান চালু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই ডিউকিতেই বিদ্রোহ ঘটিল। হোলষ্টাইনের জর্ম্মানেরা জার্ম্মেনী হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইল এবং তিন বৎসর বিদ্রোহ চালাইল। প্রুশিয়া বিদ্রোহীদের সমর্থন করিল কিন্তু ইংলণ্ড, রাশিয়া, সুইডেন এবং অষ্ট্রিয়া সহানুভূতি দেখাইল ডেনমার্কের দিকে।

লণ্ডন সিদ্ধান্ত

মীমাংসার জন্য লণ্ডনে এক সম্মেলন আহূত হইল। স্থির হইল ডিউকিদের সঙ্গে ডেনমার্কের পূর্ব্ব সম্পর্ক বজায় থাকিবে, উহাদের ডেনমার্ক-ভুক্তি হইবে না। সপ্তম ফ্রেডারিক ছিলেন ওলডেনবার্গ বংশের শেষ রাজা। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্থির হইল তাঁহার মৃত্যুর পর গ্লুকসবার্গের ক্রিশ্চিয়ান ডেনমার্কের রাজা এবং ডিউকিদ্বয়ের ডিউক হইবেন। উত্তরাধিকারে ক্রিশ্চিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী অগষ্টেনবার্গের ডিউক তাঁহার দাবী ছাড়িয়া দিলেন। এই চুক্তিতে প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া দুজনই স্বাক্ষর করিল।

ডেনমার্কের চুক্তি-ভঙ্গ

ডেনমার্ক এই চুক্তি মানিয়া চলিল না। আবার এক সংবিধান জারী করিয়া তাহারা উহা তিন রাজ্যে সমানভাবে প্রয়োগ করিল। এই সংবিধান-মতে দুই ডিউকির সমস্ত রাজস্ব ডেনমার্কের ট্রেজারিতে জমা হইবে, সেখান হইতে উহা খরচ হইবে। কোপেনহেগেন পার্লামেণ্টে ডেনিশ মেজরিটিতে উহাদের আইন পাশ হইবে। হোলষ্টাইনের জর্ম্মানরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। সপ্তম ফ্রেডারিক নূতন সংবিধান হইতে হোলষ্টাইনকে বাদ দিলেন। ডেনিশ পার্টি ইহা মানিল না। তাহারা রাজার উপর এমন চাপ দিল যে রাজা হোলষ্টাইনকে পুরাপুরি ডেনমার্কভুক্ত করিলেন। জর্ম্মান কনফেডারেশনের পার্লামেণ্ট ইহার প্রতিবাদ করিলে ডেনমার্ক তাহা গ্রাহ্য করিল না।

হোলষ্টাইনে জর্ম্মান হস্তক্ষেপ

১৮৬৩ সালের নবেম্বরে ফ্রেডারিকের মৃত্যু হইল এবং লণ্ডন কনভেনশন মতে ক্রিশ্চিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিকের আদেশ সমর্থন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই ডিউকিতে আবার বিদ্রোহ ঘটিল। অগষ্টেনবার্গের যে ডিউক তাঁর উত্তরাধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁর পুত্র ফ্রেডারিক বিদ্রোহীদের সমর্থনে সিংহাসন দাবী করিলেন। জর্ম্মান পার্লামেণ্ট

হোলষ্টাইনের সাহায্যে সৈন্য পাঠাইলেন। অগষ্টেনবার্গের ডিউক অষ্টম ফ্রেডারিক উপাধি নিয়া নিজেকে শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইনের ডিউক ঘোষণা করিলেন।

বিসমার্কের কূটনীতির প্রথম পরিচয়

বিসমার্ক দেখিলেন তিনি একা ডেনমার্ক আক্রমণ করিলে অষ্ট্রিয়া পিছনে শত্রু হইয়া থাকিবে। অথচ ডিউকিদ্বয় গ্রাস করা তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। ডিউকিদ্বয়ের বিদ্রোহীদের প্রতি জর্ম্মান জনসাধারণের প্রভূত সহানুভূতি ছিল। কাউণ্ট রেখবার্গ তখন অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বিসমার্ক তাঁহাকে বুঝাইলেন তিনি যদি সঙ্গে থাকেন তো ভাল, নচেৎ বিসমার্ক একাই ডিউকিদ্বয়ের মুক্তিসংগ্রামে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবেন। দুজনে গোপনে চুক্তি হইল যে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া আর কাহাকেও না জানাইয়া এই কাজ করিবে।

অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া ডেনমার্ককে চরমপত্র দিল যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নবেম্বর সংবিধান প্রত্যাহার করিতে হইবে। ডেনমার্ক চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করিল এই আশায় যে আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড তাহাকে সাহায্য করিবে। অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া ডিউকিদ্বয় অধিকার করিয়া ডেনমার্ক আক্রমণ করিল। ডেনমার্কের জন্য অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামিতে ইংলণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, রাশিয়া কেহই আসিল না। আবার লণ্ডন সম্মেলন আহূত হইল।

লণ্ডন বৈঠকে আপোষের প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিসমার্ক ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

গ্যাষ্টাইন চুক্তি

অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া আবার ডেনমার্ক আক্রমণ করিল। কেহই তাহার সাহায্যে আসিল না দেখিয়া ডেনমার্ক আত্মসমর্পণ করিল। শ্লেসউইগ হোলষ্টাইনের উপর ডেনমার্ক সকল অধিকার ত্যাগ করিল। সমুদ্র উপকূলে প্রুশিয়ার কোন জায়গা ছিল না, বিশেষভাবে এই কারণে অন্ততঃ হোলষ্টাইন দখলের জন্য বিসমার্ক বদ্ধপরিকর ছিলেন। এত দূরে জমি রাখার ইচ্ছা অষ্ট্রিয়ার

ছিল না। বিসমার্ক দেখিলেন তিনি একা ডিউকিদ্বয় অধিকার করিলে ইউরোপ মনে করিবে দেশ দখলের জন্য তিনি যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়াকে সঙ্গে রাখিতেই হইবে, এবং এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন ইউরোপ বোঝে যে দেশ দখলের উদ্দেশ্য অষ্ট্রিয়ারই ছিল, প্রুশিয়া পিছন পিছন গিয়াছে মাত্র। গ্যাষ্টাইনে বসিয়া চুক্তি হইল যে ডিউকিদ্বয়ের উপর সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব দুজনেরই থাকিবে, তবে অষ্ট্রিয়া হোলষ্টাইন ও প্রুশিয়া শ্লেসউইগ শাসন করিবে। হোলষ্টাইন প্রুশিয়ার অধিকতর নিকটে, ডেনমার্ক এবং হোলষ্টাইনের মাঝখানে শ্লেসউইগ। তা ছাড়া হোলষ্টাইনের অধিবাসী জর্ম্মান। বিসমার্ক এইটি গছাইলেন অষ্ট্রিয়াকে। তিনি জানিতেন দেশ হইতে এত দূরে একটি জর্ম্মান রাজ্য অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা অষ্ট্রিয়ার নাই।

সমগ্র ইউরোপ বিসমার্কের কূটনীতির প্রথম পরিচয় লাভ করিল। শ্লেসউইগ-হোলষ্টাইন সমস্যা বিসমার্কের কূটনীতির প্রথম বীজ মাত্র। এইবার স্থরু হইল দ্বিতীয় বীজ—জর্ম্মান কনফেডারেশন হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়ন।

অষ্ট্রিয়া আক্রমণের সঙ্কল্প

বিসমার্ক বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য, যুদ্ধ ছাড়া অষ্ট্রিয়াকে তাড়ানো যাইবে না। অজুহাতের অভাব হইবে না, হোলষ্টাইন হইতে অনেক মিলিবে।

যুদ্ধে নামিবার আগে স্থরু হইল বিসমার্কের কূটনীতির খেলা। অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিতে হইলে রাশিয়া এবং ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখিতে এবং ইতালিকে নিজের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত করিতে হইবে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং পোলবিদ্রোহে রাশিয়াকে সাহায্য করিয়া তার বন্ধুত্ব আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিসমার্ক নিজে নেপোলিয়ানের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।

বিয়ারিজে বিসমার্ক

১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসে বিস্কে সাগর তীরে বিয়ারিজ প্রাসাদে বিসমার্ক এবং নেপোলিয়নের পরামর্শ হইল। কোন লোক বা কাগজ কলম সেখানে

রহিল না। একমাত্র তৃতীয় প্রাণী উপস্থিত ছিল—নেপোলিয়নের কুকুর নিরো। বিয়ারিজের গুপ্ত বৈঠকে স্থির হইল—

(১) অষ্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবে,

(২) অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে প্রুশিয়া শ্লেসউইগ হোলষ্টাইন অধিকার করিবে,

(৩) প্রুশিয়ার সঙ্গে ইতালি যুদ্ধে নামিলে ভেনেসিয়া পাইবে,

(৪) প্রুশিয়া জর্ম্মান কনফেডারেশন পুনর্গঠন করিলে ফ্রান্স আপত্তি করিবে না।

বিনিময়ে বিসমার্ক প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জর্ম্মান কোন রাজ্য ছাড়া আর যে কোন দেশের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া নিলে তিনি চোখ বুঁজিয়া থাকিবেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বেলজিয়ামের ফরাসীভাষাভাষী অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য বিসমার্ক নেপোলিয়নকে পরামর্শ দিলেন। পরে সম্পত্তি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিসমার্ক নিজের কাজ উদ্ধার করিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়াই নেপোলিয়নের সঙ্গে কথাবার্ত্তার একটি নোট তৈরি করিয়া নিজের দেরাজে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন।

বিসমার্কের প্রস্তাবে নেপোলিয়নের সম্মত হওয়ার কারণ ছিল। তিনি নিজে এবং তাঁর মন্ত্রীরা কেহই বিশ্বাস করেন নাই যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রুশিয়া জিতিতে পারিবে। তাঁহারা ধরিয়া নিয়াছিলেন যে প্রুশিয়া হারিবে এবং তখন ফ্রান্স অন্ততঃ ছোট কয়েকটি জার্ম্মান রাজ্য কুক্ষিগত করিতে, রাইন নদী ধরিয়া নিজের সীমানা বাড়াইয়া লইতে পারিবে। নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিশেষভাবে এই আশার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাকে বিসমার্কের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। বিসমার্ক নেপোলিয়নকে করিলেন পরের সম্পত্তি দান, নেপোলিয়ন ভাবিলেন যা শত্রু পরে পরে।

ইতালির সঙ্গে চুক্তি

অনেক দরকষাকষির পর ইতালির সঙ্গে গোপনে চুক্তি হইল—প্রুশিয়া অষ্ট্রিয়াকে সম্মুখ দিকে আক্রমণ করিবে, ইতালি আক্রমণ করিবে পিছনে।

কূটনৈতিক ছক যদি বা ঠিক হইয়া গেল তো বাধা হইয়া দাঁড়াইলেন রাজা উইলিয়াম। অষ্ট্রিয়া আক্রমণের অর্থ ভাইকে আক্রমণ বলিয়া উইলিয়াম বাঁকিয়া বসিলেন। এবারও বিসমার্কই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইলেন। উইলিয়ামের আশঙ্কা ছিল যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতে পারে। বিসমার্ক সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাজাকে দেখাইয়া দিলেন পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীকে ফন মোল্‌ট্‌কে এবং ফন রূণ এই দুই জেনারেলের সহায়তায় তিনি দুর্দ্ধর্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রক্তের অভিযানে বাহির হওয়ার আগে ইস্পাত তৈরিতে তিনি মনোযোগ দিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই।

বিসমার্ক জার্ম্মান কনফেডারেশন সংস্কারের নামে অষ্ট্রিয়াকে খোঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। অষ্ট্রিয়া বিপদ বুঝিয়া আগে ইতালির সঙ্গে প্রুশিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল। বিনা যুদ্ধে ইতালিকে ভেনেসিয়া প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং আরও লোভ দেখাইল যে, ইতালি প্রুশিয়ার পূর্ব্ব সাইলেসিয়া প্রদেশ কাড়িয়া নিলে সে নিজে তো সমর্থন করিবেই, ফ্রান্সের সমর্থনও সংগ্রহ করিয়া দিবে। ইতালি অষ্ট্রিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

ফ্রান্সের প্রস্তাব

ফ্রান্সে একমাত্র থিয়ের বিসমার্কের মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ফরাসী পার্লামেন্টে বলিলেন,—বিসমার্কের মতলব অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জর্ম্মানীর ঐক্য সাধন করা; জার্ম্মেনীকে অখণ্ড দেশে পরিণত হইতে ফ্রান্স কিছুতেই দিবে না। নেপোলিয়ন থিয়েরের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইলেন না। তবে ভাবিলেন যে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করাই ভাল। তিনি এক ইউরোপীয় কংগ্রেস ডাকিলেন। ইংলণ্ড ও রাশিয়া তাঁহাকে সমর্থন করিল। বিসমার্কের সমস্ত প্লান ব্যর্থ হইতে বসিল এমন সময় অষ্ট্রিয়া নিজেই বিসমার্কের সুবিধা করিয়া দিল। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য অষ্ট্রিয়া এমন সব সর্ত্ত উপস্থিত করিল যে তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব। কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব বাতিল হইল।

হোলষ্টাইন অধিকার

বিসমার্ক হোলষ্টাইনে বিরোধ বাধাইয়া দিলেন। গ্যাষ্টাইন চুক্তি বাতিল করিয়া তিনি হোলষ্টাইন অধিকার করিলেন। অষ্ট্রিয়া জর্মান কনফেডারেশনে দাবী তুলিল যে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে ফেডারেল সৈন্য পাঠাইতে হইবে। প্রুশিয়া প্রস্তাব আনিল যে কনফেডারেশনের সংবিধান বদলাইতে হইবে। ভোটে প্রুশিয়া হারিয়া গেল। অতঃপর প্রুশিয়া কনফেডারেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

সাডোয়ার যুদ্ধ

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতালি পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিল। জার্মেনীর কতকগুলি ছোট রাজ্য অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিল। অষ্ট্রিয়ার লোকবল প্রুশিয়ার দ্বিগুণেরও বেশী। প্রুশিয়ার সৈন্য সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ, অষ্ট্রিয়ার আট লক্ষ। প্রুশিয়ার সৈন্য সংখ্যায় কম হইলেও দক্ষতায় তাহারা শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রমাণিত হইল। মোলট্‌কে কত বড় জেনারেল তাহারও পরিচয় মিলিল। প্রুশিয়ার ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণ অষ্ট্রিয়া সাত সপ্তাহের বেশী সহ্য করিতে পারিল না। সাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অষ্ট্রিয়ার মনোবল ভাঙ্গিয়া গেল।

রাজা উইলিয়ামের মনে তখন দারুণ উৎসাহ। তিনি বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়া ভিয়েনা প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আপত্তি করিলেন বিসমার্ক। তিনি বলিলেন,—অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট, তাহাকে অপমান করা নির্বুদ্ধিতা হইবে। বিসমার্ক জানিতেন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ভিন্ন জার্মেনীর ঐক্য সম্পূর্ণ হইবে না। তখন অষ্ট্রিয়ার সাহায্য প্রয়োজন হইবে। গতকালের বন্ধু আজকের শত্রু হইয়াছে, আবার আগামীকাল তাহাকে বন্ধুরূপে সঙ্গে রাখিতে হইবে। ভিয়েনা প্রবেশে বিসমার্কের আপত্তির বাস্তব কারণও ছিল। ফ্রান্স এবং রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে আসিতে পারে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। বিসমার্ক সময় দিতে চাহেন নাই। ইতালির সঙ্গে মিতালী মূল্যহীন প্রমাণিত হইয়াছিল, প্রথম যুদ্ধেই ইতালি হারিয়া গিয়াছিল।

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধিতে বিসমার্ক কোন অসম্ভব বা অপমানজনক সর্ত্ত আরোপ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—প্রুশিয়ার সামরিক শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে, অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণ কনফেডারেশন হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, জার্ম্মেণীর ঐক্য এখন প্রুশিয়ার হাতে,—ইহাই যথেষ্ট। অষ্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনেশিয়া ফেরৎ দিল। প্রুশিয়াকে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিল। পুরাণো কনফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দিল এবং অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া গঠিত উত্তর জার্ম্মাণ ইউনিয়ন অনুমোদন করিল। শ্লেসউইগ, হোলষ্টাইন, হানোভার, হেস-নাসাউ, ফ্রাঙ্কফুর্ট সহর প্রভৃতি ২৮ হাজার বর্গমাইল জমিসহ প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইতালি এবং জার্ম্মেনী হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হইল।

প্রুশিয়ার জয়ে ফ্রান্সের ক্রোধ

১৮৬৬ সালের অষ্ট্রিয়া-প্রুশিয়ান যুদ্ধে সাডোয়ার প্রাঙ্গণে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়কে ফ্রান্স নিজের পরাজয় বলিয়া মনে করিল। নেপোলিয়নের এবং মন্ত্রীদের আশা চূর্ণ হইল। নিরপেক্ষতার মূল্য স্বরূপ নেপোলিয়ন বিসমার্কের নিকট কিছু ক্ষতিপূরণ চাহিতে গিয়াছিলেন। বিনামূল্যে যাহা অধিকার করিয়াছেন তার জন্য পরে মূল্য দেওয়া বিসমার্কের কোষ্ঠীর বাহিরে। নেপোলিয়ন কূটনীতিতে বিসমার্কের নিকট পদে পদে পরাজিত হইলেন।

অষ্ট্রিয়ার পর ফ্রান্সের পালা। দক্ষিণ জার্ম্মেণীর রাজ্য বাভেরিয়া, বাডেন, উরটেমবুর্গ, হেসডার্ম্মষ্টাড যাহাতে জার্ম্মাণ ইউনিয়নে যোগ না দেয়, ফ্রান্স তার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চারিটিকে ইউনিয়নে আনিতে পারিলেই জার্ম্মাণ ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ভিন্ন ইহা সম্ভব নয়। বিসমার্ক বলিলেন,—ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মেণীর অভ্যুদয় ফ্রান্সের আন্তর্জ্জাতিক প্রেষ্টিজের পক্ষেও ক্ষতিকর হইতে লাগিল।

ফ্রান্স কর্তৃক লুক্সেমবুর্গ অধিকারের প্রস্তাব

নেপোলিয়ন বিসমার্কের নিকট হইতে কিছু আদায়ের আশা ছাড়িতে পারিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বেলজিয়ামের অংশ কাড়িয়া নেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। ফরাসী রাজদূতের স্বহস্ত লিখিত এই দলিলটিকেও বিসমার্ক দেরাজে বন্ধ করিলেন। বিসমার্ক নেপোলিয়নকে রীতিমত খেলাইতে আরম্ভ করিলেন। বেলজিয়াম সম্বন্ধে বিসমার্ক কিছু বলেন না দেখিয়া নেপোলিয়ন লুক্সেমবুর্গ চাহিলেন। লুক্সেমবুর্গ একটি ছোট ডিউক-শাসিত রাজ্য। আগে ছিল বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত। পরে উহা হলাণ্ডের রাজাকে দেওয়া হয়। তিনিই তখন উহার শাসক। লুক্সেমবুর্গ আবার জার্ম্মাণ কাষ্টমস ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহার অনেক অধিবাসী ফরাসী। নেপোলিয়ন হল্যাণ্ডের রাজার নিকট লুক্সেমবুর্গ কিনিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। তিনি জানাইলেন প্রুশিয়া রাজি হইলে উহা বিক্রয় করিবেন। এই প্রস্তাব প্রকাশ পাইবামাত্র জার্ম্মেণীতে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিল। বিসমার্ক ফরাসীদূত বেনেদিতি এবং হলাণ্ডের রাজা দুজনকেই জানাইয়া দিলেন যে প্রুশিয়া লুক্সেমবুর্গ হস্তান্তর সমর্থন করে না। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী থিয়ের হুঙ্কার দিলেন—জার্ম্মাণ ঐক্য আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। বিসমার্ক জবাব দিতে দেরী করিলেন না। দক্ষিণের চারিটি রাজ্যের সঙ্গেই তিনি গোপনে জার্ম্মাণ ইউনিয়ন ভুক্তির চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিলেন। হলাণ্ডের রাজা ভয় পাইয়া ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মেণীর অমতে লুক্সেমবুর্গ বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলেন।

নেপোলিয়ন বলিলেন—বিসমার্ক আমাকে বেকুব বানাইয়াছেন। তাঁহার পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলিলেন,—বিসমার্ক আমাদের লোভ দেখাইয়া এমন এক জায়গায় টানিয়া নিয়াছেন যেখান হইতে ফিরিবার পথ নাই; আমরা সমগ্র ইউরোপের চোখে বে-ইজ্জত হইয়াছি।

বিসমার্ক ফ্রান্সকে ক্ষেপাইয়া যুদ্ধে নামাইতে চাহিতেছিলেন। প্রুশিয়া প্রস্তুত ছিল কিন্তু ফ্রান্স প্রস্তুত নহে ইহা তিনি জানিতেন। নেপোলিয়ন

আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। মুখরক্ষা করিয়া পশ্চাদপসরণের এক ফরমূলা আবিষ্কৃত হইল। লুক্সেমবুর্গের এক দুর্গে বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রুশিয়ান সৈন্য ছিল। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী দাবী করিলেন প্রুশিয়ান সৈন্য সরাইতে হইবে।

রাশিয়া এক কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব করিল। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হইল—লুক্সেমবুর্গকে নিরপেক্ষ রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, উহাকে আন্তর্জ্জাতিক রক্ষণাধীনে রাখা হইবে, দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রুশিয়ান সৈন্য সরানো হইবে।

এই প্রস্তাবকে ফরাসীরা বলিল ফ্রান্সের জয়, জর্ম্মাণরা বলিল জার্ম্মেণীর জয়।

তিন বছর সব চুপচাপ। বিসমার্ক গোপনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জাল পাতিলেন। রাশিয়া সঙ্গেই ছিল। অষ্ট্রিয়া এবং ইতালিও প্রুশিয়ার পক্ষে রহিল। নেপোলিয়ন ইতালিকে ভাঙ্গাইতে চাহিলেন। রোমে ফরাসী সৈন্য থাকিতে ইতালি ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। রোম হইতে সৈন্য সরাইলেই ইতালি রোম অধিকার করিবে। নেপোলিয়ন ইহা চাহিলেন না। কূটনৈতিক দিক দিয়া ফ্রান্স একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িল।

স্পেন সিংহাসনের সমস্যা

১৮৬৮ সালের এক ঘটনা বিসমার্কের প্রত্যাশিত সুযোগ আনিয়া দিল। ঐ বৎসর স্পেনে বিদ্রোহ হইল এবং রাণী ইসাবেলা সিংহাসন হইতে বিতাড়িতা হইলেন। দুই বৎসর ধরিয়া স্পেনীয় নেতারা সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন। জর্ম্মাণ হোহেনজোলার্ণ বংশের প্রিন্স চার্লস ১৮৬৬ সালে রুমানিয়ার রাজপদে আমন্ত্রিত হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি এমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে স্পেনীয় নেতারাও ভাবিলেন ঐ বংশের রাজপুত্র আনিলে ভাল রাজা পাওয়া যাইবে। চার্লসের ভ্রাতা লিওপোল্ডকে তাঁহারা স্পেনের সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বিসমার্ক লিওপোল্ডকে এই প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। লিওপোল্ড অস্বীকার করিলেন। স্পেনকে এই আপত্তির কথা জানাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৭০ সালের মার্চ মাসে এই ঘটনা ঘটিল।

জুন মাসে বিসমার্ক স্পেনের সমরসচিব মার্শাল প্রিমকে বলিলেন যে প্রস্তাবটা আবার যেন বার্লিনে পাঠানো হয়। প্রস্তাব আসিল এবং লিওপোল্ড এবার উহা গ্রহণ করিলেন।

এই সংবাদে ফ্রান্সের সংবাদপত্রেরা ক্ষেপিয়া গেল। একদিকে ঐক্যবদ্ধ বিশাল জার্ম্মেণী, অপরদিকে স্পেনের সিংহাসনে বসিবে জর্ম্মাণ রাজবংশের রাজা। ফ্রান্স প্রমাদ গণিল এবং ভীষণ আপত্তি জানাইল। ফ্রান্স দাবী করিল—লিওপোল্ডকে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

ফ্রান্সের প্রতিবাদকে জার্ম্মেণী চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করিল।

এমস টেলিগ্রাম

ফরাসী দূত বেনেদিত্তি বার্লিনে বিসমার্কের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সেক্রেটারীরা জানাইলেন তিনি সহরে নাই এবং স্পেনের সিংহাসন বিষয়ে প্রস্তাব জর্ম্মাণ রাজবংশের ঘরোয়া ব্যাপার, উহার সঙ্গে মন্ত্রীদের কোন সম্পর্ক নাই।

রাজা উইলিয়াম ছিলেন এমসের স্বাস্থ্যনিবাসে। বেনেদিত্তি ছুটিলেন সেখানে। রাজা খুব ভদ্র ও সংযতভাবে ফরাসী দূতকে জানাইলেন যে প্রস্তাবটি রাজকুমারের নিজের বিবেচনার বিষয়, তিনি কিছু বলিতে পারেন না। তবু তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্ম টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইল।

ফ্রান্স ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। বেনেদিত্তি আবার রাজা উইলিয়মের নিকট গিয়া দাবী করিলেন যে হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের কেহ কখনো স্পেনের সিংহাসনে বসিবার প্রস্তাব আসিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। লিওপোল্ড একবারের জন্মও যে এই প্রস্তাব

গ্রহণ করিয়াছিলেন তার জন্য রাজা উইলিয়ামকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে এই দাবীও করা হইল এবং প্যারিসে এরূপ এক চিঠি মুসাবিদা করিয়া তাহা রাজা উইলিয়ামের স্বাক্ষরের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। একটা সমগ্র জাতির এবং একজন রাজার এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছুই হইতে পারে না। ১৩ই জুলাই বেনেদিতি রাজা উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্সের প্রস্তাব জানাইলেন। উইলিয়াম শান্ত দৃঢ়তার সহিত উহা অগ্রাহ্য করিলেন।

১২ই জুলাই বিসমার্ক শুনিলেন লিওপোল্ড আবার সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি ভয়ানক দমিয়া গেলেন। পরদিন ১৩ই জুলাই ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য আলোচনার জন্য মোল্‌টকে এবং রূণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিন জনেরই মন খারাপ। সম্মুখে বিরাট ভোজ, কিন্তু আহারে কাহারও রুচি নাই। যুদ্ধ বুঝি হইল না। বিসমার্ক পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেনাপতিদ্বয় জানাইলেন তাঁহারা সৈনিক, তাঁহাদের পক্ষে পদত্যাগ সম্ভব নহে। এমনি সময় এমস হইতে রাজার টেলিগ্রাম আসিল। সকালে বেনেদিতির সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে উইলিয়াম টেলিগ্রামে তাহা বিসমার্ককে জানাইয়াছেন। বিসমার্ক মোলটকে এবং রূণকে টেলিগ্রামটি পড়িয়া শুনাইলেন। সেনাপতি দুজনের মন এত খারাপ হইয়া গেল যে তাঁহারা একেবারে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বিসমার্ক টেলিগ্রামটির কয়েকটি বাক্য ও কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়া আবার পড়িলেন এবং বলিলেন,—এই টেলিগ্রাম যদি প্যারিসের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে উহা ফরাসী ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড়ের কাজ করিবে। তিনজনে এইবার মনের আনন্দে ভোজ্য এবং পানীয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

এমস টেলিগ্রামের একটি শব্দও বদলাইতে হইল না, উহা সংক্ষিপ্ত করা হইল মাত্র। তাহাতে উহার মর্ম্মার্থ দাঁড়াইল এই যে রাজা উইলিয়াম ফরাসী দূত বেনেদিতিকে অপমান করিয়াছেন। পরদিন ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় উৎসবের দিন। ঐ দিনই প্যারিসের সংবাদপত্রে এমস টেলিগ্রাম

প্রকাশিত হইল। বিসমার্ক যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। ফ্রান্স এত ক্ষিপ্ত হইল যে জনসাধারণ, পার্লামেণ্ট, মন্ত্রীসভা সকলে একযোগে সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী জানাইল। নেপোলিয়ন মৃদু আপত্তি করিতে গেলেন, মন্ত্রীরা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। পরদিন যুদ্ধ ঘোষিত হইল।

ফ্রান্সের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধ

কূটনীতির দিক দিয়া বিসমার্ক ফ্রান্সকে আগেই কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড যাহাতে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে না আসে তার জন্য লণ্ডন টাইমসে বেলজিয়াম জয়ের প্রস্তাব সমন্বিত বেনেদিত্তির চিঠি প্রকাশ করিয়া দিলেন। গ্লাডষ্টোন তখন প্রধান মন্ত্রী। তিনি ফ্রান্সের উপর চটিলেন। ইউরোপের সব কয়টি দেশ একে একে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। অষ্ট্রিয়াকে দোদুল্যমান চিত্ত দেখিয়া আলেকজাণ্ডার ধমক দিলেন, অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের সাহায্যে নামিলে রাশিয়া তাহাকে পিছন হইতে আক্রমণ করিবে। অষ্ট্রিয়া চুপ করিয়া গেল। ইতালিও নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল।

পনেরো দিনের মধ্যে কূটনৈতিক এবং সামরিক সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। রাজা উইলিয়ম নিজে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

৪ঠা আগষ্ট প্রুশিয়ার ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণ সুরু হইল। দশ দিনের মধ্যে ফরাসী বাহিনী টলিতে আরম্ভ করিল। ১লা সেপ্টেম্বর সিডানের যুদ্ধে মোলট্‌কে ফরাসী সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের চিঠি উইলিয়মের হাতে পৌঁছিল। পরদিন ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র সহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান হইল। আবার ফ্রান্সের পথে পথে ধ্বনি উঠিল—জয় রিপাবলিকের জয়। সূচনা হইল তৃতীয় ফরাসী রিপাবলিকের।

ফ্রান্সের জনসাধারণ কিন্তু সহজে আত্মসমর্পণ করিল না। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে তাহারা প্রুশিয়ান সৈন্যবাহিনীকে বাধা দিতে লাগিল। সমস্ত

জাতি যেন যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। গ্যারিবল্ডি পুত্রদের নিয়া ফ্রান্সের সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন। এই যুদ্ধেই তরুণ সৈনিক লেফ্‌টেনাণ্ট কিচেনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। প্রুশিয়ান সামরিক শক্তির সম্মুখে ফরাসীদের বাধা ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল।

১৮ই জানুয়ারী ১৮৭১ তারিখে ভার্সাইর রাজপ্রাসাদে প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়ামকে জার্ম্মেনীর সম্রাট ঘোষণা করা হইল। বিসমার্ক ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন।

ফ্রান্সের পরাজয়

২৮শে জানুয়ারী প্যারিস আত্মসমর্পণ করিল। ১০ই মে ফ্রাঙ্কফুর্টে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরও হইল। ফ্রান্স জার্ম্মেনীকে আলসাস এবং লোরেণ প্রদেশদ্বয় ছাড়িয়া দিল এবং তিন বছরে ২০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি দিল। আলসাস এবং লোরেণ প্রদেশ দুইটির আয়তন ৫০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ এবং দুইটি প্রদেশই লৌহ্ সম্পদে পূর্ণ।

ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান যুদ্ধে জার্ম্মেনী ইউরোপের প্রভু এবং বিসমার্ক জার্ম্মেনীর প্রভু বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাশিয়ার সমাজ ও শাসনসংস্কার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিল। নিকোলাস ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনরূপ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বরং সর্ব্বপ্রকার সংস্কার প্রচেষ্টায় সর্ব্ব রকমে বাধা দিয়াছেন। প্রগতিশীল রাজনৈতিক এবং দার্শনিক গ্রন্থের প্রবেশ রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল। রাশিয়ান তরুণেরা বিদেশে

গিয়া পাছে বিপ্লবী ভাবধারা শিখিয়া আসে সেই ভয়ে তাহাদিগকে দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। মুদ্রাযন্ত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা গবর্ণমেণ্ট সেন্সার করিয়া দিতেন। কোন সরকারী কর্ম্মচারীর কোন কাজের সমালোচনার অধিকার প্রজাদের ছিল না। পুলিশ যাহাকে খুসী গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ বা নির্ব্বাসিত করিতে পারিত, কাহাকেও ধরিয়া পুলিশ দুনিয়া হইতে উধাও করিয়া দিলেও তার কোন প্রতিকার হইত না। শুধু একটি জিনিষে উৎসাহ দেওয়া হইত— সামরিক স্কুল।

রাশিয়ার যে সেনাবাহিনীর ভরসায় নিকোলাস এই স্বেচ্ছাচার চালাইয়াছিলেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাহার অপদার্থতা প্রমাণ হইয়া গেল। ধূমায়িত অসন্তোষ এইবার প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। হাতে লেখা বৈপ্লবিক ইস্তাহার এবং পুস্তিকা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া নিকোলাস অতিরিক্ত মদ্যপানে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে বলিয়া গেলেন—তুমি শান্তি স্থাপন করিও, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিও..................আমার পক্ষে পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

আলেকজাণ্ডার উদার এবং হৃদয়বান লোক ছিলেন। নবযুগের হাওয়া উপেক্ষা করা নিরাপদ হইবে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ৩০ বছর পূর্ব্বে নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণের সময় এক বিদ্রোহ হইয়াছিল, উহা ডেকাব্রিষ্ট বিপ্লব নামে খ্যাত। বিপ্লবীরা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল আলেকজাণ্ডার তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। তারপরই মন দিলেন দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং রেলপথ সংগঠনে এবং সামাজিক উন্নতিতে।

রাশিয়ার সমাজজীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক ছিল তার দাসপ্রথা। মোট জনসাধারণের অর্দ্ধেক—প্রায় সাড়ে চার কোটি লোক ছিল দাস। ইহাদের মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ছিল জারের খাস তালুকের দাস। অবশিষ্টেরা ছিল

জমিদার পাদ্রী প্রভৃতির দাস। রাজার দাসদের অবস্থা তবু কতকটা ভাল ছিল। মালিকেরা ক্রীতদাসদের যখন খুসী যে কোন কাজে খাটাইতে পারিতেন, যত ইচ্ছা টাকা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিতেন, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারিতেন। দাসদের সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তি ছিল মাথা নেড়া করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। নেড়া মাথা লোক পাইলেই তাহাকে ধরিয়া জারের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত। সেখানকার অবস্থা ছিল ক্রীতদাসদের জীবনের চেয়েও ভয়াবহ। জমিদারেরা শিল্পপতি হইবার আশায় কলকারখানা বসাইতে লাগিলেন, উহাতে দাসেরা বিনা বেতনের মজুর নিযুক্ত হইল, অমানুষিক পরিশ্রমে তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল। কাজে আপত্তি করিলে বা ঢিলা দিলে ভূগর্ভস্থ ঘরে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইত, অথবা বেত মারিতে মারিতে হত্যা করা হইত।

নিকোলাসের আমলে মাঝে মাঝে দাসেরা বিদ্রোহ করিয়াছে, জার তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অভিযোগ চাপা দিয়াছেন।

১৮৬১ সালে দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার দাসদের মুক্তি দানের আদেশ জারী করিলেন। প্রায় সাড়ে তিন কোটি দাসকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হইল। ইহার চার বৎসর পরে আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ক্রীতদাসদের মুক্তি দান করেন।

দাসপ্রথার অবসানে সমাজজীবনে পরিবর্ত্তন ও ভূমিসংস্কার

দাসপ্রথার অবসানে রাশিয়ার সমাজজীবনে শুধু নয়, উহার অর্থনৈতিক জীবনেও আমূল পরিবর্ত্তন আসিল।

প্রথম পরিবর্ত্তন, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসেরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করিল। নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজের জমি চাষের ও তাহার ফল ভোগের অধিকার জন্মিল।

দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন, দাসেরা স্বাধীনতার সঙ্গে নিজস্ব জমি পাইল। অভিজাত জমিদারেরা দাসও হারাইলেন, জমিরও অনেকখানি তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া

গেল। দেশের অর্দ্ধেক লোক ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হইলে এবং কাজ না পাইলে নিদারুণ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে জার ইহা বুঝিলেন। দেশের শিল্প এমন উন্নত হয় নাই যে সাড়ে চার কোটি লোককে কাজ দিতে পারে। সুতরাং জার স্থির করিলেন জমিদারদের জমির কতকাংশ দাসদের দেওয়া হইবে। কে কত জমি পাইবে তাহা স্থির করিবার ভার একদল ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর দেওয়া হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটরা নিজেরাও জমির মালিক ছিলেন। আশ্চর্য্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাঁহারা জমি বণ্টন করিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিবর্ত্তন, জমির স্বত্বে বংশানুক্রমিক অধিকার মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের দেওয়া হইল না। ব্যক্তিগত দখলী স্বত্বও তাহারা পাইল না। প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক মীর বা পঞ্চায়েত করিয়া সেই মীরের বা পঞ্চায়েতের হাতে জমির দখলী স্বত্ব অর্পিত হইল। খাজনা আদায় এবং জমিদারের ক্ষতিপূরণ দানের দায়িত্ব রহিল মীরের।

চতুর্থ পরিবর্ত্তন, জমিদারদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমির দামের উপর স্থির হইল। গবর্ণমেণ্ট এই টাকাটা মীরকে ঋণ দিলেন, মীর উহা জমিদারকে দিবে। টাকাটা মীরকে শতকরা ৬ টাকা সুদে ৪৯ বৎসরের জন্য ঋণ দেওয়া হইল। জমিদারের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে প্রজাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল।

মুক্তিপ্রাপ্ত দাসেরা এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইল। দাসপ্রথার অবসান তাহাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিল বটে, তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের উন্নতি হইল না। জমির স্বাভাবিক খাজনার উপর জমিদারের ক্ষতিপূরণের ট্যাক্স চাপিল। তাহারা ভাবিয়াছিল বিনা খেসারতে জমি তাহাদের হইবে, ক্ষতিপূরণের বোঝা তাহারা অন্যায় এবং অসহ্য বলিয়া মনে করিল। মীরের কর্ত্তৃত্ব জমীদারের অত্যাচারের মতই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। প্রজারা বলিতে লাগিল—এ আবার কি স্বাধীনতা?

জার আলেকজাণ্ডার কিন্তু তাঁর সংস্কার চেষ্টা বন্ধ করিলেন না। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল, বার্ষিক বাজেট প্রকাশিত হইতে

লাগিল। সৈন্যবাহিনী, শাসনযন্ত্র এবং বিচার বিভাগে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল। এই প্রথম রাশিয়ার জার জনমত মানিয়া কাজ করিতে সুরু করিলেন।

বিচার সংস্কার

বিচার বিভাগ একেবারে গোড়াশুদ্ধ পচিয়া গিয়াছিল। ঘুষ দিয়া মামলার রায় নিজের ইচ্ছামত বাহির করা যাইত। জার বৃটিশ এবং ফরাসী আদর্শে বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। উহা এইরূপ—

(১) বিচার ও শাসন বিভাগ আলাদা হইল,

(২) জুরীর বিচার প্রবর্ত্তিত হইল,

(৩) ম্যাজিষ্ট্রেটদের স্বাধীনতা দেওয়া হইল,

(৪) নূতন পেনাল কোড তৈরি হইল,

(৫) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের পদ্ধতি অনেক সহজ হইল,

(৬) নির্ব্বাচিত জাষ্টিস অফ দি পীসের হাতে ছোট ছোট মামলার বিচারের ভার দেওয়া হইল,

(৭) গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ভার জার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুশিক্ষিত জজের হাতে দেওয়া হইল।

বিচার সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাব অনুভূত হইল। অনেক অযোগ্য লোক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জুরী হইল। দুর্নীতি স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা দূর করা খুব কঠিন হইতে লাগিল। বিচার সংস্কারের প্রথম লাভ এই হইল যে লোকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল—দেশে বিচার আছে।

শাসন সংস্কার

শাসন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া আলেকজাণ্ডার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝোঁক দিলেন। রাশিয়ার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শাসন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্যর্থতার

প্রধান কারণ, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। শাসন সংস্কারের ফলে প্রধান পরিবর্ত্তন আসিল এইরূপ—

(১) জেমস্ট্ভো নামে স্থানীয় কাউন্সিল গঠিত হইল। জমিদার, প্রজা, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি কাউন্সিলে রহিল। দুই রকম কাউন্সিল হইল—জেলা এবং প্রাদেশিক। জেলা কাউন্সিল জনসাধরণের ভোটে গঠিত হইল। প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হইল জেলা কাউন্সিলারদের ভোটে।

(২) জেলা কাউন্সিলের কাজ হইল—(ক) জাষ্টিস অফ দি পীস নির্ব্বাচন, (খ) রাস্তা এবং পুল মেরামত, (গ) স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতি, (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার, (ঙ) দুর্ভিক্ষ নিবারণ। জেলা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ভিটো করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণরের হাতে দেওয়া হইল।

জার আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় এক নূতন জীবন দেখা দিল। অর্থনীতি, দর্শন, রাস্নীতি প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ক্রমে পূর্ণ-স্বায়ত্ত শাসনের সোপানে পরিণত হইবে।

দশ বৎসর এইভাবে চলিবার পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল। আদালতের কাজ ত্রুটিহীন হইল না। শাসনতন্ত্রের দুর্নীতিও সম্পূর্ণ দূর হইল না। আবার সর্ব্বত্র অসন্তোষ ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

পোলাণ্ড সমস্যা

পোলাণ্ডেও অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িল। ভিয়েনা কংগ্রেসে পোলাণ্ড রাশিয়াকে দেওয়ার সর্ত্ত ছিল এই যে পোলাণ্ড রাশিয়ার প্রদেশ হইবে না, উহা সব বিষয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিবে, শুধু পোলাণ্ডের রাজা হইবেন রাশিয়ার জার। নিকোলাস পোলাণ্ডকে পুরাদস্তুর রাশিয়ার প্রদেশে পরিণত করিলেন। পোলাণ্ডের কাউন্সিল অফ ষ্টেট ভাঙ্গিয়া দিলেন, ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিলেন, সমস্ত উচ্চপদে রুশ অফিসারদের নিযুক্ত করিলেন, স্কুলে পোল ভাষায়

স্থলে রুশ ভাষা প্রবর্ত্তন করিলেন। আলেক্জাণ্ডার দমনমূলক সমস্ত আইন প্রত্যাহার করিলেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ আলাদা করিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করিলেন। স্কুলে পোল ভাষা আবার শিক্ষার বাহন হইল। ওয়রশ বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলা হইল।

আলেকজাণ্ডারের সদুদ্দেশ্য সফল হইল না। পোলরা তাঁহার উদারতাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিল। পোলরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পোলাণ্ডের দাবী তুলিল এবং প্রথম পার্টিসনের আগের সীমানা ফিরিয়া চাহিল। ইহাতে রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়াকে অনেক জমি ছাড়িতে হয়। ১৮৬৩ সালে পোলরা বিদ্রোহ করিল। জার কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন। বিদ্রোহের ফলে পোলাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কাড়িয়া নিয়া উহাকে রাশিয়ার প্রদেশে পরিণত করা হইল। সমস্ত উচ্চ পদ হইতে আবাব পোলদের সবাইয়া রাশিয়ান নিযুক্ত করা হইল। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আদালতে আবার পোল ভাষার স্থলে রুশ ভাষা প্রবর্ত্তিত হইল।

রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজে দুইটি পরস্পর বিরোধী মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। একদল চাহিলেন—পুরাণো সাম্রাজ্যবাদী অটোক্রাসি ফিরিয়া আসুক। অপর দল বিপ্লববাদের পথ অবলম্বন কবিলেন। এই শেষোক্তরাই নিহিলিষ্ট দল নামে পরিচিত।

নিহিলিজ্‌ম

নিহিলিজমের গোড়াপত্তন হইল রুশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে। যাহারা কোনরূপ প্রভুত্বের নিকট মাথা নত করিবে না, যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই না করিয়া কোন কিছু বিশ্বাস করিবে না, তাহারাই হইল নিহিলিষ্ট। জারের অটোক্রাসি, পাদ্রীদের প্রভুত্ব, ধর্ম্মের পবিত্রতা, সমাজের দায়িত্ব, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইনসঙ্গত চুক্তি প্রভৃতি সব বিষয়েই তাহারা প্রশ্ন তুলিল। প্রচলিত নীতিজ্ঞান, নারীদের স্বাধীনতা হীনতা, শিল্পে মালিকের

শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিবাদ জানাইল। নিহিলিষ্ট হইল বাস্তববাদী। যুক্তি দিয়া লোককে বুঝাইতে না পারিলে বলপ্রয়োগে তাহাদের আপত্তি নাই। তুর্গেনিভ তাঁহার বিখ্যাত "পিতা ও পুত্র" উপন্যাসে নিহিলিষ্ট মতবাদ চিত্রিত করিয়া বলিয়াছেন—নিহিলিষ্ট কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না, উহা ব্যর্থ সমালোচনার মতবাদ। ইহা ঠিক নহে। নিহিলিষ্টরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিতে চাহিল নূতন সমাজ গঠনের সুবিধার জন্য। প্রচলিত রাশিয়ান সমাজের গোড়াশুদ্ধ পচিয়া গিয়াছে, উহাতে সংস্কারের স্থান নাই; বিজ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের গোঁড়ামি দূর করিতে না পারিলে নূতন সমাজ গঠন অসম্ভব - ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। উপর হইতে সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া নিহিলিষ্টরা নূতন ভিত্তিমূল হইতে সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিল। নিহিলিষ্টদের মতবাদে সোসালিজমের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বহু নিহিলিষ্ট ছিলেন বাকুনিন প্রবর্ত্তিত এনার্কিষ্ট সোসালিজমে বিশ্বাসী। নিহিলিজম রাশিয়ার শিক্ষিত তরুণ সমাজের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা গ্রামে গ্রামে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, শিল্পী, শ্রমিক প্রভৃতির কাজ নিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নিহিলিষ্ট মতবাদ প্রচার করিতে লাগিল। নিজেদের জীবিকা তাহারা নিজেরাই অর্জন করিয়া নিত। অভিজাত সন্তান গ্রামে বসিয়া মুচির কাজ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না।

নিহিলিষ্ট সাহিত্য প্রচার বন্ধের জন্য আবার সেন্সরশিপ বসিল। তাহারা মুখে মুখে প্রচার চালাইল। সরকারী দমননীতিও পূর্ণোদ্যমে চলিল। ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৪ এই ১১ বছরে দেড় লক্ষ নিহিলিষ্ট তরুণ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইল। নিহিলিষ্টরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের দ্বারা তার জবাব দিল। আগে ছিল মুখের কথা, এবার আসিল রিভলবার। গুপ্তচর, পুলিশ অফিসার, প্রাদেশিক গবর্ণর, এমন কি জারের প্রাণ নাশের চেষ্টাও আরম্ভ হইল। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড সুরু হইল, কোন কোন ক্ষেত্রে জুরীর বিচার উঠিয়া গেল, পুলিশের ক্ষমতা বাড়িল—নিকোলাসের আমলে অনেক কঠোরতা আবার ফিরিয়া আসিল।

জারআলেকজাণ্ডারের হত্যা

জার আলেকজাণ্ডার বুঝিলেন দমননীতি ব্যর্থ হইতেছে। দমননীতি যত বাড়িতেছে, বৈপ্লবিক আন্দোলনও ততই ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। তিনি আবার আপোষের পথ ধরিলেন। এবার শাসন সংস্কার গঠনের দায়িত্ব একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদকে দেওয়া হইবে বলিয়া যেদিন তিনি ঘোষণা করিলেন, সেই দিন, ১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ্চ, উইনটার রাজপ্রাসাদের পথে সেণ্টপিটার্সবুর্গের রাস্তার উপর নিহিলিষ্ট বোমার আঘাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হইলেন। জারের হত্যায় আপোষের চেষ্টা বন্ধ হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য সমস্যা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রাচ্য সমস্যা ইউরোপের একটি প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন হইয়া রহিল। প্রাচ্য সমস্যা এক কথায় তুরস্কের ভবিষ্যৎ—ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্য থাকিবে কি না, যদি না থাকে তবে তুরস্কের স্থান কে অধিকার করিবে? বলকানের স্বাধীন রাজ্যগুলির সমস্যা মূলতঃ প্রাচ্য সমস্যা হইতেই উদ্ভূত। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে হইলে উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খৃষ্টান জাতির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার মানিতে হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরেই বোঝা গেল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যতই চেষ্টা করুক, ইউরোপে তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্য তাহারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান প্রজাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রগতিশীল জনমত সমর্থন করিলেন। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, বিশেষভাবে রাশিয়াকে আটকাইবার জন্য, তুরস্ক কর্ত্তৃক খৃষ্টান প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জনসাধারণ বেশীদিন সহ্য করিবে না।

গ্রীস এবং সার্ব্বিয়ার স্বাধীনতার পর তুরস্কে প্রধানতঃ চারিটি সমস্যা রহিল—

(১) বলকানের খৃষ্টান জাতিরা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইল।

(২) নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিল।

(৩) নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ সুবিধা পাইলেই তুরস্ক অথবা দুর্ব্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অংশ কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ করিল।

(৪) রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেণী এই তিন রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত বলকানে বাধিয়া গেল। ইংরেজের স্বার্থ তো ছিলই।

রুমানিয়া

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে রুমানিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিল। তুরস্কের পূর্ব্ব দিকে ডানিউব নদীর তীরে দুইটি খণ্ডরাজ্য (Principality) ছিল, নাম মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া। উহাদের অধিবাসীরা ছিল রুমানিয়ান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিস চুক্তিতে স্থির হয় ইহারা নিজস্ব গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিবে এবং ধর্ম্মাচরণ, আইন এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতা পাইবে। নিজেদের শাসন পদ্ধতি একটি জাতীয় কনভেনসনে তাহারা ঠিক করিবে।

এই প্রতিশ্রুতিতে আশান্বিত হইয়া খণ্ডরাজ্যরা ভাবিল তাহাদের স্বাধীনতা বেশী দূরে নয়, দুই রাজ্য একত্র হইয়া এক অখণ্ড স্বাধীন রাজ্য তাহারা গঠন করিবে। রুমানিয়ানদের এই মনোভাব তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সমর্থন করিলেন। তুরস্ক এই দুই খণ্ডরাজ্যের সমন্বয়ে শক্তিশালী অখণ্ড রাজ্য গঠনের প্রস্তাবে শঙ্কিত হইল। অষ্ট্রিয়া আপত্তি করিল এই কারণে যে রুমানিয়ানদের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিলে তার নিজের রাজ্যের বিভিন্ন জাতির দাবী অস্বীকার করা যাইবে না। ইংলণ্ড আপত্তি করিল, কারণ মাত্র অল্পদিন আগে তুরস্কের

অখণ্ডতা সে সমর্থন করিয়াছে, তার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে. এখন কি করিয়া তুরস্কের অঙ্গ ছেদ করিয়া এত বড় একটা নূতন রাজ্য গঠনে সম্মতি দিতে পারা যায়?

মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় জাতীয় কনভেনসনের নির্ব্বাচন হইল। তুরস্কে থাকার পক্ষে মেজরিটি হইল। ফ্রান্স বলিল—অসম্ভব জাল ভোট হইয়াছে, নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া নূতন নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ইংলণ্ড ফ্রান্সের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিল। নেপোলিয়ন বুঝাইলেন, শক্তিশালী অখণ্ড রুমানিয়া গঠন রাশিয়াকে ঠেকাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহা তুরস্কের পক্ষেও লাভজনক। খণ্ডরাজ্যদ্বয়কে আলাদা ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে রাশিয়ারই লাভ। নূতন নির্ব্বাচন হইল এবং এবার ভোটে স্থির হইল ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া মিলিত হইয়া এক রাজ্যে পরিণত হইবে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে, বংশানুক্রমিক রাজা পাইবে, তবে তুরস্কের সার্ব্বভৌমত্ব তাহারা স্বীকার করিবে। ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া ইউনিয়নের বিপক্ষে রহিল। তাহারা বলিল—দুই খণ্ড রাজ্যের আলাদা রাজা এবং আলাদা পার্লামেণ্ট থাকিবে এবং একটি যৌথ কমিশনের দ্বারা সাধারণ সমস্যাগুলির বিচার হইবে।

১৮৫৯ সালে ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া দুই রাজ্য আলাদাভাবে জাতীয় কনভেনসনের বৈঠক বসিল কিন্তু দুই জায়গাতেই আলাদাভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া একই রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন। একজন অভিজাত রুমানিয়ান কর্ণেল আলেকজাণ্ডার কুজা—সর্ব্বসম্মতিক্রমে উভয় রাজ্যের পরিষদ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই চালের পাল্টা জবাব ইউরোপীয় শক্তিরা দিতে পারিল না। ১৮৬১ সালে উভয় রাজ্য মিলিত হইল, নাম হইল রুমানিয়া। রাজা কুজা ভূমি সংস্কার, শিল্প বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, পাদ্রীদের অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতিতে মন দিলেন। সংস্কারে নামিয়া তিনি অনেক শত্রু সৃষ্টি করিলেন। নয় বৎসর বাদে এক বিদ্রোহে তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন।

রুমানিয়ান সিংহাসনে বসিবার জন্য এবার আমন্ত্রণ করা হইল বেলজিয়ান

রাজার পুত্র প্রিন্স ফিলিপকে। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন প্রস্তাব গেল হোহেনজোলার্ণ বংশের প্রিন্স চার্লসের নিকট। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, রুমানিয়ার সিংহাসনে বসিবার প্রস্তাব পাইয়া চার্লস একটি মানচিত্র খুলিয়া দেখিলেন লণ্ডন হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত লাইন টানিলে তাহা রুমানিয়ার উপর দিয়া যায়। তাঁহার বিশ্বাস হইল—এই দেশের ভবিষ্যৎ আছে। বিসমার্ক প্রিন্স চার্লসকে সমর্থন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার পিছনে এক জার্ম্মান রাজা গিয়া বসিলেন—বিসমার্কের দৃষ্টি ছিল সেই দিকে। জার্ম্মেণীর প্রিন্স চার্লস রুমানিয়ার রাজা ক্যারল হইলেন। ক্যারল প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েক মাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রুমানিয়াও বাহির হইয়া গেল, তবু তুরস্কের শিক্ষা হইল না। তখনও সুলতান খৃষ্টান প্রজাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। এই মর্ম্মে যে সব প্রতিশ্রুতি সুলতান দিয়াছিলেন তার কোনটি পালন করিলেন না। খৃষ্টান প্রজাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির স্বাধীনতা, সম্মান প্রভৃতি স্থানীয় কর্ম্মচারীদের হাতে প্রতি পদে বিপন্ন হইতে লাগিল। ট্যাক্সের চাপ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। খৃষ্টান জাতিরা এবার মরিয়া হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

রাশিয়া খৃষ্টান জাতিদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল। বৃহত্তর শ্লাভ আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল রাশিয়ানরা। ১৮৬৭ সালে মস্কোতে বিজ্ঞান সম্মেলনের নামে এক বিরাট প্যান-শ্লাভ কংগ্রেস বসিল। একটি প্যান-শ্লাভ কমিটি গঠিত হইল, তার প্রধান কেন্দ্র হইল মস্কো। সমগ্র বলকানে প্যান-শ্লাভ পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল। রুমানিয়ান তরুণরা পড়িতে যাইত প্যারিসে, বুলগেরিয়ান, সার্ব্বিয়ান, বসনিয়ান প্রভৃতি তরুণরা যাইতে সুরু করিল মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সার্ব্বিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া, মণ্টেনিগ্রো প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিতে ভরিয়া গেল। কনষ্টাণ্টিনোপলের রুশ রাজদূত এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের সমস্ত রাশিয়ান কনসাল একরূপ প্রকাশ্যেই এই আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা

বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা ছিল তুরস্কের দুটি জেলা, তুরস্কের পশ্চিম প্রান্তে অষ্ট্রিয়ান সীমান্তে অবস্থিত। রুমানিয়ার পর এই দুই জেলা হইতে আসিল দ্বিতীয় ধাক্কা। এখানকার অভিযোগ ছিল দুই রকম—সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার জন্য একদিকে জমিদার অপরদিকে তুর্কী গবর্ণমেণ্ট এই দুইয়ের শোষণে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারেরা সুলতানের নেকনজরে থাকিবার জন্য মুসলমান হইয়াছিল এবং খাস তুর্কীদের চেয়েও ইহারা বেশী অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে হারজেগোভিনায় কর বন্ধ এবং বেগার বন্ধ আন্দোলন সুরু হইল। তুর্কী সৈন্য প্রেরিত হইল কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া বিতাড়িত করিল। সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো এবং ডালমেসিয়ার জনসাধারণ হারজেগোভিনার জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট তখন প্রায় দেউলিয়াত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্রোহ দমনের জন্য যে টাকা দরকার তাহা সুলতানের নাই। সুলতান আবার খৃষ্টান প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিরা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। এই সময়ে সালোনিকার ফরাসী এবং জর্ম্মান কনসাল নিহত হইলেন। ইউরোপীয় শক্তিরা সুলতানের উত্তর চাপ দিতে লাগিলেন কিন্তু ইংলণ্ড তাহাদিগকে সমর্থন করিল না। সুলতান এই সুযোগ নিয়া অন্য শক্তিদের ধমক উপেক্ষা করিলেন।

এইভাবে প্রায় বছর ঘুরিয়া গেল। পর বৎসর মে মাসে বসনিয়াও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহের আগুন বুলগেরিয়াতেও ছড়াইয়া পড়িল। তাহারাও কর বন্ধ আন্দালন আরম্ভ করিল এবং প্রায় এক শত তুর্কী অফিসারকে হত্যা করিল।

সুলতান দেখিলেন বিদ্রোহীরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফিলিতেছে। তিনি এবার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮০০০ তুর্কী সৈন্য এবং সেই সঙ্গে বাশি-বাজুক এবং সার্কেসিয়ান দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিদের বুলগেরিয়ার

গ্রামে গ্রামে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহারা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং লুঠতরাজ সুরু করিল তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া কঠিন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতে ১২ হাজার খৃষ্টান নিহত হইয়াছিল, অন্যদের মতে নিহতের সংখ্যা ৩০ হাজারের কম নহে। বুলগেরিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমগ্র খৃষ্টান জগৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোন দাবি করিলেন তুর্কীদের ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করা হউক। ডিসরায়েলি তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তিনি দেখিলেন জনমত মানিতে গেলে তুর্কী ধ্বংস হয়, তুর্কী ধ্বংস হইলে রাশিয়ার ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ বাধা মুক্ত হয়, রাশিয়া ভূমধ্য সাগরে ঢুকিলে ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়। মাত্র দুই বৎসর আগে ডিসরায়েলি সুয়েজ খাল কোম্পানীতে মিশরের খেদিভের শেয়ারগুলি কিনিয়া নিয়াছেন। অল্প কয়দিন আগে ভারতবর্ষে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে পাঠাইয়া দরবার বসাইয়া ইংরেজ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বুলগেরিয়ার খৃষ্টানদের ভাগ্যের চেয়ে ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার মূল্য ডিসরায়েলির নিকট অনেক বেশী। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভয় তুর্কী নয়, রাশিয়া। বুলগেরিয়ান নৃশংসতা ডিসরায়েলি নীরবে সহ্য করিয়া গেলেন।

১৮৭৭ সালের ২৪শে এপ্রিল রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিল এবং সার্ব্বিয়ার সঙ্গে যোগ দিল। প্রথমেই রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে লোভ দেখাইল যে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলে বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার উপর অষ্ট্রিয়ান প্রভাব রাশিয়া সমর্থন করিবে। অষ্ট্রিয়া রাজী হইল। অতঃপর রাশিয়া রুমানিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল। রুমানিয়া রুশ সৈন্যদের পথ ছাড়িয়া দিল। আট মাসের মধ্যে রাশিয়ার সেনাবাহিনী কনষ্টাণ্টিনোপলের ১৬০ মাইল দূরে আড্রিয়ানোপলে উপস্থিত হইল। ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল।

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল সানষ্টেফানোতে। সন্ধির সর্ত্তাবলী এইরূপ—

(১) তুরস্ক সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করিবে,

(২) বসনিয়া এবং হারজেগোভিনায় অবিলম্বে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবে এবং ঐ সংস্কার কার্য্য অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে চলিবে,

(৩) ডানিয়ুব নদীর তীরের সমস্ত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে,

(৪) আর্ম্মেনিয়ানদের স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে,

(৫) এশিয়ার তুর্কী সামাজ্য হইতে বাটুম, কার্স প্রভৃতি কতকগুলি এলাকা এবং ইউরোপের বেসারাবিয়া রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে,

(৬) বেসারাবিয়ার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কতকগুলি এলাকা রুমানিয়াকে দিতে হইবে,

(৭) রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে,

(৮) বুলগেরিয়ানদের জন্য নূতন বুলগেরিয়া গঠিত হইবে; উহা তুর্কীর অধীনে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হইবে; উহার সীমানা ডানিয়ুব নদী হইতে ঈজিয়ান উপসাগর এবং মাসিডোনিয়া হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

সানষ্টেফানো সন্ধি রাশিয়ার পক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব সাফল্য। ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের অবসান তো ঘটিলই, রাশিয়ার আঘাতে এই অবসান আসিল এবং রাশিয়ার সাহায্যে বলকানের খৃষ্টান রাজাদের অভ্যুদয় ঘটিল। বলকানে রাশিয়ার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ভয় পাইল ইংলণ্ড। সানষ্টেফানোর চুক্তি তুরস্কের পরাজয় নয়, ভারত সাম্রাজ্যের মৃত্যুবান। বুলগেরিয়া বাদে অন্যেরাও সন্তুষ্ট হইল না। সানষ্টেফানোর বৈঠকে রাশিয়া রুমানিয়াকে ডাকে নাই। তার উপর তাহাকে বেসারাবিয়া হারাইতে হইল। সুতরাং রুমানিয়া চটিল। সার্ব্বিয়া, গ্রীস এবং মন্টেনিগ্রো বিরাট বুলগেরিয়ার আবির্ভাবে শঙ্কিত হইল। বসনিয়া হারজেগোভিনায় অষ্ট্রিয়ান প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার পর রাশিয়া নিজে আসিয়া ভাগ বসাইল দেখিয়া অষ্ট্রিয়া চটিল। জার্ম্মানীও বলকানে রাশিয়ার প্রভাব এতটা চাহিল না।

বিসমার্ক এবং ডিসরায়েলি সকলের অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ডিসরায়েলি এক ইউরোপীয় কংগ্রেসে সমস্ত বিষয়টির আলোচনার

দাবী করিলেন। রাশিয়া আপত্তি জানাইল। ১৮৭৮ সালের ১৭ই এপ্রিল ডিসরায়েলি ঘোষণা করিলেন তিনি ১৭ হাজার ভারতীয় সৈন্য মাল্টায় প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন। রাশিয়া এই যুদ্ধেই যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তার উপর বুঝিল জার্ম্মানী বিপক্ষে চলিয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধে বিসমার্ক রাশিয়ার নিকট যতটা সাহায্য আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই, ইহা তিনি ভোলেন নাই। জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়াকে চটাইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় অসম্ভব ইহা বুঝিয়া রাশিয়া ইউরোপীয় কংগ্রেসে রাজি হইল।

বার্লিন কংগ্রেস

কংগ্রেস বসিল বার্লিনে। সভাপতি হইলেন বিসমার্ক। এই কংগ্রেসেই বিসমার্ক "সাধু-দালাল" (honest broker) বলিয়া অভিহিত হন। অবশ্য কংগ্রেসে সকলের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন ডিসরায়েলি।

১৩ই জুলাই ১৮৭৮ বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। উহার সর্ত্তাবলী এইরূপ—

(১) রাশিয়াকে বেসারাবিয়া, বাটুম, কার্স এবং আর্ম্মেনিয়ার সামান্য অংশ বাদে আর সমস্ত ছাড়িতে হইল,

(২) তুরস্ক রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল,

(৩) বেসারাবিয়ার পরিবর্ত্তে রুমানিয়া ডোব্রুজার কতকাংশ লাভ করিল,

(৪) বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার শাসন ভার অষ্ট্রিয়ার হাতে অর্পিত হইল,

(৫) সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর মাঝখানে নভিবাজার দুর্গে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য রাখিতে দেওয়া হইল,

(৬) রাশিয়া যতদিন কার্স এবং বাটুম অধিকারে রাখিবে ততদিনের জন্য সাইপ্রাস দ্বীপ বৃটিশ শাসনাধীনে দেওয়া হইল,

(৭) ফ্রান্স ভবিষ্যতে টিউনিস দখলের অনুমতি নিয়া রাখিল,

(৮) ইতালি আলবেনিয়া এবং ত্রিপলির উপর দাবী জানাইয়া রাখিল,

(৯) সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো কয়েকটি এলাকা লাভ করিল এবং তাহাদের স্বাধীনতা তুরস্ক কর্তৃক স্বীকৃত হইল,

(১০) গ্রীস ক্রীট, থেসালি, এপিরাস এবং ম্যাসিডোনিয়ার উপর দাবী জানাইল কিন্তু কিছু পাইল না,

(১১) বুলগেরিয়ার আয়তন ষ্টানষ্টেফানো চুক্তির আয়তনের এক তৃতীয়াংশ হইয়া গেল। উহার দক্ষিণ সীমানা ঈজিয়ান উপসাগর স্থলে বলকান পর্ব্বতমালা হইল, বুলগেরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল কিন্তু তুরস্ককে কর দিতে হইবে এই ব্যবস্থা হইল,

(১২) বুলগেরিয়ার অধীনে পূর্ব্ব-রুমেলিয়া নামে একটি রাজ্য গঠিত হইল, উহা তুর্কীর অধীনে থাকিবে কিন্তু তার গবর্ণমেণ্ট হইবে খৃষ্টান এবং রুমেলিয়া গবর্ণমেণ্ট ইউবোপীয় শক্তিদের অনুমোদনক্রমে গঠন কবিতে হইবে,

(১৩) মাসিডোনিয়া তুরস্ককে ফেরৎ দেওয়া হইল।

জার্ম্মেনী নিজে কোন দাবী জানাইল না। সুলতান ইহাতে কৃতজ্ঞ রহিলেন। জার্ম্মেনী পরে তুরস্কের এই কৃতজ্ঞতা কাজে লাগাইয়াছিল। ডিসরায়েলি শুধু সম্মানজনক শান্তি নয়, সাইপ্রাস পকেটে নিয়া দেশে ফিরিলেন।

বার্লিন কংগ্রেসে আপাততঃ শান্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ এই বার্লিন চুক্তি। রুমানিয়া বেসাবাবিয়া না পাইয়া অসন্তুষ্ট রহিল। বৃটেন সাইপ্রাস কাড়িয়া নেওয়ায় তুরস্ক বুঝিল বৃটিশ সমর্থন আব সে পাইবে না। বুলগেরিয়ার আয়তন হ্রাসে বুলগেরিয়ানরা ক্ষুব্ধ হইল। মাসিডোনিয়ান গ্রীকরা গ্রীসে আসিতে পারিল না বলিয়া তাহারাও অসন্তুষ্ট হইল।

১৯১২ সালের প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণ মাসিডোনিয়া তুর্কীকে প্রত্যর্পণ এবং ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের কারণ বুলগেরিয়ার আয়তন সঙ্কোচ। বার্লিন কংগ্রেসে অপমানিত রাশিয়া প্রায় ৩০ বছরের জন্ত ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে সরিয়া গেল এবং এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিল। দার্দ্দানেলিসে

বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আফগানিস্থানের উপর দিয়া ভারত সাম্রাজ্যের দিকে হাত বাড়াইল। ১৯১৭ সালে রাশিয়া আবার ইউরোপের দিকে মুখ ফিরাইল। এবার ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল—ইংলণ্ড এবং রাশিয়া একসঙ্গে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিল। বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়া যাহা হারাইয়াছিল এই যুদ্ধে তার লাভ তার চেয়ে অনেক বেশী হইল।

বার্লিন চুক্তির ফলে ইউরোপে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর শান্তি বজায় রহিল।

বুলগেরিয়া

তুরস্কের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া বলকানে পাঁচটি নূতন রাজ্যের উদ্ভব হইল—গ্রীস, রুমানিয়া, সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো এবং বুলগেরিয়া। পূর্ব্ব রুমেলিয়া রহিল অর্দ্ধ স্বাধীন, বসনিয়া হারজেগোভিনা গেল অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীনে।

নবগঠিত বুলগেরিয়ায় প্রধানতঃ চারিটি সমস্যা দেখা দিল—সংবিধান প্রণয়ন, রাজা নির্ব্বাচন, রুমেলিয়ার সহিত ইউনিয়ন এবং রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ধাঁচে সংবিধান রচিত হইল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রহিল অটোক্রাটিক। প্রতিনিধিত্ব রহিল কিন্তু প্রতিনিধিদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব রহিল না। এই অপূর্ব্ব সংবিধান দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাবক্রমে ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসনে বসানো হইল। তিনি ভালভাবেই রাজ্য চালাইতে লাগিলেন কিন্তু রাশিয়ার তাঁবেদারিতে রাজী হইলেন না বলিয়া সাত বৎসর বাদে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সিংহাসনে বসিলেন জর্ম্মান সাক্সে-কোবার্গ-গোথার প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনিই বুলগেরিয়াকে জার্ম্মেনীর পক্ষে আনিয়াছিলেন। প্রিন্স আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে থাকিতেই বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার ইউনিয়ন আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। আলেকজাণ্ডার বার্লিন চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে সংযুক্ত বুলগেরিয়ার রাজা ঘোষণা করিলেন। বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে, কি করা

যায় ভাবিয়া ইউরোপীয় শক্তিরা যখন ইতস্ততঃ করিতেছে, তখন সার্ব্বিয়া হঠাৎ বুলগেরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিল। বুলগেরিয়া বেশী শক্তিশালী হইলে বলকানের শান্তি ব্যাহত হইবে, ইহাই ছিল সার্ব্বিয়ার আশঙ্কা। সার্ব্বিয়া পরাজিত হইল। বুলগেরিয়ান সৈন্য সার্ব্বিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যখন উহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে সেই সময়ে অষ্ট্রিয়া আপত্তি জানাইল। বুলগেরিয়া সার্ব্বিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইল।

পূর্ব্ব রুমেলিয়ার প্রশ্ন আবার এক ইউরোপীয় কংগ্রেসে তোলা হইল। বার্লিন কংগ্রেসে যে যাহা বলিয়াছিল এবার ঠিক তার উল্টা হইল। সানষ্টেফানোতে যে রাশিয়া বৃহত্তর বুলগেরিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বার্লিন কংগ্রেসে বুলগেরিয়া বিভাগে আপত্তি করিয়াছিল, সেই রাশিয়া এবার বুলগেরিয়া এবং রুমেলিয়ার ইউনিয়নে বৃহত্তর বুলগেরিয়া গঠনে বাধা দিল। অন্য যাহারা বার্লিন কংগ্রেসে বুলগেরিয়া ভাঙ্গিয়াছিল তাহারা এবাব বৃহত্তর বুলগেরিয়া সমর্থন করিল।

ইহার কারণ ছিল। ইংলণ্ড বুঝিয়াছিল মরণোন্মুখ তুরস্কেব সাহায্যে বলকানে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। তার চেয়ে বুলগেরিয়াকে শক্তিশালী করিলে এবং উহাকে দলে রাখিতে পারিলে বেশী কাজ হইবে। বুলগেরিয়া রাশিয়ার সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিলেও রাশিয়ার তাঁবেদারিতে রাজি হয় নাই, রাজা আলেকজাণ্ডার রাশিয়া সম্বন্ধে বেশ কড়া মনোভাবই দেখাইতে-ছিলেন। রাজা আলেকজাণ্ডারের ভ্রাতা ব্যাটেনবার্গের হেনরীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারী বিয়েট্রিসের বিবাহে ইংলণ্ড ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কুটুম্বিতাও স্থাপিত হইল।

ইউরোপীয় শক্তিরা বুলগেরিয়ার এবং রুমেলিয়ার ইউনিয়ন এবং রাজা আলেকজাণ্ডারের বৃহত্তর বুলগেরিয়ার সিংহাসন গ্রহণ সমর্থন করিলে রাশিয়া চটিয়া আগুন হইল। এক রাত্রে রাশিয়ার নির্দ্দেশে কয়েকজন বুলগেরিয়ান অফিসার রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া রিভলবার তুলিয়া রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে ধরিয়া দেশ হইতে বাহির

করিয়া দিলেন। বুলগেরিয়ানরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিল কিন্তু আলেকজাণ্ডার আর সিংহাসনে বসিতে রাজি হইলেন না।

বুলগেরিয়ার সিংহাসনে বসিলেন সাক্সে-কোবার্গ-গোথার প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড। ষ্টামবোলভ ছিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং তিনিই ছিলেন বুলগেরিয়ার ডিক্টেটর। ১৮৯৪ সালে ষ্টামবোলভ পদত্যাগ করেন এবং পর বৎসর নিহত হন। ষ্টামবোলভের পদত্যাগের পর রাজা ফার্ডিনাণ্ড নিজের ইচ্ছামত রাজ্য শাসনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল রাশিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপন। ফার্ডিনাণ্ডের শাসনে বুলগেরিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আর্ম্মেনিয়ান হত্যাকাণ্ড

তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে কৃষ্ণ সাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে অনেকখানি জায়গায় আর্ম্মেনিয়ানরা ছড়াইয়াছিল। এরা ছিল খৃষ্টান। অন্যান্য খৃষ্টান জাতিরা স্বাধীনতা পাইয়া গেল অথচ আর্ম্মেনিয়ানরা সামান্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকুও পাইল না, এ বিষয়ে সুলতান যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা করিলেন না—ইহাতে আর্ম্মেনিয়ানরা ক্ষুব্ধ হইল। ধীরে ধীরে তাহারা মাথা তুলিতে লাগিল। সুলতান দেখিলেন ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে স্বার্থের লড়াই এমন ভাবে বাধিয়া গিয়াছে যে তিনি আর্ম্মেনিয়ানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে উহাদের সাহায্যে কেহই আসিবে না। তিনি বুঝিলেন এখনই কঠোর হস্তে দমন না করিলে সাম্রাজ্যের এক অংশ বাহির হইয়া যাইবে। ১৮৯৩ সালে আর্ম্মেনিয়ানদের এক আন্দোলনকে ছুতা করিয়া সুলতান তুর্কী সৈন্যদের আর্ম্মেনিয়ান গ্রামে লেলাইয়া দিলেন। খুন, জখম এবং লুঠতরাজের চূড়ান্ত সুরু হইল। তুর্কীরা বলিল—আর্ম্মেনিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করিয়া আর্ম্মেনিয়ান সমস্যার সমাধান করিবে। এক বছরের মধ্যে ৫০ হাজার আর্ম্মেনিয়ান নিহত হইল। আর্ম্মেনিয়ান সহরে ও গ্রামে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের আগে আলাদা করিয়া ফেলা হইত।

পুরুষদের কাটিয়া ফেলিয়া স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের নেওয়া হইত পাহাড়ের উপর। উপর হইতে তুর্কী সৈন্যরা শিশুগুলিকে নীচে ছুঁড়িয়া দিত। নীচে তুর্কী সৈন্যরা সঙ্গীনের মুখে শিশুদের লুফিয়া নিত। মায়েদেব চোখের উপব এই দৃশ্যের পর স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদেব সঙ্গীন দিয়া খোঁচাইয়া এবং বন্দুকের কুঁদা দিয়া পিটাইয়া পাহাডের নীচে খাদের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কনষ্টান্টিনোপলে ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে ৬ হাজাব আর্ম্মেনিয়ানকে তুর্কীরা বাস্তার উপর পিটাইয়া হত্যা করিয়াছিল।

রাশিয়া দুই কারণে আর্ম্মেনিয়ানদের সাহায্যে আসিল না। প্রথম কাবণ, ইহাদের মধ্যে অনেক নিহিলিষ্ট ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বুলগেরিয়ার অকৃতজ্ঞতা রাশিয়া ভোলে নাই; আর্ম্মেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিয়া দ্বিতীয় বুলগেরিয়া সৃষ্টির ইচ্ছা তাহাব ছিল না। জার্ম্মেনীতে বিসমার্ক পদত্যাগ করিয়াছেন। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি সুলতানেব বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহশীল। অষ্ট্রিয়াও জার্ম্মেনীর পথ ধবিল। ফ্রান্স নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। একা ইংলণ্ড এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কবিল এবং ইংলণ্ড একা পড়িল বলিয়া সুলতান উহার ধমক অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন। ইংলণ্ডের জনমত আর্ম্মেনিয়ানদের পক্ষে ছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সল্‌সবেরী একা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে সাহসী হইলেন না।

গ্রীস ও ক্রীট

আর্ম্মেনিয়ান সমস্যা নৃশংসভাবে দমন করিবার পর গোলমাল বাধিল গ্রীস এবং ক্রীটে। গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের পর ১৮৩৩ সালে ইউরোপীয় শক্তিদের সমর্থনে ব্যাভেরিয়ার জর্ম্মান প্রিন্স অটো গ্রীসের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর। ১৮৬২ সালে গ্রীসে এক সামরিক বিদ্রোহ হইল এবং রাজা অটো সিংহাসন ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। নূতন রাজার সন্ধানে ইউরোপের দেশে দেশে দূত বাহির হইল। রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স

এলবার্টকে আহ্বান করা হইল। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে ডেনমার্কের প্রিন্স জর্জ্জ গ্রীসের রাজা হইতে রাজি হইলেন। ১৮৬৩ সালে গ্রীসের সিংহাসনে বসিয়া জর্জ্জ ১৯১৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ক্রীট, থেসালি, এপিরাস এবং মাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা ছিল গ্রীক অথচ এই অঞ্চলগুলি সমস্ত ছিল গ্রীসের বাহিরে। থেসালি এবং এপিরাস ছিল তুরস্কের অধীন। এই দুই অঞ্চল গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য গ্রীস প্রথম সংগ্রাম আরম্ভ করিল। দুইবাব গ্রীস থেসালি আক্রমণ করিল, দুইবারই ইউরোপীয় শক্তিদের আদেশে তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে হইল। ১৮৮০ সালে গ্লাডষ্টোন প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তুরস্ক ছিল তাঁর চক্ষুশূল। গ্রীক অঞ্চলগুলি গ্রীসকে দেওয়ার জন্য তিনি সুলতানের উপর চাপ দিতে সুরু করিলেন। এক বৎসরেব মধ্যে সুলতান এপিরাসের এক তৃতীয়াংশ এবং থেসালির অধিকাংশ গ্রীসকে ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। পামারষ্টন গবর্ণমেণ্ট আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিলেন।

ক্রীট ছিল তুরস্কের অধীন। অধিবাসীরা গ্রীক। তাহাদের কোনরূপ রজেনৈতিক অধিকার ছিল না। ক্রীট চাহিল গ্রীসের সঙ্গে ইউনিয়ন। বাব বার বিদ্রোহ হইতে লাগিল। ক্রীটের বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন ভেনিজেলাস নামে এক তরুণ। গ্রীস ক্রীটের সাহায্যে সৈন্য পাঠাইল। তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। গ্রীস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হইয়াই এই হঠকারিতা করিয়া বসিয়াছিল। বাধ্য হইয়া গ্রীস হটিয়া গেল।

শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিদের পরামর্শে স্থির হইল ইংলণ্ড, রাশিয়া, ইতালি এবং ফ্রান্স এই চতুঃশক্তি লইয়া একটি কমিশন গঠিত হইবে এবং সেই কমিশন ক্রীট শাসন করিবে। গ্রীসের রাজা জর্জ্জের পুত্র গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। ১৫ বছর পরে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের পর ক্রীট গ্রীসের সহিত মিলিত হইল।

বার্লিন বাগদাদ রেলওয়ে

বার্লিন চুক্তির পর হইতে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুরস্কের মন কষাকষি সুরু হইল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস এবং মিশর অধিকার তুরস্কের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছিল; তার উপর ইংলণ্ডের চাপে তাহাকে এপিরাস এবং থেসালির অনেকাংশ গ্রীসকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ইংলণ্ডের উপর চটিয়া তুরস্ক জার্ম্মেনীর দিকে ঝুঁকিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম নিজে কনষ্টাণ্টিনোপল পরিদর্শন করিলেন। দামাস্কাসে গিয়া কাইজার ঘোষণা করিয়া আসিলেন—তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ এবং যে তিন কোটি মুসলমান তাঁহাকে খলিফারূপে মানে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে জার্ম্মেনী সব সময় তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া চলিবে। জর্ম্মান অফিসারেরা আসিয়া তুরস্কের সেনাবাহিনী তৈরি করিয়া দিলেন। জর্ম্মান ব্যবসায়ীরা আসিয়া তুরস্কের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কনষ্টাণ্টিনোপলে জর্ম্মান ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হইল।

তুরস্কের ভিতর দিয়া বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে স্থাপনের প্রস্তাব হইলে ইংলণ্ড শিহরিয়া উঠিল। ইংলণ্ড বুঝিল জার্ম্মেনী এইবার প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে। জলপথে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুবিধা হইবে না বুঝিয়া স্থলপথ তৈরিতে অগ্রসর হইয়াছে। ১৮৯৯ সালে তুরস্ক জর্ম্মান রেল কোম্পানীকে জমি ইজারা দিল। স্থির হইল বার্লিন হইতে বসফোরাস হইয়া প্রথমে বাগদাদ পরে বসরা পর্য্যন্ত এই রেলপথ প্রসারিত হইবে। এই রেল প্রান্ত হইতে পারস্য উপসাগর মাত্র ৭০ মাইল দূরে থাকিবে। কাইজারের ধারণা ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে এই রেলপথে তিনি এশিয়া মাইনর দখল করিতে পারিবেন। বার্লিন বাগদাদ রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পর এই রেলপথ জার্ম্মেনীর হাত হইতে কাড়িয়া নিয়া তুরস্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়।

বলকান লীগ

১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত বলকানে একটির পর একটি ঘটনা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিল যাহার পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

বেশ কিছুদিন যাবৎ তুরস্কের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শে সামাজিক এবং শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন ছিল তাহাদের অভিপ্রায়। ইহাদের প্রধান দাবী ছিল গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং বাক্যের ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা। "তরুণ তুর্কী" নামে দল গঠিত হইল এবং গুপ্ত সমিতি মারফৎ ইহারা প্রচারকার্য্য চালাইল। সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৭৬ সালে সিংহাসন আরোহনের অব্যবহিত পরে একটি সংবিধান জারী করিয়াছিলেন কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে "তরুণ তুর্কী" দল সালোনিকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ঐ সংবিধান পুনঃপ্রবর্ত্তন দাবী করিল এবং জানাইল যে বিপ্লবীদের দাবী স্বীকৃত না হইলে তাহারা কনষ্টাণ্টিনোপল অভিমুখে অভিযান করিবে। সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিল। সুলতান ভয় পাইলেন এবং "তরুণ তুর্কী" দলের দাবী মানিয়া নিলেন। সুলতান বলিলেন—এ আর বেশী কথা কি, তরুণদের দাবী তো তাঁরই প্রাণের কথা। সংবিধান প্রবর্ত্তিত হইল, পার্লামেণ্ট গঠিত হইল, প্রেস সেন্সরশিপ উঠিয়া গেল, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা দেওয়া হইল। সুলতানের ৪০ হাজার গুপ্তচরের এক বিরাট বাহিনী ছিল, সুলতান উহা ভাঙ্গিয়া দিলেন।

এই সংস্কারে সুলতানের আন্তরিক ইচ্ছা কোন সময়েই ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সংবিধান প্রত্যাহার করিলেন। "তরুণ তুর্কী" দল কনষ্টাণ্টিনোপলে সদলবলে উপস্থিত হইল, সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেদের পাহারায় রাজধানীর বাহিরে সরাইয়া দিল এবং আবদুল হামিদের ভ্রাতাকে তুর্কীর সুলতান পঞ্চম মহম্মদরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিল।

নূতন উদার গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ড অভিনন্দিত করিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে জর্ম্মান প্রভাবও অনেক কমিয়া গেল। "তরুণ তুর্কী" দল যে সব আশা জনসাধারণের মনে জাগাইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পাবিল না। অল্পদিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। "তরুণ তুর্কী" দলের প্রভাব দ্রুত কমিতে লাগিল। সুলতান ইহার পূর্ণ-সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তুরস্কে আবার সুলতানের স্বেচ্ছাচার আরও বেশী মাত্রায় সুরু হইয়া গেল।

"তরুণ তুর্কী" বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু উহার জের রহিয়া গেল। বুলগেরিয়ার উপর তুরস্কের যে সার্ব্বভৌম অধিকার ছিল এই গোলমালে বুলগেরিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া নিজেকে বুলগেরিয়ার সার্ব্বভৌম জার ঘোষণা করিলেন। সুলতান তাঁর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপীয় শক্তিদের কাছে আবেদন করিলেন। কেহ সাড়া দিল না। সুলতান তখন বুলগেরিয়ার জারের নিকট ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা চাহিলেন। বুলগেবিয়া তাহাও দিল না। যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। রাশিয়া তখন বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণের টাকাটা ধার দিল। সুলতান টাকা পাইয়া বুলগেরিয়ার পূর্ণ-স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন।

অষ্ট্রিয়া কয়েকদিনের মধ্যে বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা নিজের প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। আড্রিয়াতিক উপসাগরে অষ্ট্রিয়ার উপকূল খুব সামান্য ছিল। এই দুই জেলা কুক্ষিগত হওয়ায় অষ্ট্রিয়ান উপকূল বহুদূর প্রসারিত হইল। রাশিয়ার কাছে যেমন দার্দ্দানেলিস, ইংলণ্ডের কাছে যেমন সুয়েজ, অষ্ট্রিয়ার কাছে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হইল বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা। ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, তিনজনেই জানিত সমুদ্র পথে প্রবেশদ্বার না থাকিলে বাণিজ্য-বিস্তার অসম্ভব এবং বাণিজ্য-বিস্তার ভিন্ন অর্থ নৈতিক উন্নতি দুরাশা মাত্র।

সার্ব্বিয়া আড্রিয়াতিক উপসাগরের তীরে আসিতে চাহিতেছিল। অষ্ট্রিয়া বসনিয়া, হারজেগোভিনা অধিকার করায় তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার মত সার্ব্বিয়ারও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য আড্রিয়াতিক উপকূলে

আগমন অপরিহার্য ছিল। জাতিগত কারণেও সার্ব্বিয়ার সঙ্গে বসনিয়া -হারজেগোভিনার স্লাভ অধিবাসী এবং ডালমেসিয়ার ক্রোট ও স্লোভিন অধিবাসীদের সম্বন্ধ ছিল। অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে তখন দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা একজনই, কিন্তু রাজ্যের অষ্ট্রিয়ান অংশে অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট এবং হাঙ্গেরীর অংশে ছিল হাঙ্গেরিয়ান বা ম্যাগিয়ার গবর্ণমেণ্ট। বসনিয়া হারজেগোভিনা এবং ডালমেসিয়ার স্লাভ. ক্রোট এবং স্লোভিনরা ম্যাগিয়ার শাসনাধীনে যাইতে চাহে নাই। এই তিনটি জায়গা নিয়া অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবল শত্রুতা চলিতেছিল। সার্ব্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও রাণী দ্রাগা ১৯০৩ সালে নিহত হইয়াছিলেন। সার্ব্বিয়ার বিশ্বাস অষ্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ড করাইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া বসনিয়া হারজেগোভিনা অধিকার করিলে সার্ব্বিয়া ক্ষিপ্ত হইল, আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট দেখা দিল। অষ্ট্রিয়ার পিছনে জার্ম্মেনী আছে বুঝিয়া কেহই অগ্রসর হইল না। তিন বছর আগে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া রাশিয়া তখন ধুঁকিতেছে, তাহারও এই ঘটনায় হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং রাশিয়া বার্লিন চুক্তি ভঙ্গের এই অপমান হজম করিয়া গেল। সার্ব্বিয়া বেগতিক দেখিয়া হটিয়া গেল। অষ্ট্রিয়া তুরস্ককে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহাকে শান্ত করিল।

অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং জার্ম্মেনীর এই জয়লাভে ইউরোপ শঙ্কিত হইল, রাশিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং সার্ব্বিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন ধূমায়িত হইতে আরম্ভ করিল।

ইতালিও এইবার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। ফাঁকা ছিল উত্তর আফ্রিকা। তার মধ্যে ফ্রান্স আলজেরিয়া এবং টিউনিস, ইংলণ্ড মিশর দখল করিয়া নিয়াছে। বাকি ছিল ত্রিপলি। বার্লিন কংগ্রেসেই ইতালি ত্রিপলির উপর দাবী দিয়া রাখিয়াছিল। জার্ম্মেনী হঠাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে উহার দিকে নজর দিতে সুরু করিল। এদিকে জার্ম্মেনী এবং ইতালী মিত্রশক্তি। ত্রিপোলি নিয়া বন্ধুত্বে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করিল। ইতালি দেখিল দেরী

করিলে ত্রিপলি হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। ১৯১১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ইতালি অতর্কিতে ত্রিপলি আক্রমণ করিল এবং ত্রিপলি, বেনগাজী এবং ডিসনা সহর তিনটি অধিকার করিয়া লইল। তারপর চলিল যুদ্ধ। ইতালিয়ান নৌবহর দার্দ্দানেলিসের মুখে আক্রমণ চালাইল। তুর্কী আবার বিভিন্ন শক্তির অন্তর্ব্বিরোধের সুযোগে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল। এই সময় বলকান লীগ গঠিত হইয়া বলকানে এক নূতন বিপদ দেখা দিল। বলকানের খৃষ্টান রাজশক্তিদের অন্তর্ব্বিরোধে তুর্কীর সুবিধা হইতেছিল। গ্রীক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গ্রীস, সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো এবং বুলগেরিয়া মিলিত হইয়া বলকান লীগ গঠিত হইল। তুর্কী ইহাতে এত ভয় পাইল যে ইতালির সঙ্গে তাড়াতাড়ি সন্ধি করিয়া ফেলিল। ১৯১২ সালের অক্টোবরে লজান চুক্তিতে ইতালি ত্রিপোলি লাভ করিল।

প্রথম বল্কান যুদ্ধ

মাসিডোনিয়ার খৃষ্টান প্রজাদের ভাগ্য নিয়া অনেকদিন ধরিয়া বিরোধ চলিতেছিল। ইউরোপীয় শক্তিরা মাসিডোনিয়ার শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের চাপ দিলে তুর্কী রাজী হয়, আবার চাপ সরিয়া গেলেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ১৯০৩ সালে স্থির হইল মাসিডোনিয়ায় শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন তুর্কী ঠিক মত করে কি না অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তাহা তদারক করিবে। ট্যাক্স আদায় নিয়া গোল বাধিলে স্থির হইল একটি আন্তর্জ্জাতিক ফিনান্স কমিটি গঠিত হইবে এবং সেই কমিটির তত্ত্বাবধানে ট্যাক্স আদায় হইবে। এই জাতীয় বন্দোবস্ত এমনিতেই সফল হওয়া কঠিন। অসন্তোষ রহিয়া গেল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া তুরস্কের নিকট রেলের কতকগুলি সুবিধা আদায় করিয়া মাসিডোনিয়ার অভিভাবকত্ব হইতে সরিয়া গেল। সুলতান আবার মাসিডোনিয়ায় অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। খৃষ্টান প্রজাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

বলকান রাজ্যেরা দেখিল বৃহৎ শক্তিরা মাসিডোনিয়ার সাহায্যে আসিল না। তখন তাহারাই বলকান লীগ গঠন করিয়া অগ্রসর হইল। মাসিডোনিয়ায়

শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য তাহারা তুরস্ককে চরমপত্র দিল। সুলতান উহার উত্তর দিলেন না। ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে বলকান লীগ তুরস্ক আক্রমণ করিল। ইউরোপীয় শক্তিরা লীগকে থামিতে বলিল। লীগ উহা অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইল। ইহাই প্রথম বলকান যুদ্ধ।

বুলগেরিয়া, সার্ব্বিয়া, মন্টেনিগ্রো এবং গ্রীস চারিজনে চারিদিক হইতে একসঙ্গে তুরস্ক আক্রমণ করিল। তিনমাস যুদ্ধ চলিবার পর তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। কনষ্টাণ্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল, জনিনা এবং স্কুটারি এই চারিটি সহর ভিন্ন ইউরোপের এক ইঞ্চি জমিও তুরস্কের অধিকারে রহিল না।

লণ্ডনে শান্তি বৈঠক বসিল। চারিটি সহরের মধ্যে আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছাড়িতে হইল। আদ্রিয়ানোপল সমর্পণের সংবাদে তুরস্কে ভীষণ বিক্ষোভ হইল। তুরস্ক আবার বলকান লীগকে আক্রমণ করিল। এই নূতন আক্রমণে তুরস্ক আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আদ্রিয়ানোপল, জনিনা এবং স্কুটারি তিনটি সহরই গেল। স্কুটারি ছিল আলবেনিয়া সীমান্তের সহর। উহা নিয়া গোল বাধিল। বৃহৎ শক্তিরা স্কুটারি বলকান লীগের হাতে পড়িতে দিল না। উহাকে একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের শাসনাধীনে রাখিয়া দিল। লণ্ডনে গিয়া পরাজিত তুরস্ককে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইল। কনষ্টাণ্টিনোপল এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী থ্রেসের খানিকটা অংশমাত্র তুরস্কের হাতে রহিল।

প্রথম বলকান যুদ্ধের ফল—

(১) ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল,

(২) আলবেনিয়া অটোনমাস রাজ্যে পরিণত হইল,

(৩) ক্রীট গ্রীসের সহিত মিলিত হইল।

দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ

আলবেনিয়া নিয়া আবার অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল। সার্ব্বিয়া প্রস্তাব করিল আলবেনিয়া অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হউক। তাহাতে সার্ব্বিয়া আদ্রিয়াতিক উপসাগরের তীরে

আসিতে পারে। অষ্ট্রিয়া ঘোরতর আপত্তি করিল। অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করিতে হইলে সার্ব্বিয়াকে আড্রিয়াতিকে আসিতে দিতে হয়। অতএব রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স সার্ব্বিয়াকে সমর্থন করিল। জার্ম্মেনী দেখিল বলকান লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকিলে যে শক্তিব অধিকারী হইবে তাহাতে তার ক্ষতি। তুরস্ককে হাতে রাখিয়া বলকানে জার্ম্মেনী যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলকান লীগ তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পাবে। লীগের শক্তি হ্রাসের উপায় উহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। সার্ব্বিয়া সমুদ্র উপকূলে যাইতে বদ্ধপরিকর। আড্রিয়াতিকে যাইতে না দিলে সার্ব্বিয়া ঈজিয়ান উপসাগরে নজব দিবে এবং গ্রীসেব সঙ্গে সংঘর্ষে আসিবে। জার্ম্মেনী আলবেনিয়া বিভাগে অষ্ট্রিয়ার আপত্তি সমর্থন করিল। ভাবিল বলকান লীগের সদস্য সার্ব্বিয়া এবং গ্রীস লড়িয়া গেলে লীগ ভাঙ্গিবে। তুবস্কে জার্ম্মেনীর ঘাঁটি আছে। সমগ্র বলকানে প্রভাব বিস্তার তখন সহজ হইবে। অষ্ট্রিয়া বুঝাইয়া দিল আলবেনিয়া খণ্ডিত হইলে সে যুদ্ধে নামিবে। লণ্ডন বৈঠকে অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেনীর অভিলাষই পূর্ণ হইল।

তুরস্ক হইতে বিজিত সম্পত্তির ভাগ নিয়াই বলকান লীগে বিরোধ বাধিয়া গেল। গ্রীস বলিল—মাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা গ্রীক, অতএব মাসিডোনিয়া গ্রীসকে দিতে হইবে। বুলগেরিয়া বলিল—মাসিডোনিয়ার বহু অধিবাসী বুলগাব, অতএব উহা বুলগেরিয়াকে দিতে হইবে। মাসিডোনিয়ার একাংশে ঈজিয়ান উপসাগব। সার্ব্বিয়া বলিল—মাসিডোনিয়া পাইলে তাহাব সমুদ্রপথ হয়; তা ছাড়া তাহাকে যখন আলবেনিয়ার অংশ দেওয়া হয় নাই তখন মাসিডোনিয়া দিতে হইবে।

জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া এই বিরোধে উস্কানি দিল। ১৯১৩ সালের জুন মাসে একদিকে বুলগেরিয়া অপর দিকে সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, গ্রীস এবং রুমানিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাধিল দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। একমাসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া বুলগেরিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। তুরস্কও দেখিল এই সুযোগ। সে-ও বুলগেরিয়া আক্রমণ

করিয়া আদ্রিয়ানোপল কাড়িয়া নিল। বুলগেরিয়ার ধ্বংস অষ্ট্রিয়ার কাম্য ছিল না, সুতরাং এইবার অষ্ট্রিয়া আসিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিল। শান্তি বৈঠক বসিল বুখারেষ্টে। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত—

(১) বুলগেরিয়া রুমানিয়াকে সাইলিষ্ট্রিয়া এবং দোব্রুজার একটা বড় অংশ দিবে,

(২) গ্রীস, সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর মধ্যে মাসিডোনিয়ার যে সব অংশ বুলগেরিয়া দাবী করিয়াছিল তাহা বিভক্ত হইবে, মাত্র ৯ হাজার বর্গমাইল বুলগেরিয়া রাখিতে পারিবে,

(৩) বুলগেরিয়া তুরস্ককে আদ্রিয়ানোপল এবং থেস্রের অংশ ছাড়িয়া দিবে।

বুখারেষ্ট চুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হইল সার্ব্বিয়া। তাহার আয়তন ১৮ হাজার বর্গমাইল হইতে বাড়িয়া ৩৩ হাজার বর্গমাইল হইল। গ্রীসেরও অনেক লাভ হইল। তার আয়তন ১৫ হাজার বর্গমাইল বাড়িল। বুলগেরিয়া ঈজিয়ান উপসাগরের তীরে পৌছিল এবং কিছু জমিও পাইল বটে, তবে অনেক ক্ষতিও তার হইল।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের পরোক্ষ ফল খুব খারাপ হইল। বুলগেরিয়া তুর্কীর নিকট হইতে যুদ্ধে যে সব জায়গা কাড়িয়া নিয়াছিল তাহার অধিকাংশ ছাড়িতে বাধ্য হওয়ায় বলকানের অন্য রাজ্যগুলির উপর চটিয়া রহিল। রাশিয়া আবার বলকানের মুরুব্বী হইয়া দেখা দিল। তবে এবার তার রাগ তুরস্কের বিরুদ্ধে নয়, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। জার্ম্মেনী তুর্কী সেনাদল সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত করিতে মন দিল। অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার শত্রুতা চরমে উঠিল। সার্ব্বিয়া গোপনে বসনিয়া হার্জেগোভিনা এবং ডালমেসিয়ার স্লাভ, ক্রোট এবং স্লোভিনদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইতে লাগিল। তার আশা অন্তর্বিপ্লব ঘটাইয়া ঐ এলাকাগুলি নিজের কুক্ষিগত করিবে। অষ্ট্রিয়া বুঝিল সার্ব্বিয়াকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করিয়া একটা ভাল রকম শিক্ষা না দিলে অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে শান্তিরক্ষা অসম্ভব হইতেছে।

জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া, ইতালির মধ্যে ট্রিপ্‌ল এলায়েন্স এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়ার মধ্যে ট্রিপ্‌ল আঁতাত যুদ্ধের ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ছুতা খুঁজিতে লাগিল।

২৩শে জুন ১৯১৪ তারিখে অষ্ট্রিয়ার আর্চ্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড বসনিয়ার সিরাজেভো সহরে এক সার্ব্বিয়ানের বোমার আঘাতে নিহত হইলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই হত্যাকাণ্ড।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পরেই বিসমার্ক বুঝিয়াছিলেন এই পরাজয় ফ্রান্স সহজে মানিয়া লইবে না। প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে জার্ম্মেনীর অভ্যুদয় এবং আলসাস লোরেনের ন্যায় দুইটি লৌহসম্পদপূর্ণ প্রদেশ হস্তান্তর ফ্রান্স সহ্য করিবে না। ছয় বৎসরের বার্লিন চুক্তিতে সাময়িক শান্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না, আঘাত করিবার সুযোগ পাইলেই ফ্রান্স তাহা করিবে, বিসমার্ক ইহা জানিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—জার্ম্মেনীকে এখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, জার্ম্মেনীর সাম্রাজ্য লোভ উচিত নহে। ফ্রান্সের পরাজয়ে উল্লসিত হইয়া যাহারা যুদ্ধকামী হইয়া উঠিয়াছিল, বিসমার্ক নিজের দল এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। ফ্রান্স দ্রুত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য জলিতেছে, ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বিসমার্কের কূটনীতি ইউরোপে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনিই একমাত্র লোক যিনি এক সঙ্গে পাঁচটি বল হাতে নিয়া দুইটিকে শূন্যে রাখিয়া তিনটি নিয়া খেলিতে পারিতেন। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং ইতালি এই পাচটি দেশ নিয়া তিনি কূটনীতির চূড়ান্ত খেলা দেখাইয়াছেন। যখন

অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়াছেন তখন ইংলণ্ডকে রাখিয়াছেন দূরে আর সঙ্গে রাখিয়াছেন ফ্রান্স, ইতালি এবং রাশিয়াকে। আবার যখন ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছেন তখন অষ্ট্রিয়া, ইতালি এবং রাশিয়াকে হাতে রাখিয়াছেন এবং ইংলণ্ডকে রাখিয়াছেন দূরে। ফ্রান্স এবং রাশিয়া একজোট হইলে জার্ম্মেনীর বিপদ, সঙ্গে অষ্ট্রিয়া জুটিলে জার্ম্মেনীর সর্ব্বনাশ, সুতরাং সব সময় তিনি অষ্ট্রিয়াকে দলে নিয়া ফ্রান্সকে রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালি এই তিনজনে চুক্তিবদ্ধ থাকিলে মধ্য ইউরোপের প্রাচীর ভেদ করিয়া ফ্রান্স রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়া জার্ম্মেনী আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের রাজনীতিতে ইংলণ্ড যাহাতে না আসে তার দিকে তিনি সব সময় দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দেশে সোসালিষ্ট আন্দোলন দুর্ব্বল করিবার জন্য বিসমার্ক নিজেই শ্রমিকদের রোগ, দুর্ঘটনা এবং বৃদ্ধ বয়সের বীমার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিসমার্কের সমাজবীমা আইনের আদর্শে ও ছাঁচে পরে ইংলণ্ডের সমাজবীমা আইন তৈরি হইয়াছিল।

১৮৮৮ সালে বৃদ্ধ রাজা প্রথম উইলিয়াম পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৯১ বৎসর। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক সিংহাসনে বসিলেন। নিরানব্বই দিন রাজত্বের পর ফ্রেডারিক অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম। তাঁর বয়স তখন ২৯ বৎসর। নূতন কাইজারের সিংহাসন আরোহণে জার্ম্মেনীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন যেমন গর্ব্বিত, তেমনি বেপরোয়া। বিধাতার ইচ্ছা পূরণ করিতে বিশ্বে হোহেনজোলার্ণ বংশের আবির্ভাব, ইহাই ছিল তাঁর ধারণা। সিংহাসনে বসিয়াই তিনি বিশ্বসাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিলেন।

বিসমার্কের সঙ্গে কাইজারের সংঘর্ষ

নূতন রাজা এবং পুরাণো প্রধানমন্ত্রীতে সংঘর্ষ বাধিতে দেরী হইল না। কাইজার প্রথম উইলিয়াম কখনো বিসমার্কের অসম্মান করেন নাই, মতভেদ হইলেও তাঁহার কথাই শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া চলিয়াছেন। নূতন কাইজার প্রধানমন্ত্রীর প্রায় প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করিলেন। বিসমার্কের বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা কাইজারের সঙ্গে জুটিল।

নূতন কাইজার বিসমার্ককে সরাইবার জন্য তাঁহাকে অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন; কথায় কথায় বিসমার্কের উপর হুকুম জারী সুরু হইল। বিসমার্ক এর আগে তিনজন রাজার মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, কেহ কখনও তাঁহাকে হুকুম করেন নাই। কাইজার বিসমার্ককে জানাইয়া দিলেন তিনি যদি হুকুম তামিল না করেন তবে অন্য লোককে দিয়া তিনি তাহা করাইবেন। বিসমার্ক বলিলেন,—তবে কি আমি ইহাই বুঝিব যে আমি আপনার পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছি? কাইজার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—হাঁ। বিসমার্ক বাড়ী ফিরিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া কাইজারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কাইজার বিসমার্ককে রাজকীয় সম্মান ও উপাধি দান করিয়া এই পদত্যাগের তিক্ততা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। বিসমার্ক সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া রাজার এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। সোজা গেলেন প্রথম উইলিয়ামের সমাধিতে। সমাধির উপর নীরবে একটি গোলাপ ফুল রাখিয়া বিসমার্ক চিরতরে বার্লিন ত্যাগ করিলেন। রাজনীতির সহিত আর কোন সম্পর্ক তিনি রাখিলেন না। জেনারেল রুণ এবং মোল্‌ট্‌কেও তখন পরলোকে। পদত্যাগের পর বিসমার্ক আট বৎসর জীবিত ছিলেন।

ফ্রান্সে অসন্তোষ

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের পরে প্যারিসে বিদ্রোহ হইল। সোসালিষ্টরা গবর্ণমেণ্ট দখল করিবার চেষ্টা করিল। রিপাবলিকানরা উহাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া বিদ্রোহ বন্ধ করিল। রাজতন্ত্রবাদীরা এই সুযোগে

আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল। পাঁচ বৎসর অন্তর্ব্বিপ্লবের পর রিপাবলিকান দল জয়ী হইল। তৃতীয় ফরাসী রিপাবলিক ঘোষিত হইল এবং একটি সংক্ষিপ্ত গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হইল। সোসালিষ্ট আন্দোলনের চাপে ফ্রান্সেও সমাজবীমা আইন, ফ্যাক্টরী আইন, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন আইন প্রভৃতি পাশ হইল। ফ্রান্সের প্রগতির একটি বড় অন্তরায় ছিল রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের অচ্ছেদ্যতা। রিপাবলিকান ফ্রান্স ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলাদা করিয়া দিল। ১৯০৬ সাল হইতে সোসালিষ্টরা আবার বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা স্থরু করিল। কলকারখানায় ধর্ম্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। ১৯১০ সালে বিরাট রেল ধর্ম্মঘট হইল। সোসালিষ্ট ব্রিঁয়া তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এক নূতন চাল দিলেন। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিলেই তিনি উহাদিগকে ধরিয়া জোর করিয়া সৈন্যদলে ঢুকাইতেন এবং রেল লাইন এবং কলকারখানা পাহারায় নিযুক্ত করিতেন। যে ধর্ম্মঘট তাহারা নিজেরা বাধাইয়াছে সেই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার কাজে সেই লোকদেরই লাগানো হইত। সামরিক হুকুম পালনে অস্বীকারের অর্থ সকলেই জানিত।

ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি

ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থরু হইল সামরিক প্রস্তুতি। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা আশ্চর্য্য দ্রুততার সঙ্গে ফ্রান্স মিটাইয়া দিল। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট ৩০০ কোটি ফ্রাঙ্ক চাঁদা চাহিলেন, ৪২০০ কোটি ফ্রাঙ্ক চাঁদা উঠিয়া গেল। দুই বছরের মধ্যে জার্ম্মেনীর সমস্ত পাওনা মিটাইয়া দিলে জার্ম্মেনী ফ্রান্স হইতে সৈন্য সরাইয়া লইল। রেল, রাস্তা, পুল এবং দুর্গ নির্ম্মাণে ফ্রান্স আত্মনিয়োগ করিল।

জার্ম্মেনীর সামরিক প্রস্তুতি

বিসমার্ক ভাবিয়াছিলেন ফ্রান্সের পাণ্টা আঘাত আসিতে অন্ততঃ ৫০ বা ৬০ বছর সময় লাগিবে। কিন্তু ফ্রান্সের কাজ দেখিয়া বুঝিলেন এত সময় লাগিবে না। জার্ম্মেনীর আত্মরক্ষার কথা এখনই ভাবিতে হইবে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান

যুদ্ধে প্রুশিয়ার সাফল্যের দুইটি প্রধান কারণ ছিল বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জা। প্রুশিয়াই সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের (Conscription) আইন পাশ করে। প্রুশিয়ার দেখাদেখি ফ্রান্সও এই আইন পাশ করিল। যুদ্ধের ১৫ বছর পরে, ১৮৮৫ সালেই ফ্রান্সের সৈন্য-সংখ্যা হইল ৫ লক্ষ; জার্ম্মেনীর ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। জার্ম্মেনীর চেয়ে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা কম। ২০ বছর বাদে ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা হইল ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার, জার্ম্মেনীর ৫ লক্ষ ৫ হাজার। ১৯১৩ সালে জার্ম্মেনী একটি নূতন সমর আইন (Army Act) জারী করিল। ফলে তার সৈন্যসংখ্যা হইল ৮ লক্ষ। ফ্রান্স পাল্টা আইন জারী করিয়া তিন বছরের জন্য সৈন্যদলে চাকরি বাধ্যতামূলক করিয়া দিল। ফলে ফ্রান্স ১৫ দিনের মধ্যে ৪০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল। ১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের সৈন্যসংখ্যা হইল আড়াই লক্ষ।

জার্ম্মেনীর নূতন কাইসার শুধু স্থলসৈন্য বাড়াইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নৌবহর বৃদ্ধিতেও মন দিলেন। বিসমার্ক বলিতেন জার্ম্মেনী ডাঙ্গার ইঁদুর, ইংলণ্ড জলের ইঁদুর, দুই ইঁদুরে লড়াইয়ের কোন প্রয়োজন নাই। কাইসার ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে সুরু করিলেন। ইংলণ্ডের নৌবহর এত বড় ছিল যে যে-কোন দুইটি দেশের নৌবহর একত্র করিলেও বৃটিশ নৌবহর তার চেয়ে বড় থাকিত; ইহাকে বলিত Two Power Superiority Standard। জার্ম্মেনী পূর্ণোদ্যমে ড্রেডনট নির্ম্মাণে মন দিল এবং এক নূতন ধরণের যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করিল। ইংলণ্ড দেখিল জার্ম্মেনী যে হারে যুদ্ধ জাহাজ তৈরি সুরু করিয়াছে তাহাতে আর পাঁচ বছর বাদে তার দুই শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের মান বজায় থাকিবে না। বৃটেন যুদ্ধজাহাজ তৈরির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিল। উইনষ্টন চার্চ্চিল ১৯১১ সালে ইংলণ্ডের নৌবহরের প্রধান লর্ড। তিনি ঘোষণা করিলেন, জার্ম্মেনী যত জাহাজ তৈরি করিবে ইংলণ্ডকে তার শতকরা ৬০টি বেশী রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠত্ব যাহাতে না থাকে তার জন্য কাইসার প্রাণপণে যুদ্ধ জাহাজ তৈরি সুরু করিলেন।

রাশিয়ায় অসন্তোষ ও বিপ্লব

রাশিয়ায় দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বেচ্ছাচারী শাসনের জন্য তিনি সকল শ্রেণীকেই চটাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। নূতন জার হয়ত উদারতার পথ অবলম্বন করিবেন দেশের লোক এই আশা প্রকাশ করিলে তিনি সোজা জানাইয়া দিলেন যে তাঁর পিতার অটোক্রাসি তিনিও ঠিক ঐরূপ আগ্রহের সঙ্গেই চালাইয়া যাইবেন। আবার বাশিয়ায় বিপ্লবের আগুন জ্বলিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিপ্লবীদের একটি গুলি তাঁর কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তিনদিন পর ফাদার সাপোঁ জনসাধারণের এক শোভাযাত্রা নিয়া তাহাদের দাবী জানাইবার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্গ উইণ্টার প্যালেসে গেলেন। জারের সৈন্যদল শোভাযাত্রীদের উপর নির্ব্বিচারে গুলি চালাইল। সেদিন ছিল রবিবার। এই রবিবার রাশিয়ার ইতিহাসে রক্তাক্ত রবিবার নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এই গুলিচালনার সংবাদে রাশিয়ার সর্ব্বত্র বিদ্রোহ সুরু হইয়া গেল। কৃষকেরা লর্ডদের বাড়ী আক্রমণ করিল, পুলিশ অফিসারদের ধরিয়া হত্যা করিতে লাগিল। জার নরম হইলেন। অক্টোবর মাসে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিলেন এবং ব্যাপক শাসন সংস্কার ঘোষণা করিয়া ইস্তাহার জারী করিলেন; প্রথম ডুমা অথবা পার্লামেণ্ট স্থাপন করিলেন। তবু জনমত সন্তুষ্ট হইল না। ডিসেম্বরে মস্কোতে সাংঘাতিক বিদ্রোহ হইল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক নিহত হইল। জারের মন্ত্রীদের মধ্যে দুইদল হইল। একদল চাহিলেন আপোষ করিতে, অপরদল চরম দমননীতির পক্ষপাতী। বিপ্লবীদের মধ্যেও দুইদল হইয়া গেল। একদল জারের অক্টোবর মাসের ইস্তাহার সমর্থন করিলেন। তাঁহারা অভিহিত হইলেন অক্টোব্রিষ্ট নামে। অপরদল চরমপন্থী, তাঁহারা প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম

চালাইয়া যাইতে চাহিলেন। সোসালিষ্টরাও ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল।

১৯০৬ সালের ৬ই মে প্রথম ডুমা বসিল। ডুমাকে প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই দেওয়া হয় নাই। তথাপি উহার প্রতিনিধিরা গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেন। ২১শে জুলাই জার প্রথম ডুমা ভাঙ্গিয়া দিলেন। পরবৎসর মার্চ্চ-মাসে দ্বিতীয় ডুমা গঠিত হইল। চার মাস বাদে উহাও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ভোটাধিকার কমাইয়া দিয়া এইবার তৃতীয় ডুমা গঠিত হইল, উহাতে মডারেটরা বেশী আসিলেন। তৃতীয় ডুমা পাঁচ বছর টিঁকিল। ১৯১২ সালে চতুর্থ ডুমা গঠিত হইল। উহা আরও নরমপন্থী হইল। এদিকে বিপ্লবীদের উপর দমননীতি অবাধে চলিতে লাগিল। জেল, ফাঁসি, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন কথায় কথায় সুরু হইল। প্রকাশ্য বিচার বন্ধ হইয়া গোপন বিচারে অথবা বিনা বিচারে শাস্তি সুরু হইল। এর মধ্যে রাশিয়ায় আর এক বিরাট ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধে রাশিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। এশিয়ার এক নব জাগ্রত দেশের নিকট এই পরাজয়ে প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে রাশিয়ার সুনাম প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে এই ছিল রাশিয়ার অবস্থা।

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির প্রথম কথা ছিল রাশিয়ার সঙ্গে স্থায়ী সন্ধি। এই একটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি জার্ম্মেনীর ঐক্য সাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা ছিল অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি। অষ্ট্রিয়াকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, জার্ম্মান কনফেডারেশন হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন কিন্তু কোন সময়েই তাহাকে অপমান করেন নাই বলিয়া অষ্ট্রিয়াও সাডোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের কথা মনে রাখে নাই। জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া এই তিন শক্তি একত্র থাকিলে ফ্রান্স কিছু করিতে পারিবে না ইহা বিসমার্ক জানিতেন। তাই সেডান যুদ্ধের পরদিন হইতেই তিনি এই ত্রিশক্তি চুক্তি গঠনে মন দিলেন। ১৮৭২ সালে 'তিন সম্রাটের লীগ' (Dreikaiser Bund) গঠিত হইল। সোসালিজম এবং কমুনিষ্ট অন্তর্জ্জাতিক তখন ইউরোপে

শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ইহা ঠেকানোও এই লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব

বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক তুরস্ক নিয়া ইউরোপীয় যুদ্ধ ঠেকাইতে রাশিয়ায় বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তিন সম্রাটের লীগ হইতে সরিয়া আসিলেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার মন কষাকষি অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল। এই ঘটনায় জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হইল। উভয়ে সন্ধি হইল যে রাশিয়া একজনকে আক্রমণ করিলে অপরজন তাহাকে সাহায্য করিবে।

ত্রিশক্তি চুক্তি

বিসমার্ক দেখিলেন ইতালি: সঙ্গে রাখা দরকার, ফ্রান্স ও রাশিয়া যেন একসঙ্গে মিলিত হইতে রাস্তা না পায়। টিউনিস নিয়া বিসমার্ক ইতালিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিলেন। জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালির মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাই বিসমার্কের ট্রিপল এলায়েন্স।

রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মেনীর গোপন চুক্তি

বিসমার্ক এখানেই থামিলেন না। ত্রিশক্তি চুক্তিতে আলেকজাণ্ডার চিন্তিত হইয়াছেন বুঝিয়া তিনি এবার রাশিয়াকে ফ্রান্স হইতে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। তখনকার মত রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মিলন তিনি ঠেকাইয়া দিলেন। ১৮৮৫ সালের বুলগেরিয়ান সঙ্কটে রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যখন যুদ্ধ প্রায় বাধে, তখন বিসমার্ক দিলেন চূড়ান্ত চাল। রাশিয়ার সঙ্গে তিনি এই মর্ম্মে গোপন চুক্তি করিলেন যে একজন আক্রান্ত হইলে অপরজন তাহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে। এই চুক্তির সংবাদ বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে গোপন রাখিলেন।

জার্মেনীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

১৮৯০ সালে পদত্যাগের সময় বিসমার্ক জার্মেনীর আত্মরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা রাখিয়া গেলেন তাহা মোটামুটি এইরূপ—

(১) অষ্ট্রিয়া জার্মেনী আক্রমণ করিলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে।

(২) রাশিয়া জার্মেনী আক্রমণ করিলে অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে।

(৩) ফ্রান্স জার্মেনী আক্রমণ করিলে ইতালি সাহায্য করিবে।

(৪) ফ্রান্স এবং রাশিয়া একসঙ্গে জার্মেনী আক্রমণ করিলে অষ্ট্রিয়া এবং ইতালি সাহায্য করিবে।

এত জটিল কূটনীতি পরিচালনা বিসমার্ক ছাড়া সম্ভব নহে, তাই বিসমার্কের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জার্মেনীর কূটনৈতিক বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িল।

রাশিয়ার সঙ্গে কাইজারের বিরোধ

কাইজার তিন বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে চটাইলেন। রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিল। বিসমার্ক ইংলণ্ডকে চটান নাই। ছয় বৎসরের মধ্যে কাইজার ইংলণ্ডকে ক্ষেপাইলেন। কাইজারের বিশ্বসাম্রাজ্যের স্বপ্ন এবং টিউটন জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এত প্রকট হইয়া উঠিল যে দুই বৎসরের মধ্যে আমেরিকান নৌবহরের এডমিরাল ডিউই বলিলেন আগামী যুদ্ধ হইবে জার্মেনীর সঙ্গে। জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালির ত্রিশক্তি চুক্তি বজায় রহিল বটে, তবে ইতালি ইতস্ততঃ করিতে সুরু করিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া পাণ্টা ত্রিশক্তি চুক্তির দ্বারা জার্মেনীর জবাব দিল। কাইজার একটি নূতন মিত্র সংগ্রহ করিলেন—তুর্কী। ইতিমধ্যে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল। উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

জার্মেনীর সহিত বন্ধুত্বে ইংলণ্ডের আগ্রহ

বিসমার্ক ইংলণ্ডের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, বিসমার্কের পদত্যাগের পরেও ইংলণ্ড তাহা বজায় রাখিতে চাহিল। কাইজারও ইংলণ্ডের প্রতি

অনেক শুভেচ্ছা জানাইলেন। ইংলণ্ডের শত্রু জার্মেনী ছিল না, ছিল ফ্রান্স এবং রাশিয়া। গ্লাডষ্টোন এমনও বলিয়াছিলেন যে জার্মেনী যদি উপনিবেশ স্থাপন করিতে চায় তবে ইংলণ্ড তাহাকে মিত্রশক্তিরূপে সাহায্য করিবে। জাঞ্জিবার দ্বীপের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড জার্মেনীকে হেলিগোলাণ্ড ছাড়িয়া দিল। বিনাযুদ্ধে হেলিগোলাণ্ড প্রাপ্তিকে কাইজার এক বিরাট লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়া বিরোধ

দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়া জার্মেনীর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়া গেল। বন্ধুতা শত্রুতায় পরিণত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁর নিকট কাইজারের নামে এক টেলিগ্রাম গেল। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড জার্মেনীর উপর ক্ষেপিয়া গেল। বুয়র যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড বিষম বিপদে পড়িয়াছিল। এক দিকে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধ চলিতেছে, সেই সঙ্গে বাধিল জার্মেনীর সঙ্গে বিবাদ। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৯ সালে হেগ সহরে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। ইংলণ্ডের তখন এমন অবস্থা যে ফ্রান্স, জার্মেনী, রাশিয়া তিনজনে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে। জার্মেনী মন স্থির করিতে পারিল না। ইংলণ্ডকে ধ্বংস করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ জার্মেনী হাতে পাইয়াও নষ্ট করিল।

চেম্বারলেনের মিতালির প্রস্তাব

হেগ সম্মেলনে ইংলণ্ড বুঝিল ইউরোপে আলাদাভাবে থাকা অসম্ভব। যোসেফ চেম্বারলেন জার্মেনী সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাব জানিয়াও জার্মেনীর সঙ্গেই আপোষের চেষ্টা করিলেন। রাশিয়া তখন আফগানিস্থানের উপর দিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে হাত বাড়াইতেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা চলিতেছে—এই অবস্থায় জার্মেনীর সঙ্গে মিত্রতাই তিনি সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়

মনে করিলেন। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মেনীর মিতালী হইলে আমেরিকাকেও উহার মধ্যে টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল।

কাইজার তখন আবার রাশিয়ার সঙ্গে মিতালী করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যোসেফ চেম্বারলেনের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য রাশিয়াকে কোনঠাসা করা। কাইজার চেম্বারলেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে মিতালীর সুযোগ আবার আসিল, আবারও উহা হাতছাড়া হইল।

ইংলণ্ড জাপান সন্ধি

ইংলণ্ড এইবার গিয়া সন্ধি করিল জাপানের সঙ্গে। রাশিয়া দুইদিক হইতে কোণঠাসা হইয়া পড়িল।

বার্লিন বাগদাদ রেল বিরোধ

বার্লিন বাগদাদ রেলওয়ে নিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেনীর বিরোধ বাড়িয়া উঠিল। লর্ড ল্যান্সডাউন পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন এই রেলপথ বিস্তারে ইংলণ্ড সর্ব্বশক্তি দিয়া বাধা দিবে। ইংলণ্ডের চাপে রেলপথ পারস্য উপসাগরের তীরে গিয়া পৌছিতে পারিল না। জর্ম্মান নৌবহর বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া ইংলণ্ড এইবার ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিল। মিশর নিয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘকাল যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা মীমাংসা হইয়া গেল। ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি সম্পাদিত হইল। মরক্কোতে ফরাসী অনুপ্রবেশ ইংলণ্ড মানিয়া নিল। চিরশত্রু ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি ইংলণ্ডে এক বিপ্লবের নামান্তর। জার্ম্মেনীর আতঙ্কে তাহাও সম্ভব হইল। ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেনীর বোঝাপড়ার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

ইংলণ্ড রাশিয়া সন্ধি

তিন বছরের মধ্যে ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে আর এক বিপ্লব ঘটিয়া গেল—রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সন্ধি। ইঙ্গ-রাশিয়ান সন্ধির তিনটি কারণ ছিল—রুশ-জাপান যুদ্ধ, মরক্কো সঙ্কট এবং জর্ম্মান নৌবহর বিল।

রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং ঐ সঙ্গে দেশে অন্তর্ব্বিপ্লবে রাশিয়া এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে ইংলণ্ড বুঝিয়াছিল রাশিয়া হইতে আর আক্রমণের আশঙ্কা নাই।

জার্ম্মেনীর নৌবহর বিল

১৯০৬ সালে জার্ম্মেনী নৌবহর আইন সংশোধন বিল উত্থাপন করিল। ঐ বিলে পাঁচটি বড় ক্রুজার নির্ম্মাণের এবং জর্ম্মান নৌবহরের ব্যয় মোট বরাদ্দের আরও এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব হইল।

মরক্কো সঙ্কট

প্রথম যুদ্ধের আগে চারিটি ঘটনা ঘটে। তার প্রথমটি মরক্কো সঙ্কট। এই ঘটনায় ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধির দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়। আফ্রিকায় জিব্রাল্টারের ঠিক দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য মরক্কোর উপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মেনী এবং ইতালি এই পাঁচ শক্তির নজর পড়িয়াছিল। মরক্কোর লৌহসম্পদ এবং ভৌগোলিক অবস্থান দুই-ই ছিল আকর্ষণের হেতু। ফ্রান্স কিছুদিন আগে আলজিরিয়া দখল করিয়াছে। মরক্কো আলজিরিয়ার পাশে, সুতরাং উহাতে তাহারই অধিকার, ফ্রান্স এই দাবী তুলিল। ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তিতে ইংলণ্ড মরক্কোর অধিকার মানিয়া নেওয়ায় ফ্রান্স সেখানে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ সুরু করিল। সুলতানকে টাকা ধার দিয়া সিকিউরিটি হিসাবে ফ্রান্স মরক্কোর শুল্ক অফিসগুলি দখল করিল। রাস্তা, টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আরম্ভ করিল। অল্পদিনেই ফ্রান্স এমন অবস্থা করিয়া আনিল যেন মরক্কো তাহার প্রদেশে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাইজার মরক্কোতে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি নিজে তাঞ্জিয়ারে গেলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে সুলতানের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি প্রাণপণ করিবেন। কাইজার তখন তুরস্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছেন এবং মুসলমান সমাজের মুরুব্বী হইয়াছেন। কাইজারের ভরসায় জোর পাইয়া মরক্কোর সুলতান ফ্রান্সকে হটিয়া যাইতে বলিলেন। কাইজারের পরামর্শে সুলতান দাবী করিলেন এক ইউরোপীয় সম্মেলনে মরক্কোর প্রশ্ন আলোচিত

হউক। ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলা ছিল কাইজারের আসল উদ্দেশ্য। ফ্রান্স মরক্কোতে জর্ম্মান হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিল। কাইজার ইউরোপীয় সম্মেলনের উপর জোর দিলেন। যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে ফ্রান্স সম্মেলনের দাবী মানিয়া নিল। জার্ম্মেনীর কূটনীতি জয়যুক্ত হইল। সম্মেলনে স্থির হইল ফ্রান্স মরক্কো অধিকার করিতে পারিবে না, উহার দরজা সকলের জন্য খোলা থাকিবে এবং মরক্কোর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকিবে আন্তর্জ্জাতিক। জার্ম্মেনীর জয় আপাতদৃষ্টিতে হইলেও এই সম্মেলনে অষ্ট্রিয়া ছাড়া তাহাকে আর কেহ সমর্থন করিল না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, ইতালি সকলেই একসঙ্গে রহিল। আমেরিকা মধ্যস্থতা করিতেছিল, সেও গোপনে ফ্রান্সকেই সমর্থন করিল। কাইজারের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। মরক্কোতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তিনি ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি ভাঙ্গিতে, উহা আরও দৃঢ় হইল। ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে দুই দল হইল। এক পক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইতালি, অপর পক্ষে জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দল ভাগাভাগি অনেকটা এইখানেই হইয়া গেল।

ত্রিশক্তি আঁতাত

১৯০৬ সালের জর্ম্মান নৌবহর বিলের পর ইংলণ্ড রাশিয়ার দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ঝুঁকিল। ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রাশিয়ান কনভেনসনে পারস্য, আফগানিস্থান এবং তিব্বতে উভয়ের স্বার্থ সম্বন্ধে বোঝাপড়া হইয়া গেল। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের চুক্তি আগেই হইয়াছিল, এবার রাশিয়া উহাতে যোগ দিল। সঙ্গে রহিল জাপান। রাশিয়া ভারতবর্ষ কাড়িয়া নিবে এই ভয় বংশানুক্রমে ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ইঙ্গ-রাশিয়ান আঁতাতে সেই ভীতি চিরতরে দূর হইয়া গেল। রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আবার মোড় ঘুরিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর রাশিয়া এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিয়াছিল। ইঙ্গ-রাশিয়ান আঁতাতে তার এশিয়ার খেলা বন্ধ হইল। রাশিয়া আবার ঝুঁকিল বলকানে। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। রুশ

নৌবহর দলে পাইয়া ইংলণ্ডের জর্মান নৌবহর ভীতি অনেকটা কমিয়া গেল। ত্রিশক্তি আঁতাতে ফ্রান্স আলসাস-লোরেণ পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত হইল।

আগাদির সঙ্কট

১৯১১ সালে আবার মরক্কো নিয়া গোল বাধিল। আলজেসিরাস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ফ্রান্স কোন সময়েই অন্তরে মানিয়া নেয় নাই। অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া ফ্রান্স মরক্কোতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের অজুহাতে সৈন্য পাঠাইল। জার্ম্মেনী ফরাসী সৈন্য সরাইতে বলিল, ফ্রান্স সরাইল না। জার্ম্মেনী তখন মরক্কোর আগাদির বন্দরে প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া দিল। অজুহাত দিল মরক্কোতে জার্ম্মেনীর স্বার্থ রক্ষা, আসলে ফ্রান্সকে ভীতি প্রদর্শন। ইংলণ্ড এবার প্রকাশ্যে এবং দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সকে সমর্থন করিল। জার্ম্মেনী দেখিল আর বাড়াবাড়ি করিলে যুদ্ধ হইবে। জর্মান যুদ্ধ-জাহাজ ফিরিয়া গেল। মরক্কোতে ফরাসী অভিভাবকত্ব জার্ম্মেনী মানিয়া নিল। আগাদির ঘটনায় জার্ম্মেনীর পরাজয় ঘটিল।

তুরস্কের সহিত ইতালির যুদ্ধ

১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালি তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ একটির পর একটি ঘটিয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্ব্বিয়া এবং রাশিয়ার সম্পর্ক চূড়ান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। বলকানে ইউরোপীয় শক্তিদের স্বার্থের সংঘাত দেখিয়া বিসমার্ক বুঝিয়াছিলেন বলকান নিয়া বিশ্বযুদ্ধ ঘটিবে। তাঁর এক বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন—আমি বিশ্বযুদ্ধ দেখিতে পাইব না, তুমি দেখিবে, উহা আরম্ভ হইবে বলকানে।

ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনাণ্ডের হত্যা

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনাণ্ড বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে একজন সার্ব্বিয়ানের বোমার আঘাতে নিহত হইলেন। অষ্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ দায়িত্ব সার্ব্বিয়া

গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইল। জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে চুক্তি হইল অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়াকে শাস্তি দিবে এবং এই সুযোগে বলকানের কণ্টক উৎপাটিত করিবে। ইউরোপীয় অন্য কোন শক্তি সার্ব্বিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইলে জার্ম্মেনী তাহা ঠেকাইবে। দুজনেই ভাবিয়াছিল অষ্ট্রিয়া-সার্ব্বিয়া বিরোধ বলকানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ২৩শে জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়াকে চরমপত্র দিয়া দাবী করিল—সমস্ত অষ্ট্রিয়া বিরোধী প্রচারকার্য্য বন্ধ করিতে হইবে, ঐ জাতীয় সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে, প্রচারকার্যে লিপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী ও স্কুল শিক্ষককে পদচ্যুত করিতে হইবে, সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অষ্ট্রিয়া যে দুইজন সার্ব্বিয়ান অফিসারের নাম করিয়াছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শাস্তি দিতে হইবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই পত্রের উত্তর দাবী করা হইল। যথাসময়ের মধ্যেই সার্ব্বিয়া জবাব দিয়া জানাইল কতকগুলি সর্ত্ত সে মানিতে রাজি আছে কিন্তু সবগুলি মানিবার অর্থ তাহার সার্ব্বভৌমত্ব অষ্ট্রিয়ার পায়ে সমর্পণ, তাহা সে করিতে পারে না। কাইজার এই ঘটনায় তাঁর নির্লিপ্ততা দেখাইবার জন্য নরওয়েতে বেড়াইতে গেলেন।

রাশিয়ার চরমপত্র

অষ্ট্রিয়ার মতলব বুঝিতে রাশিয়ার দেরী হইল না। সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের সুযোগে সার্ব্বিয়াকে ধ্বংস করিয়া অষ্ট্রিয়া বলকানে আরও বেশী জাঁকিয়া বসিবে রাশিয়া তাহা চাহে নাই। ২৭শে জুলাই রাশিয়া সার্ব্বিয়াকে জানাইয়া দিল অষ্ট্রিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে রাশিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না।

ইংলণ্ডের সালিশীর চেষ্টা

ইংলণ্ড মধ্যস্থতার চেষ্টা করিল। স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ২৪শে জুলাই প্রস্তাব করিলেন বলকানে ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইতালি এবং ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ স্বার্থ আছে, এই চারজনে মিলিয়া অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার বিরোধে সালিশী করুক। অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেনী দুজনেই এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলিল—সেরাজেভো

হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার ঘরোয়া ব্যাপার, উহাতে অপরের হস্তক্ষেপ চলিতে পারে না। সার্ব্বিয়ার ধ্বংস এদের দুজনেরই মনোগত অভিপ্রায়।

রাশিয়ার চরমপত্রে কাইজারের দুশ্চিন্তা

রাশিয়া সার্ব্বিয়াকে সমর্থন করায় কাইজার একটু চিন্তিত হইলেন। জার নিকোলাস কাইজার উইলিয়ামের ব্যক্তিগত বন্ধু। কাইজাব নিকোলাসকে টেলিগ্রামে অনুরোধ জানাইলেন যে তিনি সার্ব্বিয়ায় সৈন্য পাঠাইয়া ইউরোপীয় যুদ্ধ অপরিহার্য্য করিয়া না তোলেন। রাশিয়া ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বোঝা-পড়ার চেষ্টা করিয়াছিল, উহার অসাফল্যেব মূল কারণ জার্ম্মেনী ইহাও বুঝিয়া নিয়াছিল। নিকোলাস কাইজারেব প্রস্তাবে রাজি হইলেন না।

সার্ব্বিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

২৮শে জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পরদিন বেলগ্রেডে গোলা বর্ষণের সংবাদ পাইয়া নিকোলাস অষ্ট্রিয়ান এবং জর্ম্মান উভয় সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

জার্ম্মেনী দেখিল সংঘর্ষ অষ্ট্রিয়া এবং সার্ব্বিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। ইউরোপীয় যুদ্ধ হইবেই। যুদ্ধে যখন নামিতেই হইবে তখন বিলম্বে কি ফল? ৩১শে জুলাই রাশিয়া চরমপত্র পাইল ১২ ঘণ্টার মধ্যে সীমান্ত হইতে সৈন্য না সরাইলে জার্ম্মেনীও সৈন্য সমাবেশ করিবে। সেইদিনই ফ্রান্সেও এক নোট পাঠাইয়া জার্ম্মেনী জানিতে চাহিল রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মেনীব যুদ্ধ হইলে ফ্রান্স কি করিবে।

রাশিয়া জার্ম্মেনীর চরমপত্রের উত্তর দিল না। ১লা আগষ্ট জার্ম্মেনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মেনীর যুদ্ধ ঘোষণা

৩০শে জুলাই ফ্রান্স ইংলণ্ডকে জানাইয়া দিল যে রুশ-জর্ম্মান যুদ্ধ হইলে ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে তার চুক্তি মানিয়া চলিবে। জার্ম্মেনীকে ফ্রান্স জানাইল

যে সে তার নিজের স্বার্থ দেখিয়া চলিবে। জার্ম্মেনী বুঝিল ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবে না। ৩রা আগষ্ট জার্ম্মেনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ইতালির নিরপেক্ষতা ঘোষণা

ঐ দিনই ইতালি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া বলিল যে অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেনী যখন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে না তখন সে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না।

জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা

২রা আগষ্ট জার্ম্মেনী নিরপেক্ষ রাজ্য লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করিল। ৪ঠা আগষ্ট বেলজিয়ামের রাজা ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে টেলিগ্রাম করিলেন যে জার্ম্মেনী বেলজিয়ামের উপর দিয়া ফ্রান্সে সৈন্য পাঠাইবার পথ চাহিতেছে। তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বৃটিশ রাজনীতির একটি মূল কথা এই যে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই হইবে। স্যার এডওয়ার্ড গ্রে জর্ম্মান গবর্ণমেণ্টের নিকট জানিতে চাহিলেন জার্ম্মেনী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিবে কি না। ১২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি উত্তর চাহিলেন। টেলিগ্রাম আসিবার আগেই জর্ম্মান সৈন্য বেলজিয়ামে ঢুকিয়া গিয়াছে। ৪ঠা আগষ্ট ইংলণ্ড জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সুরু হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধের ব্যাপকতা

যুদ্ধে শুধু ইউরোপ নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং শেষ পর্য্যন্ত চীন, জাপান এবং আমেরিকা আসিয়া নামিল। ইউরোপীয় শক্তিরা প্রথমটা ভাবিয়াছিল যুদ্ধ বেশীদিন টিঁকিবে না। অষ্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ছয় সপ্তাহ এবং ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ছয় মাসে শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে অল্পদিনেই বোঝা গেল ইহাতে শুধু সামরিক শক্তির পরীক্ষাই হইবে না, অর্থ নৈতিক শক্তিরও পরীক্ষা হইবে এবং শুধু শক্তি পরীক্ষা নয়, ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতারও পরীক্ষা হইবে।

ইতালি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় একদিকে রহিল শুধু জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া, অপরপক্ষে প্রথমেই দাঁড়াইয়া গেল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, সার্ব্বিয়া এবং বেলজিয়াম। জার্ম্মেনী পড়িল বেশী অসুবিধায়। তাহাকে দুই ফ্রণ্ট সামলাইতে হইল। মিত্রশক্তির লোকবল এবং অর্থ নৈতিক সম্পদ উভয়ই অনেক বেশী হইল।

জার্ম্মেনীর বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ

জার্ম্মেনী প্রথমেই বেলজিয়ামে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিল। এক নূতন ধরণের কামান জার্ম্মেনী আবিষ্কার করিয়াছিল, উহাতে একটন ওজনের গোলা ১৫ মাইল দূরে নিক্ষেপ করা যাইত। এই কামান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বিস্ময়। ১৫ দিনের মধ্যে বেলজিয়ামের রাজধানী আত্মসমর্পণ করিল। বেলজিয়ামের যুদ্ধে বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্য হটিয়া গেল। আগষ্ট মাসের শেষে জার্ম্মেনী ফ্রান্সে ঢুকিয়া পড়িল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জর্ম্মান সৈন্য প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট বোর্দোতে সরিয়া গেল। জেনারেল জোফ্রে' মার্ণ নদীর তীরে জর্ম্মান সৈন্যদলকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। এই প্রথম জার্ম্মেনী প্রকৃত বাধার সম্মুখীন হইল। জার্ম্মেনীর ধারণা ছিল ছয় সপ্তাহে ফ্রান্স জয় সম্পূর্ণ হইবে। জোফ্রে'র বাধায় তাহা সম্ভব হইল না। মার্ণ নদীতীরে প্রথম বাধা দিয়া জোফ্রে' হটিয়া গেলেন এইন নদীতীরে। সেখানে জর্ম্মানী ফরাসী সৈন্যকে আর হটাইতে পারিল না। ছয় সপ্তাহে প্যারিস দখল হইল না।

এইবার জোফ্রে' সুরু করিলেন পাণ্টা আক্রমণ। বেলজিয়ামের ইপ্রে-তে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। এই প্রথম জার্ম্মেনী পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিল। ডানকার্ক এবং ক্যালে বন্দরেও জার্ম্মেনী পৌছিতে পারিল না।

রাশিয়ার জার্ম্মেনী আক্রমণ

পূর্ব্ব সীমান্তে রাশিয়া ৫ লক্ষ সৈন্য নিয়া পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় ঢুকিয়াছিল। প্রথমটা রাশিয়ান সৈন্য প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইল। জর্ম্মান জেনারেল হিণ্ডেনবুর্গ

এবং লুডেনডর্ফ তিন সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ান বাহিনী পর্য্যুদস্ত করিলেন। রাশিয়ার অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল, ৮০ হাজার বন্দী হইল। টেনেনবার্গের যুদ্ধে জার্ম্মেনী জয়যুক্ত হইল।

অষ্ট্রিয়ার দুর্ব্বলতা

যুদ্ধে জার্ম্মেনী যেমন শক্তির পরিচয় দিল, অষ্ট্রিয়ার দুর্ব্বলতাও তেমনি ধরা পড়িল। জার্ম্মেনী যখন পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় রাশিয়ান সৈন্য ঠেঙ্গাইতেছে, অষ্ট্রিয়া তখন পোলাণ্ড হইতে রাশিয়ান সৈন্যের ঠেঙ্গানি খাইয়া দেশের দিকে ছুটিতেছে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল।

অষ্ট্রিয়াকে বাঁচাইবার জন্য হিণ্ডেনবুর্গ উত্তর দিক দিয়া পোলাণ্ডে ঢুকিলেন। রাশিয়ার প্রধান বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র লোঝ দখল করিতে পারিলেন কিন্তু ওয়ারশ অধিকৃত হইল না। শীত পড়িলে হিণ্ডেনবুর্গ ওয়ারশ দখলের আশা ছাড়িয়া দিলেন।

অষ্ট্রিয়া সার্ব্বিয়ার কাছেও পরাজিত হইল। ডিসেম্বরের মধ্যেই অষ্ট্রিয়ান সৈন্য সার্ব্বিয়া হইতে বিতাড়িত হইল।

নৌযুদ্ধে অষ্ট্রিয়া জার্ম্মেনীকে কোন সাহায্য করিতে পারিল না। জার্ম্মেনীর নৌবহর সংগঠন সম্পূর্ণ হইবার আগেই যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। বৃটিশ নৌবহরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না। জার্ম্মেনী তার সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ডাকিয়া আনিয়া দেশ রক্ষায় নিযুক্ত করিল। ইংলণ্ডের নৌবহরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিল তার সাবমেরিণ বাহিনী এবং মাইন। বৃটিশ নৌবহর জর্ম্মান নৌবহরকে ঘেরাও করিয়া রাখিল। ভূমধ্যসাগর পাহারায় রহিল ফরাসী নৌবহর। জার্ম্মেনীর দুইটি ক্রুজার এমডেন ও কার্লস্‌রু বৃটিশ ব্লকেড এড়াইয়া পলায়ন করিল এবং ১৪টি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দিল। এমডেন এবং কার্লস্‌রু অনেক ক্ষতি করিবার পর ধরা পড়িল। ডিসেম্বরের মধ্যে জর্ম্মান নৌবহর নির্ব্বীর্য্য হইয়া আটকাইয়া রহিল। জর্ম্মান কলোনি এবং বাণিজ্য হাতছাড়া হইয়া গেল। সমুদ্রে বৃটিশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা

২৩শে আগষ্ট জাপান জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। চীনের জর্মান বন্দর কিয়াওচু, শানটুং এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জর্মান অধিকৃত দ্বীপগুলি জাপান দখল করিয়া লইল।

তুরস্কের যুদ্ধ ঘোষণা

নবেম্বর মাসে তুরস্ক জার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে নামিল। তুরস্ক যুদ্ধে নামার ফলে বলকানের পরিস্থিতি বদলাইয়া গেল। কেন্দ্রীয় ইউরোপ হইতে এশিয়া মাইনর এবং মেসোপটোমিয়া পর্য্যন্ত জর্মান ক্ষমতা বিস্তৃত হইল। রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। মিশর এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইল। তুরস্কের যুদ্ধে অবতরণ মিত্রশক্তি উপেক্ষা করিল না।

রাশিয়ার পরাজয়

১৯১৫ সালে বেলজিয়ামে উভয় পক্ষ প্রায় সমান সমান রহিল। পূর্ব্ব প্রান্তে রাশিয়া প্রচণ্ডভাবে হারিয়া গেল। হিণ্ডেনবুর্গ ওয়ারশ, ব্রেষ্টলিভট্‌স্ক, গ্রোড্‌নো এবং ভিলনা অধিকার করিলেন। পেট্রোগ্রাডের নিকটে রিগা পর্য্যন্ত হিণ্ডেনবুর্গের বাহিনী পৌছিয়া গেল। জেনারেল ম্যাকেনসেন জর্মান এবং অষ্ট্রিয়ান সৈন্য নিয়া দক্ষিণ দিক হইতে রাশিয়াকে আঘাত করিলেন। রাশিয়ানরা গ্যালিসিয়া এবং পোলাণ্ড ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। রুশ বাহিনী পর্য্যুদস্ত এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রাশিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ তার অস্ত্রের অভাব। লোকের অভাব রাশিয়ার ছিল না। দেড়কোটি সৈন্যের বাহিনী সে গড়িয়া তুলিতে পারিত, পাইল না শুধু অস্ত্র। পলায়নের সময় রাশিয়ান সৈন্যকে অনেক সময় লাঠি দিয়া লড়িতে হইয়াছে।

রাশিয়ায় বৃটিশ ও ফরাসী সাহায্য

রাশিয়ার এই দুরবস্থা দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহার সাহায্যে আসিল। সাহায্য দেওয়ার একমাত্র রাস্তা দার্দানেলিস। তুরস্ক দার্দানেলিস আটকাইয়া

বসিয়া আছে। দার্দানেলিস আক্রমণ কঠিন, কিন্তু করিতে পারিলে অনেক সুবিধা। তুরস্ক রাশিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিয়া হইতে তাহার সৈন্য সরাইয়া আনিতে বাধ্য হইবে; রাশিয়াকে ক্রিমিয়ার ভিতর দিয়া অস্ত্র সরবরাহ করা যাইবে এবং রাশিয়া হইতে ইংলণ্ডের জন্য গম আনা যাইবে; বার্লিন এবং কনষ্টান্টিনোপলের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করা যাইবে। ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ এবং ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ দার্দানেলিসের মুখে আক্রমণ চালাইল কিন্তু বেশীদূর ঢুকিতে পারিল না। প্রণালীর ভিতর তুরস্ক মাইন পাতিয়া রাখিয়াছিল। গ্যালিপলি উপদ্বীপ হইতে তুর্কীরা গুপ্ত কামানের গোলা চালাইল। দুইটি বৃটিশ এবং একটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়া গেল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন বিপরীত দিকে ঈজিয়ান উপসাগর তীরে সৈন্য নামাইল, সেখান হইতে স্থলপথে তাহাদের গ্যালিপলি আসিবার কথা। বৃটিশ, ফরাসী, ভারতীয়, অষ্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিলাণ্ডীয় সৈন্য এই যুদ্ধে নামিল কিন্তু তুর্কী দুর্গ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না। গ্যালিপলি অভিযান ব্যর্থ হইল, মিত্র শক্তি হটিয়া আসিল। এই পরাজয়ে বলকানে এবং মেসোপটেমিয়ায় মিত্র শক্তির খুব ক্ষতি হইল। রাশিয়াকেও সাহায্য করা গেল না।

বুলগেরিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

অক্টোবর মাসে বুলগেরিয়া জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে নামিল ম্যাকেনসেন জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান সৈন্য নিয়া উত্তর দিক হইতে সার্বিয়া আক্রমণ করিলেন, বুলগেরিয়া আক্রমণ চালাইল পূর্ব্বদিক হইতে। এইবার সার্বিয়া পরাজিত এবং অধিকৃত হইল। মন্টেনিগ্রোও অধিকৃত হইল। ১৯১৫ সালের শেষে জার্ম্মেনী তুরস্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে পারিল। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধেও ইংলণ্ড সুবিধা করিতে পারিল না। জেনারেল টাউনশেণ্ড কুত-এল-আমারা অধিকার করিয়া ৬৬০ মাইল ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন; কিন্তু আবার হটিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কুত-এল-আমারা আবার ফেরৎ দিতে হইল। সারা বছর ধরিয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্ম্মেনী প্রচণ্ডভাবে

সাবমেরিণ যুদ্ধ চালাইল। জাহাজ দেখিবামাত্র টর্পেডো চলিল। প্রথম ছয় মাসে প্রায় দুইশত বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়া গেল। বৃটিশ বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ৭ই মে বৃটিশ জাহাজ লুসিটানিয়া আইরিশ উপকূলে ডুবিয়া গেল। প্রায় এক হাজার যাত্রী প্রাণ হারাইল। এই জাহাজ ডুবিতে কয়েকজন আমেরিকান যাত্রীও নিহত হইল। আমেরিকাও জার্ম্মেনীর উপর চটিল।

ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা

মে মাসে ইতালি মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে নামিল। জার্ম্মেনীর পক্ষে বুলগেরিয়ার পর আর কেহ যোগ দিল না। মিত্রশক্তির পক্ষে একের পর এক রাজ্য ইতালির পর আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। মিত্রশক্তির পক্ষে মোট রাজ্য-সংখ্যা হইল ২৮।

ভার্দ্দুনের যুদ্ধ

১৯১৬ সালের গোড়ায় বোঝা গেল যুদ্ধ সহজে থামিবে না। ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি এবং রাশিয়া এক সঙ্গে জার্ম্মেনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় জার্ম্মেনী নিজেই আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রথমেই আক্রমণ করিল ফ্রান্সের ভার্দ্দুন। ১২ ঘণ্টায় ১০ লক্ষ গোলা ভার্দ্দুনের উপর ছাড়িল। পাঁচদিনে জর্ম্মান সৈন্য ভার্দ্দুনের চার মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। জোফ্রে এবং পেতাঁ ভার্দ্দুন রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সাত মাস তাঁহারা জর্ম্মান সৈন্যকে ভার্দ্দুনের দরজায় ঠেকাইয়া রাখিলেন। অক্টোবরে ফরাসী সৈন্য পাল্টা আক্রমণ সুরু করিল। জার্ম্মেনী ভার্দ্দুন দখল করিতে পারিল না। সোম নদীতীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিল। কাইজার পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে হিণ্ডেনবুর্গ এবং লুডেনডর্ফকে ফরাসী সীমান্তে ডাকিয়া আনিলেন। লুডেনডর্ফ বলিলেন—"যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে, আমাদের বিপদ ততই বাড়িবে, শত্রুর সৈন্যসংখ্যা এবং সম্পদ দুই-ই অনেক বেশী। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য।"

অষ্ট্রিয়ার ইতালি আক্রমণ

মে মাসে অষ্ট্রিয়া ইতালি আক্রমণ করিল কিন্তু জয়লাভ করিতে না পারিয়া হটিয়া আসিল। রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত আবার আক্রমণ করাতে ইতালির সুবিধা হইল।

রাশিয়া ১৯১৫ সালের ধাক্কা অনেকটা সামলাইয়া লইল। ইংলণ্ড তাহাকে অনেক অস্ত্র পৌছিয়া দিল। আমেরিকা অনেক রাইফেল পাঠাইল। দেশে অস্ত্র উৎপাদন অনেক বাড়িল। রাশিয়ান আক্রমণে অষ্ট্রিয়ানরা হটিতে লাগিল। হিণ্ডেনবুর্গকে অষ্ট্রিয়ানদের সাহায্যে আসিতে হইল। তিনি সৈন্য পরিচালনভার গ্রহণ করিলে রাশিয়ার অগ্রগতি বন্ধ হইল।

পর্টুগালের যুদ্ধ ঘোষণা

মার্চ্চ মাসে পর্টুগাল মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে নামিল।

আগষ্ট মাসে রুমানিয়া যুদ্ধে নামিয়া অষ্ট্রিয়ার ট্রানসিলভানিয়া প্রদেশে ঢুকিয়া পড়িল। ম্যকেনসেন বুলগেরিয়া হইতে আক্রমণ চালাইয়া রুমানিয়ায় প্রবেশ করিলেন। চার মাসে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট অধিকৃত হইল, রুমানিয়ার অবস্থা সার্ব্বিয়ার মত দাঁড়াইল। জার্ম্মেনীর হাতে পড়িবার আশঙ্কায় রুমানিয়া তার তেলের খনিগুলি নষ্ট করিয়া দিল।

সাবমেরিণ যুদ্ধ

সারা বছর ধরিয়া সাবমেরিণ যুদ্ধ চলিল। তবে গতবারের চেয়ে এই বৎসর ইংলণ্ড অনেকটা সামলাইয়া নিতে পারিল। রাশিয়ায় এবং ইতালিতে অস্ত্র পৌছানো, ফ্রান্সে সৈন্য নামানো, বাণিজ্য চালানো প্রভৃতি কাজ বৃটিশ নৌবহর পূর্ণোদ্যমে করিতে আরম্ভ করিল। জর্ম্মান নৌবহরের কতকগুলি জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে উপস্থিত হইল। উদ্দেশ্য, বৃটিশ নৌবহর আক্রমণ করিয়া উহাকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া। জুটল্যাণ্ডে প্রচণ্ড নৌযুদ্ধ হইল। ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম নৌযুদ্ধ। উভয় পক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইল। জর্ম্মান নৌবহর আর বাহির হইল না।

জার্ম্মেনীর সন্ধির প্রস্তাব

১৯১৬ সালের শেষে জার্ম্মেনী জয়ের আশা ছাড়িয়া দিল। রাইখষ্টাগে বক্তৃতা করিয়া জর্ম্মান চ্যান্সেলার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মিত্রশক্তি সঙ্গে সঙ্গে উহা প্রত্যাখ্যান করিল। আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট উইলসন সালিশীর চেষ্টা করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না।

বেপরোয়া সাবমেরিণ যুদ্ধ

১৯১৭ সালে জার্ম্মেনী শেষ চেষ্টা সুরু করিল। ১৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে সৈন্যদলে টানিয়া নিল। কাইজার আদেশ দিলেন জর্ম্মান সাবমেরিণ এবার হইতে কাহাকেও সতর্ক না করিয়া জাহাজ দেখিবামাত্র টর্পেডো ছুঁড়িবে। জর্ম্মান জেনারেলরা কাইজারকে আশ্বাস দিলেন—এবার ছয় মাসে যুদ্ধ জয় নিশ্চিত। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বেপরোয়া টর্পেডো আক্রমণ সুরু হইল। ১৫ দিনে একশত জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিল। যুধ্যমান এবং নিরপেক্ষ দেশের জাহাজের মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না।

আমেরিকান প্রাণহানি

একমাত্র নিরপেক্ষ বৃহৎ দেশ আমেরিকা এবার ক্ষেপিল। আমেরিকা ১৯১৫ সালেই জার্ম্মেনীকে সতর্ক করিয়াছিল যে তার কোন জাহাজ যেন না ডোবে এবং কোন আমেরিকান যেন প্রাণ না হারায়। লুসিটানিয়া ডুবিয়া আমেরিকান যাত্রীর মৃত্যু আমেরিকা সহ্য করিয়া গিয়াছিল। ১৯১৬ সালে ইংলিশ চ্যানেলে সতর্ক না করিয়াই জর্ম্মান সাবমেরিণ একটি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইল। উহাতে ৭৫ জন আমেরিকান প্রাণ হারাইল। আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিধান এই যে কোন জাহাজে টর্পেডো মারিতে হইলে আগে তাহাকে সতর্ক করিতে হইবে এবং নাবিক ও যাত্রীদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জার্ম্মেনী কোনটাই করে নাই। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ইংলিশ চ্যানেলে জাহাজ ডুবির প্রতিবাদ করিলেন। ১৯১৭ সালে বেপরোয়া সাবমেরিণ যুদ্ধের ঘোষণা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট অসহ্য হইল।

আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা

৬ই এপ্রিল ১৯১৭ আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশ মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। চীন, গ্রীস এবং শ্যামও যুদ্ধে নামিল। সমগ্র পৃথিবী যেন জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেল।

ব্রেষ্ট-লিটভ্‌স্ক সন্ধি

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে নিহত হইলেন। রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন লেনিন এবং ট্রটস্কী। ১৫ই ডিসেম্বর ব্রেষ্ট-লিটভ্‌স্ক সহরে জার্ম্মেনী এবং বলশেভিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ট্রটস্কী সর্ত্ত দিলেন— কেহ কাহারও জমি অধিকার করিবে না, কেহ কাহারও নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিবে না। জার্ম্মেনী এই সর্ত্ত মানিতে অস্বীকার করিয়া আবার যুদ্ধ সুরু করিল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বিনাসর্ত্তে জার্ম্মেনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। নেতারা বলিলেন,—এমন কোন সোসালিষ্ট নাই যে সমাজ বিপ্লব জয়যুক্ত করিতে নিজের পিতৃভূমি পরের হাতে তুলিয়া দিতে আপত্তি করিবে। ব্রেষ্ট-লিটভ্‌স্কের সন্ধি ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে স্বাক্ষরিত হইল। উহাতে জার্ম্মেনী এই সব সর্ত্ত মানিল—

(১) এস্থোনিয়া, লিভোনিয়া, কুরলাণ্ড, লিথুনিয়া এবং পোলাণ্ডের উপর রাশিয়ার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, উহাদের ভাগ্য জার্ম্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া নির্দ্ধারণ করিবে,

(২) রাশিয়ার বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ইউক্রেণ স্বাধীন রিপাবলিক হইবে,

(৩) ককেসাসে বাটুম, আরদাহান, এবং কার্স স্বায়ত্বশাসন পাইবে তবে তুরস্কের সঙ্গে এ বিষয়ে মতৈক্য হইতে হইবে,

(৪) ফিনল্যাণ্ড এবং জর্জ্জিয়া স্বাধীন রাজ্য হইবে,

(৫) রাশিয়া জার্ম্মেনীকে মোটা ক্ষতিপূরণ দিবে।

এই সন্ধিতে রাশিয়া ৫ লক্ষ বর্গমাইল জমি এবং ৬ কোটি ৬০ লক্ষ লোক হারাইল। রাশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৩৪, কৃষিজমির শতকরা ৩২, বীট চিনির জমির শতকরা ৮৫, কলকারখানার শতকরা ৫৪ এবং কয়লাখনির শতকরা ৮৯ ভাগ দেশের বাহিরে চলিয়া গেল।

ব্রেষ্ট-লিটভ্স্ক সন্ধি রাশিয়ার পক্ষে পরম অপমানজনক এবং ক্ষতিকর হইলেও ইহাতে তাহার লাভই হইল। যুদ্ধজয়ের কোন সম্ভাবনা যেখানে ছিল না সেখানে এই সন্ধিতে যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বলশেভিক নেতারা বিপ্লব আন্দোলন সফল করিতে মনোনিবেশ করিলেন। জার্ম্মেনীর ইহাতে জয় হইল বটে তবে লাভ বেশী হইল না। ক্ষতিপূরণ বাবদ যে সব আর্থিক সম্পদ তার পাওয়ার কথা রাশিয়া তাহা দিতে পারিল না। যাহা দিল তাহা হইল রাশিয়ান চর মারফৎ জার্ম্মেনীতে কমুনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডা। ইহাতে দেশের মধ্যে জার্ম্মেনীতে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হইল এবং ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে বিপ্লব ঘটিয়া গেল।

মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ

আমেরিকার মনে জার্ম্মেনী সম্বন্ধে যেটুকু নরম ভাব ছিল ব্রেষ্ট-লিটভ্স্কের সন্ধিতে তাহা কাটিয়া গেল। জয়যুক্ত হইলে জার্ম্মেনী কত হৃদয়হীন হইতে পারে এই সন্ধি তার নিদর্শন। সন্ধির কথা আর কেহ মুখে আনিল না। জার্ম্মেনীর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলিল। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধেও ইংলণ্ড এবার জয়যুক্ত হইল। কুত-এল-অ'ম্মারা পুনরায় অধিকৃত হইল। আমেরিকান নৌবহর আসিবার পর যুদ্ধে মিত্রশক্তির জাহাজ ডুবি কমিয়া গেল।

১৯১৭ সালের শেষে দেখা গেল জার্ম্মেনী হাঁপাইতেছে, অষ্ট্রিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তুর্কী পদে পদে পরাজিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মেনী তবু লড়িয়া যাইতেছে।

লুডেনডর্ফের ব্যর্থ আক্রমণ

১৯১৮ সালের মার্চ্চে রাশিয়া ব্রেষ্ট-লিটভ্স্কের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া সরিয়া যাওয়ার পর মে মাসে রুমানিয়া বুখারেষ্টে জার্ম্মেনীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া যুদ্ধ বন্ধ

করিল। লুডেনডর্ফ পূর্ব্বপ্রান্তের সমস্ত সৈন্য নিয়া পশ্চিম সীমান্তে ফেলিলেন। মার্শাল ফোশের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসী মিলিত বাহিনী জর্ম্মান সৈন্যকে বাধা দিল। লুডেনডর্ফ চারিবার আক্রমণ করিলেন, চারিবারই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লুডেনডর্ফের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সৈন্যদের হটাইয়া দেওয়া এবং বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী আলাদা করিয়া ফেলা। এই উদ্দেশ্য সফল হইল না।

ফ্রান্সের পাল্টা আক্রমণ

জুলাই মাসে ফোশ প্রচণ্ডবিক্রমে পাল্টা আক্রমণ সুরু করিলেন। সেপ্টেম্বরে তিনি হিণ্ডেনবুর্গ লাইন ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলেন। আমেরিকার জেনারেল পার্সিং ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন। এইবার জার্ম্মেনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। অক্টোবরের মধ্যে জর্ম্মান সৈন্য ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের পরাজয়ের সংবাদ আসিতে লাগিল।

বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং অষ্ট্রিয়ার আত্মসমর্পণ

সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করিল। ৩১শে অক্টোবর তুর্কী আত্মসমর্পণ করিল। ৪ঠা নবেম্বর অষ্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করিল। বাকী রহিল জার্ম্মেনী।

যুদ্ধ বিরতি

জার্ম্মেনীর নৌবহরে বিদ্রোহ দেখা দিল। দেশের অভ্যন্তরে সোসালিষ্ট বিপ্লব সুরু হইয়া গেল। ৯ই নবেম্বর কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। ১১ই নবেম্বর জার্ম্মেনী বেলা ১১টার সময় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। যুদ্ধ বন্ধ হইল।

শান্তি সম্মেলন ও ভার্সাই সন্ধি

জার্ম্মেনীর যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত হইল এইরূপ—

(১) বেলজিয়াম, আলসাস-লোরেণ, লুক্সেমবার্গ হইতে সৈন্য সরাইতে হইবে,

(২) মিত্রশক্তি যে সমস্ত সমরসম্ভার এবং সাবমেরিণ দিতে বলিবে তাহা দিতে হইবে,

(৩) জর্ম্মান যুদ্ধ জাহাজ অন্তরীণ থাকিবে,

(৪) রাইন নদীর বাম তীরে এবং কতকগুলি দুর্গে মিত্রশক্তির সৈন্য থাকিবে,

(৫) বহু সংখ্যক রেলওয়ে ইঞ্জিন ও মোটর লরী দিতে হইবে,

(৬) যুদ্ধে বন্দী সৈন্যদের ফেরৎ দিতে হইবে।

প্যারিসে শান্তিবৈঠক বসিল। ৩২টি দেশ বৈঠকে যোগ দিল। রাশিয়াকে এবং শত্রুপক্ষের দেশগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। আমেরিকা, ইংলণ্ড ফ্রান্স, ইতালি এবং জাপানের প্রতিনিধি নিয়া সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি স্থপ্রীম কাউন্সিল গঠিত হইল। আসলে কিন্তু সম্মেলনের নেতৃত্ব গেল চারি প্রধানের (Big Four) হাতে—ফ্রান্সের ক্লেমাঁসো, আমেরিকার উইলসন, ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ্জ বং ইতালির সিগনর অরলাণ্ডো। মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো শান্তি সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

উইলসনের ১৪ দফা

উইলসন শান্তির জন্য চৌদ্দটি প্রস্তাব করিলেন। ইহাই প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা (Fourteen Points)। উহার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

(১) জার্ম্মেনীকে সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হইতে সৈন্য সরাইতে হইবে,

(২) আলসাস-লোরেণ ফ্রান্সকে ফেরৎ দিতে হইবে,

(৩) পোলাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে,

(৪) জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বলকান, ইতালি এবং অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর পুনর্গঠন করিতে হইবে,

(৫) নিরপেক্ষতার সঙ্গে উপনিবেশের-প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে,

(৬) গুপ্ত কূটনীতি পরিহার করিতে হইবে,

(৭) বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বাধা তুলিয়া দিতে হইবে,

(৮) সমুদ্রে সকলের জাহাজ অবাধে চলাচলের স্বাধীনতা দিতে হইবে,

(৯) অস্ত্রশস্ত্র কমাইতে হইবে,

(১০) লীগ অফ নেশন্‌স প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

লয়েড জর্জ্জ, ক্লেমাঁসো এবং অরলাণ্ডো ছিলেন বাস্তববাদী। আদর্শবাদী উইলসন তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। সম্মেলনে বড় বড় আদর্শের কথা হইল কিন্তু উপরোক্ত তিনজন পরাজিত দেশগুলির নিকট হইতে ভূমি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঐ সঙ্গে তাঁহারা এমন ব্যবস্থাও করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে পরাজিত দেশগুলি আর যুদ্ধ করিতে না পারে।

শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পাঁচটি সন্ধিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইল—

(১) জার্মেনীর সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি,

(২) অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মেন সন্ধি,

(৩) হাঙ্গেরীর সঙ্গে ত্রিয়ানন সন্ধি,

(৪) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নুইলি সন্ধি,

(৫) তুরস্কের সঙ্গে সেভার্স সন্ধি।

ভূমি হস্তান্তর

পরাজিত দেশগুলির ভূমি হস্তান্তর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইল—

(১) জার্মেনী এই সব জায়গা ছাড়িবে—

(ক) ফ্রান্সকে দিবে আলসাস-লোরেণ,

(খ) বেলজিয়ামকে দিবে মোরেসনে, অয়পেন এবং মালমেদি এই তিনটি ছোট প্রুশিয়ান জেলা,

(গ) মিত্রশক্তিকে দিবে বালটিকের মেমেল বন্দর,

(ঘ) পোলাণ্ডকে পোসেনের অধিকাংশ এবং পশ্চিম প্রুশিয়া, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের গণভোট নিয়া আপার সাইলেসিয়া এবং পূর্ব্ব প্রুশিয়া,

(ঙ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নিউজীলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বেলজিয়ামকে সমস্ত উপনিবেশ,

(চ) চীন, শ্যাম, সাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর এবং তুরস্কে সমস্ত বিশেষ অধিকার,

(ছ) জর্ম্মান জেলা সার উপত্যকা ১৫ বছরের জন্য আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের নামে ফরাসী শাসনে থাকিবে, ফ্রান্স উহার কয়লা খনির সুবিধা ভোগ করিবে, ১৫ বছর বাদে গণভোটে সার জেলা কোথায় যাইবে ঠিক হইবে,

(জ) ডানজিগ পোলাণ্ডে থাকিবে কিন্তু ফ্রী পোর্ট হইবে,

(২) অষ্ট্রিয়া এই সব জায়গা ছাড়িবে—

(ক) ইতালিকে দিবে দক্ষিণ টাইরোল, ত্রিস্ত এবং ইস্ত্রিয়া, চেরশো এবং লুসিন দ্বীপপুঞ্জ,

(খ) যুগোশ্লোভিয়াকে দিবে বসনিয়া, হারজেগোভিনা, ডালমেসিয়ান উপকূল এবং দ্বীপপুঞ্জ,

(গ) চেকোশ্লোভাকিয়াকে দিবে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, অধিকাংশ অষ্ট্রিয়ান সাইলেসিয়া,

(ঘ) পোলাণ্ডকে দিবে গ্যালিসিয়া,

(ঙ) রুমানিয়াকে দিবে বুকোভিনা।

অষ্ট্রিয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। বিশাল অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে অষ্ট্রিয়ায় রহিল মাত্র ৬০ লক্ষ। ইহারা জর্ম্মান। ফ্রান্সের ভয়ানক ভয় পাছে জাতীয়তাবাদের দাবীতে এই ৬০ লক্ষ জর্ম্মান—উত্তরের জর্ম্মান রিপাবলিকের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। এই জন্য ব্যবস্থা হইল অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা লীগ অফ.নেশনস রক্ষা করিবে। অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেনী মিলিত হইতে হইলে লীগ অফ নেশনসের সমস্ত সদস্যের সম্মতি লাগিবে।

(৩) হাঙ্গেরীকে অষ্ট্রিয়া হইতে পৃথক করা হইল। হাঙ্গেরীকে এই সব জায়গা ছাড়িতে হইল—

(ক) রুমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া,

(খ) যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোটিয়া,

(গ) চেকোশ্লোভাকিয়াকে হাঙ্গেরীর শ্লোভাক প্রদেশ সমূহ।

হাঙ্গেরীর লোকসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ হইতে কমিয়া ৮০ লক্ষ হইল।

(৪) বুলগেরিয়াকে এই সব জায়গা ছাড়িতে হইল—

(ক) গ্রীসকে সমস্ত ঈজিয়ান উপকূল,

(খ) যুগোশ্লাভিয়াকে কতকগুলি ছোট জায়গা।

(৫) তুরস্ককে এই সব জায়গা ছাড়িতে হইল—

(ক) সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়া, এবং মিশরের উপর প্রভূত্ব।

সেভার্স সন্ধিপত্র তুরস্কের উপর প্রয়োগ করা হয় নাই, ইহা লজান সন্ধির সর্ত্ত। সেভার্স সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইলে তুরস্ককে আর্ম্মেনিয়া, স্মার্ণা এবং কুর্দ্দিস্থান ছাড়িতে হইত।

কনষ্টান্টিনোপল তুরস্কেরই রহিল কারণ উহার উপর যার নজর সবচেয়ে বেশী সেই রাশিয়া ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং আর কেহ উহা নিতে রাজি হয় নাই।

সামরিক ও অর্থনৈতিক সর্ত্ত

ভার্সাই সন্ধির সামরিক এবং অর্থনৈতিক সর্ত্ত এইরূপ—

(১) জর্ম্মান সৈন্যবাহিনীতে মোট ১ লক্ষ অফিসার ও সৈন্যের বেশী থাকিবে না,

(২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি থাকিবে না,

(৩) রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে ৩০ মাইল চওড়া জায়গায় কোন সামরিক ঘাঁটি থাকিবে না,

(৪) কামান এবং যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা এবং আকার অনেক কম হইবে,

(৫) হেলিগেল্যাণ্ডের দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে,

(৬) জর্ম্মান নৌবহর ইংলণ্ডকে দিতে হইবে,

(৭) জার্ম্মেনীর বাণিজ্য জাহাজের অধিকাংশ ছাড়িতে হইবে,

(৮) ফ্রান্স, ইতালি ও বেলজিয়ামকে প্রচুর কয়লা দিতে হইবে,

(৯) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের পরিবারবর্গের পেন্সনের টাকা দিতে হইবে,

(১০) সন্ধি সর্ত্ত প্রতিপালনের গ্যারাণ্টিস্বরূপ মিত্রশক্তি রাইন নদীর বাম তীর ১৫ বছরের জন্য দখলে রাখিবে,

(১১) অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে ৩০ হাজারের বেশী লোক থাকিবে না,

(১২) অষ্ট্রিয়াতেও বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি বন্ধ হইবে,

(১৩) সমর সম্ভার নির্ম্মাণ কমাইতে হইবে,

(১৪) হাঙ্গেরীর ৩৫ হাজারের বেশী সৈন্য থাকিবে না,

(১৫) বুলগেরিয়ার ২০ হাজারের বেশী সৈন্য থাকিবে না,

(১৬) বুলগেরিয়াকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ভার্সাই সন্ধির রাজনৈতিক সর্ত্তের মধ্যে প্রধান—বেলজিয়াম, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতি। কাইজার এবং অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের মিত্রশক্তির হাতে সমর্পণের একটি ধারা ভার্সাই সন্ধিতে ছিল তবে উহার উপর জোর দেওয়া হয় নাই।

ভার্সাই সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য সর্ত্ত—লীগ অফ নেশনস গঠন।

ভার্সাই সন্ধি সমানে সমানে সন্ধি নয়, উহা পরাজিতদের প্রতি মিত্রশক্তির আদেশ।

জার্ম্মেনীর যে প্রতিনিধি প্যারিসে সন্ধিপত্র আনিতে গিয়াছিলেন তিনি তখনই বলিয়াছিলেন—আমাদের প্রতি যে ঘৃণা এখানে দেখানো হইল তাহার তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি

নবম পরিচ্ছেদ

ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার

কেটেলবি লিখিয়াছেন,—উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান বিশেষত্ব পৃথিবীর ইউরোপীয়ানাইজেসন। শিল্পবিপ্লবের পর বৃহৎ কলকারখানায় উৎপাদন দ্রুত বাড়িতে লাগিল। শিল্পবিপ্লব সুরু হইল ইংলণ্ডে, উহার সুযোগ গ্রহণ করিল ইউরোপ। কাঁচা মালের চাহিদা যত বাড়িতে লাগিল, শিল্পজীবী দেশগুলির দৃষ্টি ততই ইউরোপের বাহিরে কাঁচামালের ক্ষেত্রের দিকে পড়িতে লাগিল। তুলা, রবার, তেল, খনিজ দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাহিরে উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজনও দেখা দিল। কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলাস্কা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় সোণার খনি আবিষ্কারের সংবাদে বিদেশ যাত্রা এবং উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ইউরোপীয় মিশনারীরা আফ্রিকা এবং এশিয়ার দুর্গমস্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারে খৃষ্টান মিশনারীদের দান সামান্য নহে। যানবাহন এবং সংবাদ আদানপ্রদানের উন্নতি সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়ক হইল। শিল্পজীবী শক্তিরা অল্পদিনেই বুঝিল কাঁচামালের সরবরাহ অবাধ এবং সস্তা রাখিতে হইলে কাঁচামালের উৎপাদনক্ষেত্র নিজের হাতে থাকা দরকার। উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবেও এই সব স্থানের সুবিধা উপলব্ধি করিতে দেরী হইল না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল এবং নেদারল্যাণ্ড বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল। সাম্রাজ্য গঠন ইচ্ছায় ইহাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতাও যথেষ্ট হইল।

সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন

ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ১৮২৫ সালে ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল এবং নেদারল্যাণ্ডের সামাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল। অক্ষত রহিল শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য গঠন চেষ্টাকে তিন পর্য্যায়ে ভাগ

করা যায়—প্রথম ১৮২৫ সাল পর্যন্ত; দ্বিতীয় ১৮২৫ হইতে ১৮৭৮ এবং তৃতীয় ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪।

ফরাসী সাম্রাজ্য

সপ্তবর্ষ যুদ্ধে কানাডা ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইল। ভারতবর্ষ দখলের জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স পরাজিত হইল। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর ফ্রান্সের হাতে রহিল শুধু কয়েকটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার ছোট কয়েকটি জায়গা এবং ভারতবর্ষে চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে।

ডাচ সাম্রাজ্য

নেদারল্যাণ্ডের ডাচেরা বিশ্বময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, বহু দেশ আবিষ্কার করিয়াছে, বহু দেশ অধিকার করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড তাহারাই আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু দখল করিতে পারে নাই। উত্তর আমেরিকায় নিউ আমষ্টার্ডাম ডাচেরা অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ড তাহা কাড়িয়া নেয়। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর ইংলণ্ড নেদারল্যাণ্ডের হাত হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং গায়েনার কতকাংশ অধিকার করিয়া লয়। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর নেদারল্যাণ্ডের ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দুই একটি দ্বীপ ছাড়া আর কিছু রহিল না।

ফরাসী এবং ডাচ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল বাহিরের আঘাতে। স্পেনীয় এবং পর্টুগীজ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল অন্তর্বিপ্লবে।

স্পেনের সাম্রাজ্য

উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় আমেরিকাতেই স্পেন বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রায় তিনশত বৎসর এই সাম্রাজ্য স্পেনের হাতে ছিল। স্পেনের আমেরিকান সাম্রাজ্যই সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় ছিল। ১৮০১ সালে স্পেন নেপোলিয়ানকে আমেরিকার লুইজিয়ানা বেচিয়া দিল। দুই বৎসর বাদে নেপোলিয়ান উহা যুক্তরাষ্ট্রকে বিক্রয় করিলেন। ১৮১৯ সালে স্পেন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্লোরিডা বিক্রয় করিয়া দিল। বিপ্লবী নেতা সাইমন বলিভারের

নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার অর্দ্ধেকের বেশী ছিল স্পেনের অধিকারে। বিদ্রোহের ফলে এই সাম্রাজ্য স্পেনের হাতছাড়া হইয়া গেল। সাইমন বলিভারের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংলণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করিল। ১৮২৫ সালে স্পেনের হাতে রহিল শুধু কানারিজ, কিউবা, পোর্টোরিকো এবং ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ।

পর্টুগীজ সাম্রাজ্য

পর্টুগালের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ছিল ব্রেজিল। ১৮২২ সালে ব্রেজিল স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৮২৫ সালে পর্টুগীজ সাম্রাজ্যের মধ্যে অবশিষ্ট রহিল আফ্রিকার উপকূলে দুই একটি ছোট জায়গা এবং ভারতবর্ষে দিউ, দমন, গোয়া।

বৃটিশ সাম্রাজ্য

আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশে বিদ্রোহ এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিতে গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিল। ফরাসী রাজনীতিবিদ তুর্গো বলিতেন,—সাম্রাজ্য হইতেছে গাছের ফল, যতক্ষণ কাঁচা আছে ততক্ষণ বোঁটায় ঝুলিবে, পাকিলেই নীচে পড়িয়া যাইবে। আমেরিকান বিদ্রোহে প্রমাণিত হইল যে উপনিবেশে এমন এক সময় আসিবে যখন সেখানকার লোকেরাও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের আইন মানিতে চাহিবে না। অবশ্য আমেরিকা হাতছাড়া হওয়ায় ইংলণ্ডের ক্ষতি হয় নাই। অধীন দেশকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়া তাহার পক্ষে অর্থ নৈতিক সুবিধাই হইয়াছে।

১৮২৫ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্য শুধু অক্ষত রহিল না উহার আয়তন অনেক বাড়িয়া গেল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান দেশ হইল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সিংহল।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড

ডাচ পর্য্যটনকারীরা সর্ব্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের সংবাদ ইউরোপকে দেয়। ক্যাপ্টেন কুক দ্বিতীয়বার এই দুই দেশ আবিষ্কার করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিনিই প্রথম ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করেন। ইংলণ্ড আগে আমেরিকায় কয়েদী পাঠাইত। এবার পাঠাইতে সুরু করিল অষ্ট্রেলিয়ায়। কিছু কিছু স্বাধীন লোকও অষ্ট্রেলিয়ায় আসিতে লাগিল। তাহারা কয়েদীদের সস্তা মজুরীতে খাটাইত। অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষিকার্য্য ব্যতীত আর কোন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেখা যায় নাই বলিয়া সুবিধা হইতেছিল না। নিউকাসেলে কয়লা পাওয়ার পর অর্থনৈতিক উন্নতির আশা দেখা দিল। মেরিণো ভেড়াপালন লাভজনক হওয়ায় এক বিরাট পশমের ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে স্বাধীন লোকের অষ্ট্রেলিয়ায় আগমন বাড়িতে লাগিল। অষ্ট্রেলিয়ায় একটা সুবিধা এই যে ইউরোপীয় অধিবাসীরা সকলেই একজাতি—ইংরেজ।

কানাডা

কানাডা সম্পদ হিসাবে বিরাট, কিন্তু উহাতে দুই অসুবিধা দেখা দিল। প্রথম, অধিবাসীদের একটা বড অংশ ফরাসী—জাতি, ধর্ম্ম এবং ভাষা সবই তাহাদের আলাদা। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট উভয়ই খৃষ্টান, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত রকম প্রভেদ যে ইহাদের আলাদা ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য করা হইত। সমস্ত কুইবেক প্রদেশের অধিবাসী ফরাসী। দ্বিতীয় অসুবিধা, পাশেই আমেরিকান রিপাবলিক, রাজনৈতিক ছোঁয়াচ লাগিবার আশঙ্কা। ফরাসীরা ইংলণ্ডের অধীনতা মানিয়া নিতে চাহে না। অসন্তোষ চলিতে লাগিল। ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল। ১৭৯১ সালে পিট গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন যে ফরাসী এলাকা নিম্ন কানাডা নামে এবং ইংরেজ এলাকা উপর কানাডা নামে অভিহিত হইবে, দুই জায়গাতেই পার্লামেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট থাকিবে, তবে উহাদের গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। আমেরিকা হইতে উপর কানাডায় লোক যাওয়ায় ইংরেজের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্টের দাবীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা দিল। কানাডার মূল সমস্যা দাঁড়াইল শাসনতান্ত্রিক।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে তখনও কোম্পানীর শাসন চলিতেছে। ১৭৭৩ সালের নর্থের রেগুলেটিং আইন এবং ১৭৮৪ সালের পিটের ভারতবর্ষ আইন পাশ হইয়া ভারত শাসনে কতকটা শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তখন সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। ওয়ারেন হেষ্টিংস অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিলেন। একদিকে ইংলণ্ড আমেরিকান কলোনিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, অপরদিকে ভারতবর্ষে ফরাসী, মারাঠা এবং হায়দর আলি টিপু সুলতানের সঙ্গে লড়াই—এই উভয় আঘাত হইতে হেষ্টিংস সাম্রাজ্য রক্ষা করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া সাম্রাজ্যের বনিয়াদ আরও শক্ত করিলেন। তিনি বেশী মন দিলেন শাসন সংস্কারে ও ভূমি সংস্কারে। লর্ড ওয়েলেসলি যখন আসিলেন তখন নেপোলিয়ন মিশরে পৌছিয়াছেন। ভিতরে ফরাসী, বাহিরে স্বয়ং নেপোলিয়ন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রীতিমত চিন্তিত হইল। ওয়েলেসলি মহীশূর ও মারাঠা কনফেডারেসি প্রায় চূর্ণ করিলেন। ফরাসী অভিযানের আশঙ্কা ওয়েলেসলির হাতেই শেষ হইল। মারাঠা শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল লর্ড হেষ্টিংস আসিয়া তাহাও মুছিয়া দিলেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের দুই দিকে সুবিধা হইল। তখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়া ভারতবর্ষে যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল। উহা ইংলণ্ডের হাতে পড়ায় সুবিধা হইল। দ্বিতীয়তঃ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘাঁটি করিয়া আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিল। সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ড আরও কতকগুলি জায়গা অধিকার করিল। স্পেনের নিকট হইতে নিল ত্রিনিদাদ, সেণ্ট জনের নাইটদের নিকট হইতে নিল মাল্টা, ফ্রান্সের নিকট হইতে নিল সিসকিলাস এবং মরিশাস। উত্তমাশা অন্তরীপ এবং সিংহলের জন্য ইংলণ্ড হলাণ্ডকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল।

ইংলণ্ডের এই বিরাট পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সংরক্ষণে সবচেয়ে সহায়ক হইল বৃটিশ নৌবহর। শক্তিশালী নৌবহর ভিন্ন বড় সাম্রাজ্য গড়াও যায় না, রাখাও যায় না। ইংলণ্ড ইহা প্রমাণ করিল।

সাম্রাজ্যগঠনের দ্বিতীয় পর্য্যায়

সাম্রাজ্যগঠনের দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৮২৫ হইতে ১৮৭৮। এই সময় ইউরোপের নেতৃত্ব করিয়াছেন মেটারনিক, কাভুর এবং বিসমার্ক। ইঁহারা খাস ইউরোপীয় সমস্যার বাহিরে তাকান নাই। ইংলণ্ড এই সুযোগে বাহিরে সাম্রাজ্য গুছাইয়া লইয়াছে।

কানাডার আয়তন ছিল সেণ্ট লরেন্স নদীর চারপাশে প্রশান্ত মহাসাগর পয্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কানাডার আয়তন বাড়িয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডার সীমানা বিরোধ মিটিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে বহু লোক গিয়া কানাডায় বসতি স্থাপন করায় উহার জনসংখ্যা অনেক বাড়িল। বৃটিশ কলম্বিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় কানাডার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইল। রেলপথ এবং রাজপথ নির্ম্মিত হইয়া যানবাহনের সুবিধা হইল।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভান ডীমেন ল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়াতে কয়েদী পাঠানো চলিতে লাগিল। ভান ডীমেন ল্যাণ্ডই বর্ত্তমান টাসমেনিয়া। অষ্ট্রেলিয়ায় সোনা এবং তামা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে বহু লোক আসিল। এই বিরাট মহাদেশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ উপকূলেও বসতি স্থাপিত হইল। সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ বৃটিশ অধিকারে আসিল।

অষ্ট্রেলিয়া অধিকারের পর নিউজিল্যাণ্ড দখলের জন্য এমিগ্রেণ্ট সোসাইটিরা গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিল। নিউজিল্যাণ্ডকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইচ্ছা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ছিল না। যখন দেখা গেল ফরাসীরা উহা অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে তখন ১৮৪০ সালে ইংলণ্ড নিউজিল্যাণ্ডকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিল। নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীরা ছিল মাওরী।

ইংলণ্ডের সঙ্গে তাহাদের চুক্তি হইল যে জমি, জঙ্গল এবং মাছ ধরার অধিকার অব্যাহত থাকিবে। নিউজিল্যাণ্ডের সোনার খনি এবং পশম চাষের লোভে দলে দলে ইংরেজ সেখানে আসিতে লাগিল। ৪০ বছরে নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজের সংখ্যা দুই হাজার হইতে ৫ লক্ষে দাঁড়াইল। মাওরীদের সঙ্গে ইংরেজদের অনেকবার সংঘর্ষ হইল। এত বহিরাগতের আগমন মাওরীরা পছন্দ করে নাই। ইংরেজদের সঙ্গে মাওরীরা শেষ পর্য্যন্ত পারিয়া উঠিল না।

বুয়ার যুদ্ধ

সবচেয়ে তীব্র সমস্যা দেখা দিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে একদিকে নিউজিল্যাণ্ডের মত শ্বেত জাতি বনাম স্থানীয় হটেনটট, কাফির, জুলু প্রভৃতি স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের লড়াই, আবার আর একদিকে কানাডার মত দুই শ্বেত জাতি ইংরেজ ও ডাচ বুয়রদের সংঘর্ষ। উত্তমাশা অন্তরীপ ইংলণ্ডের অধিকারে আসিবার পর ডাচ বুয়রদের অভিযোগ হইল—ইংরেজ শাসকেরা তাহাদিগকে ভিতরে হটেনটট এবং বাহিরে কাফিরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে না। তদুপরি দাস প্রথা তুলিয়া দেওয়ায় তাহাদের চাষবাসের খুব ক্ষতি হইয়াছিল। বুয়রেরা ঠিক করিল তাহারা ইংরেজ রাজত্বে বাস করিবে না। তাহারা পরিবার পরিজন, গবাদি পশু, আসবাবপত্র প্রভৃতি সমস্ত নিয়া উত্তরদিকে নাটাল এবং অরেঞ্জ নদীতীরে চলিয়া গেল। ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেট ট্রেক বা বিরাট উদ্বাস্তু গমন। ইংরেজের সামনে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। বুয়াররা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিল এবং নাটাল বন্দর কেপ কলোনির প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রথমটা ইংলণ্ড বুয়ারদের কিছু বলিল না, তাহাদের আলাদা রাজ্য পত্তন করিতে দিল। ১৮৪২ সালে ইংলণ্ড দাবী করিল যে নাটাল ইংরেজের সম্পত্তি। ১৮৪৮ সালে ইংলণ্ড বুয়ারদের হাত হইতে অরেঞ্জ নদী কলোনি কাড়িয়া নিল। বুয়ারেরা আবার উদ্বাস্তু হইয়া আরও উত্তরে ট্রান্সভালে চলিয়া গেল। ইংলণ্ড এইবার নীতি পরিবর্ত্তন করিল। ট্রান্সভালের স্বাধীনতা স্বীকার করিল এবং অরেঞ্জ নদী

কলোনি বুয়ারদের ফিরাইয়া দিল। উহার নাম হইল অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট। নাটাল ফিরাইয়া দিল না। প্রায় ত্রিশ বৎসর এই বন্দোবস্ত বজায় রহিল।

ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

১৮২৫ হইতে ৫০ বছরে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরেজ অল্পদিনেই বুঝিল ভারতবর্ষ এত বিরাট এবং জনাকীর্ণ দেশ যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের মত উহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দেশ দখলে রাখার চেষ্টা করা বৃথা। হয় নিছক অস্ত্রবলে নয় ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহাদের সহযোগিতায় ঐ দেশ দখলে রাখিতে হইবে। ইংলণ্ড প্রথমটির উপর জোর দিল বটে, দ্বিতীয়টিকেও একেবারে উপেক্ষা করিল না। সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতীয় সৈন্যদের উপরেই বেশী নির্ভর করিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা বাড়াইতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৩ সালে সিন্ধু এবং ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব অধিকৃত হইল। ১৮২৪-২৬ ও ১৮৫২ সালের দুই ব্রহ্ম যুদ্ধে ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ দখলে আসিল। ডালহৌসি সাতারা, করৌলি, নাগপুর এবং অযোধ্যা অধিকার করিলেন। ডালহৌসির "বংশ শেষ" নীতি (Doctrine of Lapse) গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করিল, কিন্তু উহাতে সাম্রাজ্য বিস্তারে অনেক সহায়তা হইল। ডালহৌসি দেশের লোকের সুখসুবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার আমলে রাস্তা, রেল, বন্দর, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রসার আরম্ভ হইল। স্কুল স্থাপিত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত শাসন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। কোম্পানীর শাসন শেষ হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় একটি ভারত-সচিবের পদ সৃষ্টি হইল এবং ভারত-সচিবের একটি কাউন্সিল গঠিত হইল। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে এক বিরাট দরবার করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হইল।

বৃটিশ সাম্রাজ্য, বিশেষভাবে ভারত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের বিপুল সম্পদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে অজস্র অর্থ ও সম্পদ ইংলণ্ডে প্রবাহিত হইতে

লাগিল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ লাভজনক হওয়ায় বৃটেনের বাড়তি লোকের সমস্যাও মিটিয়া গেল। স্থানীয় উন্নতি এবং স্থানীয় জনসাধারণের সন্তোষের প্রতিও ইংলণ্ড দৃষ্টি রাখিল। শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনেও অগ্রসর হইল।

কানাডায় ইংরেজ-ফরাসী বিরোধ ও ডারহাম রিপোর্ট

কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধ গভীর অসন্তোষে পরিণত হইল। উভয় অংশেই বিদ্রোহ হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পুনরভিনয় পাছে ঘটে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড কানাডার বিদ্রোহ উপেক্ষা করিল না। লর্ড ডারহাম নামে একজন প্রগতিশীল লোককে কানাডায় পাঠাইল। চার্লস বুলার এবং এডওয়ার্ড গিবন ওয়েকফিল্ড নামে দুজন খ্যাতনামা সাম্রাজ্য-বাদীকে সঙ্গে নিয়া ডারহাম কানাডা গেলেন। ডারহাম রিপোর্ট আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট পৃথিবীতে খুব কম রচিত হইয়াছে। ডারহাম কানাডার সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন—নিয়মতান্ত্রিক এবং জাতিগত। নিম্ন এবং উপর উভয় কানাডাতেই তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টারি শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; জাতিগত বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিলেন উভয় কানাডা এক পার্লামেণ্ট এবং এক গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে, তবে ফরাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকিবে। ডারহাম রিপোর্ট অনুসারে ১৮৪০ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে কানাডা ডোমিনিয়ন আইন পাশ হইয়া গেল। পাঁচ দিন পর ডারহামের মৃত্যু হইল। ১৮৬৭ সালে কানাডা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত বৃটিশ ডোমিনিয়নে পরিণত হইল। ইংলণ্ডের হাতে রহিল শুধু চারিটি ক্ষমতা—সংবিধান সংশোধন, গবর্ণর জেনারেল নিয়োগ, ইম্পিরিয়েল আইনের সহিত বিরোধ হইলে কানাডা পার্লামেণ্টের আইন বাতিল এবং কানাডার উচ্চতম আদালত হইতে বৃটিশ প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের অধিকার।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কানাডাই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ডারহাম রিপোর্ট উহার গোড়া পত্তন করিয়া দেয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া রাশিয়া এবং ফ্রান্সও তাহাদের সাম্রাজ্য এই সময়ের মধ্যে বিস্তৃত করিয়াছিল।

রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার

রাশিয়া পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণের ককেশাস প্রদেশসমূহ, কেন্দ্রীয় এশিয়া এবং তুর্কীস্থানের কয়েকটি ছোট রাজ্য, চীন সীমান্তে আমুর প্রদেশ এবং সাখালিন দ্বীপের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের রাজনীতিতে রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিল। ৬০ বছরের মধ্যে রাশিয়া ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বিশ্বশক্তিরূপে স্বীকৃত হইল।

ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তার

ফ্রান্স ওয়াটালু যুদ্ধে সাম্রাজ্য হারাইয়াছিল কিন্তু তাহার সাম্রাজ্যস্পৃহা নষ্ট হয় নাই। ওয়াটালু যুদ্ধের তাল সামলাইয়া নিয়া ফ্রান্স আবার সাম্রাজ্য গঠনে মন দিল। ৬০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার পরেই স্থান গ্রহণ করিল। প্রথমে অধিকৃত হইল উত্তর আফ্রিকায় আলজেরিয়া, তারপর মরক্কো, তারপর টিউনিস। উত্তর আফ্রিকায় বিরাট ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। আলজেরিয়ায় ফরাসী সৈন্যদের জমি দিয়া বসাইবার ব্যবস্থা হইল। অন্য ইউরোপীয় জাতিদেরও আসিতে উৎসাহ দেওয়া হইল। অনেক জর্ম্মান, ইতালিয়ান এবং স্পেনীয় আসিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিল। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য বিস্তারে সবচেয়ে বেশী ঝোঁক দেওয়া হইল। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমল পর্য্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রহিল। পশ্চিম আফ্রিকায় কলোনি বিস্তৃত হইল। লুই ফিলিপের আমলে মহম্মদ আলির সহায়তায় ফ্রান্স মিশরে ঢুকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফরাসী উদ্যম এবং ফরাসী টাকায় সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ ফ্রান্সের এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রশান্ত মহাসাগরেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ধাওয়া করিল। তাহিতি এবং নিউ

কালিডোনিয়া অধিকৃত হইল। নিউজিল্যাণ্ড অধিকারের চেষ্টা সফল হইল না। চীনে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ফ্রান্স সেখানেও গিয়া ঢুকিল। এশিয়ায় সাফল্য অর্জ্জন করিয়া ফ্রান্স এবার আমেরিকার দিকে নজর দিল। মেক্সিকো দখল করিতে গেল কিন্তু পারিল না। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ফ্রান্স যে সব দেশ দখল করিয়াছিল তাহাতে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের সুবিধা ছিল না। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর। বিশ্ববাণিজ্যে ইংলণ্ড একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিলেও ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্পদও উপেক্ষণীয় হইল না।

আমেরিকার আয়তন বৃদ্ধি

১৮২৫ হইতে ১৮৭৮-এর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহার আয়তন আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া লইল।

সুয়েজ খাল

এই সময়ের একটি বৃহৎ ঘটনা সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব এশিয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। ইহাতে ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দেশগুলির পক্ষে ভারতের সহিত বাণিজ্যে খুব সুবিধা হয়। পশ্চিম ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সের উপকূলে একদিকে আটলান্টিক সাগর অপরদিকে ভূমধ্যসাগর। এইজন্য ফ্রান্স বহুদিন হইতেই সুয়েজ যোজকের ভিতর দিয়া খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর সংযুক্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছিল। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী পত্রিকাসমূহে ইহা নিয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। অনেকের ধারণা ছিল যে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের উচ্চতা (level) সমান নয়, সুতরাং এই খাল কাটা যাইবে না। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন মিশরে গেলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়া গেলেন। ইঞ্জিনিয়ারের নাম চার্লস লেপের। লেপের রিপোর্ট দিলেন যে লোহিত সাগরের লেভেল ভূমধ্যসাগর হইতে ৩০ ফিট বেশী, সুতরাং খাল কাটা অসম্ভব। ১৮৫৩ সালে লিনা স্থ বেলফঁ নামে

আর একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে দুইটি সাগরের লেভেল দুইরকম হইলেও ক্ষতি নাই, উহাতে খাল কাটায় অসুবিধা হইবে না। ইতিমধ্যে ১৮৪৬-এ আর একদল ফরাসী সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

ফার্দ্দিনান্দ ড্য লেসেপ্স লেপের রিপোর্ট অধ্যয়ন করিলেন। বেলফঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। লেসেপ্স-এর জীবনের লক্ষ্য হইল সুয়েজ খাল নির্ম্মাণ। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ভাইস কনসাল নিযুক্ত হইলেন। ১৮৪৫-এ তিনি কনসাল জেনারেল পদে প্রমোশন পাইলেন। লেসেপ্স মিশরে তুরস্কের সুলতানের ভাইসরয় মহম্মদ আলির খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহম্মদ আলির কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সৈয়দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। মিশর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লেসেপ্স দেশে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু সুয়েজ খালের চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না।

অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ মিলিয়া গেল। মহম্মদ আলির পর তুর্কী ভাইসরয় হইলেন আব্বাস। পাশ্চাত্য শক্তিদের বিশেষভাবে ফরাসীদের উপর আব্বাসের ঘোরতর অবিশ্বাস ছিল। তিনি উহাদের সকলকেই অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখিতেন। ১৮৫৪ সালে আব্বাস নিহত হইলেন এবং ভাইসরয় হইলেন মহম্মদ সৈয়দ। সঙ্গে সঙ্গে লেসেপ্স মিশরে আসিলেন। ৩০শে নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে সুয়েজ খাল সম্পর্কে সৈয়দের সঙ্গে লেসেপ্স-এর প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। তিনি সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কোম্পানী গঠনের অনুমতি পাইলেন। প্রয়োজনীয় জমি তাহাকে ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইল।

৫ই জানুয়ারী ১৮৫৬ তারিখে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। উহাতে সর্ত্ত রহিল যে ভাইসরয় সৈয়দের প্রভু তুরস্কের সুলতানের অনুমোদন এই চুক্তিতে নিতে হইবে। উহাতে বলা হইল যে সুয়েজ খাল দিয়া সকল সময় সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করিতে পারিবে। তবে সকলকে তার জন্য মাশুল দিতে হইবে। চুক্তিতে ইহাও বলা হইল যে সুয়েজ কোম্পানী

কোন বিশেষ দেশকে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা দিতে পারিবে না এবং যে দিন সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হইবে সেইদিন হইতে লীজের ৯৯ বৎসরের মেয়াদ গণনা করা হইবে। এই মেয়াদ অন্তে, অথবা কোম্পানী কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তার আগেই সুয়েজ খাল মিশরের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। মিশর গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই কোম্পানীর লাভের উপর শতকরা ১৫ টাকা পাইবেন, যাহারা খাল নির্ম্মাণে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যে আর ১০ টাকা বিতরণ করা হইবে। সুয়েজ কোম্পানীর মূলধন হইল ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক। (৫০০ ফ্রাঙ্কের ৪ লক্ষ শেয়ার।)

সুয়েজ খাল চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই নানাবিধ রাজনৈতিক জটিলতা সুরু হইয়া গেল। বৃটেন ভাবিল ফ্রান্স মিশরে ঘাঁটি করিতেছে, আবার যদি সুয়েজ খাল কাটিতে পারে তাহা হইলে তাহার ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে। সুতরাং বৃটেন খাল কাটায় প্রাণপণে বাধা দিতে আরম্ভ করিল। খাল কাটার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও সুলতান চুক্তি অনুমোদন করেন নাই। বৃটেন সুলতানের উপর চাপ দিয়া তাঁহাকে দিয়া চুক্তি নাকচ করাইতে চেষ্টা করিল। সুলতান অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত উহা অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনের তারিখ ১৯শে মার্চ্চ ১৮৬৬। এই বাধা দিয়াছিলেন পামারষ্টন।

১৮৫৮ সালের নবেম্বর মাসে সুয়েজ কোম্পানীর শেয়ার বাজারে ছাড়া হইল। লেসেপ্স-এর ইচ্ছা ছিল ইউরোপের প্রত্যেক দেশ যেন এই কাজে সাহায্য করিতে পারে। তিনি সকলের জন্য শেয়ার আলাদা রাখিলেন। বৃটেনের জন্য রহিল ৮০ হাজার শেয়ার। কিন্তু বৃটেন এবং আমেরিকা শেয়ার কিনিল না। ২০৭,১১১ শেয়ার কিনিল ফ্রান্স, মিশর কিনিল ১৭৭,৬৪২ শেয়ার। লেসেপ্স-এর টাকা উঠিয়া গেল। তখনও সুলতানের অনুমোদন আসে নাই। লেসেপ্স আর অপেক্ষা করিলেন না। ১৮৫৯ সালের ২৫শে এপ্রিল তিনি স্বহস্তে কোদাল দিয়া প্রথম মাটি কাটিলেন।

ইংরেজের চাপে সুলতান কাজ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। উহা অগ্রাহ্য করিয়াই কাজ চলিতে লাগিল।

১৮৬৩ সালে সৈয়দের মৃত্যু হইল এবং ইসমাইল খেদিভ হইলেন। সুলতান তখনও বাধা দিয়া চলিয়াছেন।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল সম্পূর্ণ হইল। মোট খরচ হইল ৪৩,২৮,০৬,৮৮২ ফ্রাঙ্ক। ১৭ই নবেম্বর ১৮৬৯ তারিখে খাল আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হইল। ভ্য লেসেপ্স-এর স্বপ্ন সফল হইল। শেষদিকে বৃটেন অনেক নরম হইয়াছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া দেখা করিলেন এবং নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হইল।

এদিকে সুদানের সঙ্গে যুদ্ধে এবং বিলাসিতায় মহম্মদ আলি হইতে ইসমাইল পর্য্যন্ত খেদিভদের এত টাকা অপচয় হইল যে বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থ ঋণ করিতে হইল। সবচেয়ে বেশী টাকা দিল বৃটেন এবং ফ্রান্স। এতদিন বৃটেনও ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ স্বরূপ সুয়েজ খালের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। ১৮৭৫-এ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরায়েলি খেদিভ ইসমাইলের নিকট হইতে সুয়েজ কোম্পানীর শেয়ারগুলি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে কিনিয়া লইলেন।

সুয়েজ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে আছে—

ফরাসী	...	১৬
বৃটিশ	...	৯
মিশরীয়	...	৫
ডাচ	...	১
আমেরিকান	...	১
		৩২

ইহা ১৯৫৩ সালের ডিরেক্টর বোর্ড।

সাম্রাজ্য গঠনের তৃতীয় পর্য্যায়

সাম্রাজ্য গঠনের তৃতীয় ধাপ ১৮৭৮ (বার্লিন কংগ্রেস) হইতে ১৯১৪ (প্রথম মহাযুদ্ধ) পর্য্যন্ত।

এই সময় আরও দুইটি দেশ, ইতালি ও জার্মেনী সাম্রাজ্য গঠনের

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। আর দুইটি ঘটনা, আমেরিকার শক্তি সঞ্চয় এবং জাপানের অভ্যুদয়। বাণিজ্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটিল। এতদিন চলিয়াছে অবাধ বাণিজ্যের যুগ। অবাধ বাণিজ্যে ইংরেজের ছিল ষোল আনা লাভ। তার উন্নত শিল্প এবং বিশাল নৌবহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্য দেশের পক্ষে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। ইহারা আবার নিজেদের শিল্প সংগঠনের জন্য রক্ষণ শুল্ক বসাইতে সুরু করিল। সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিযোগিতার সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। এতদিন সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা ছিল অর্থ নৈতিক শোষণ। এই যুগে সাম্রাজ্যের আর এক উপযোগিতা স্বীকৃত হইল। সাম্রাজ্য হইতে ইউরোপীয় যুদ্ধে বা দেশ রক্ষায় সৈন্য আমদানী হইতে লাগিল।

এশিয়ায় ফ্রান্স টনকিন এবং আনাম দখল করিল। ইংলণ্ড অধিকার করিল সমগ্র ব্রহ্ম দেশ, মালয়, সর্ব্বক, উত্তর বোর্ণিও এবং নিউগিনির কতকাংশ এবং কতকগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ। আমেরিকা স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিল।

বার্লিন কংগ্রেসের পর সাম্রাজ্য বিস্তারের উপযুক্ত সুবিধাজনক ফাঁকা জায়গা ছিল মাত্র দুইটি—আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা। আফ্রিকা বিভাগ এই যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

আফ্রিকা বিভাগ

বিনা যুদ্ধে শুধু মানচিত্রে দাগ কাটিয়া আফ্রিকার মত এক বিরাট মহাদেশ ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল। ষ্টানলি, লিভিংষ্টোন, বেকার, বার্টন প্রভৃতি পর্য্যটকেরা জীবন বিপন্ন করিয়া আফ্রিকার প্রধান চারিটি নদী—নীল, নাইজার, কঙ্গো, এবং জাম্বেসীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আফ্রিকার সম্পদের সংবাদ আনিয়া ইউরোপকে দিলেন। ষ্টানলির বইগুলি আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইউরোপের চোখ খুলিয়া দিল। ১৮৭২-এ ষ্টানলির "আমি কিরূপে লিভিংষ্টোনকে পাইলাম", ১৮৭৮-এ "কৃষ্ণ মহাদেশের

অভ্যন্তরে'' এবং ১৮৯০-তে "ঘোর-কৃষ্ণ আফ্রিকায়" এই তিনটি বই প্রকাশিত হইল।

১৮৭৮-এ বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড রাজধানী ব্রুসেলসে ভূগোলের পণ্ডিতদের এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। আফ্রিকার অভ্যন্তরে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের আয়োজন করিবার জন্য এই সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক আফ্রিকান এসোসিয়েসন নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল। এসোসিয়েসন প্রথমেই নজর দিল কঙ্গোর দিকে। রাজা লিওপোল্ড টাকা দিলেন। এসোসিয়েসন নামেই রহিল আন্তর্জ্জাতিক, আসলে উহা হইল একটি বেলজিয়ান কোম্পানী। কয়েক বছরের মধ্যে উহার উদ্যোগে কঙ্গো ফ্রী ষ্টেট স্থাপিত হইল এবং লিওপোল্ড উহার রাজা হইলেন।

রাজা লিওপোল্ডের আফ্রিকা প্রবেশে অন্যদের চোখ টাটাইতে সুরু করিল। ফ্রান্স এবং পর্টুগাল আসিয়া কঙ্গোতে ভাগ চাহিল। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে গিয়া স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে সুরু করিল।

১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে আফ্রিকার দাবীদারদের এক সম্মেলন হইল। তখন পর্য্যন্ত যে যাহা দখল করিয়াছিল তাহা এই সম্মেলন মানিয়া নিল। ১৯১৪ সালের মধ্যে আবিসিনিয়া এবং লাইবেরিয়া বাদে সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ ভাগাভাগি হইয়া গেল। বাঁটোয়ারা হইল এইরূপ—

(১) কঙ্গোর বিরাট উপত্যকা জুড়িয়া কঙ্গো ফ্রী ষ্টেট প্রথমে ছিল বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯০৮ সালে বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট উহাকে বেলজিয়ামের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলেন।

(২) পর্টুগাল বেলজিয়ান কঙ্গোর দক্ষিণে আঙ্গোলা এবং উহার ঠিক পূর্ব্বদিকে আফ্রিকার মধ্য প্রান্তে মোজাম্বিক দখল করিল। মোজাম্বিকের নাম হইল পর্টুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা। মাঝখানের জমিটাও দখল করিয়া আঙ্গোলা হইতে মোজাম্বিক পর্য্যন্ত আফ্রিকার উপর দিয়া এক অবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা পর্টুগীজরা করিল কিন্তু পারিল না।

(৩) ইতালি দেরীতে আসিয়াছিল কিন্তু বাদ পড়ে নাই। সে দখল করিল এরিট্রিয়া এবং ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড। ১৯১১-১২ সালে তুর্কীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইল ত্রিপোলি এবং সাইরেনাইকা। আবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

(৪) জার্ম্মেনী দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকার বহু জমি অধিকার করিল। ক্যামেরুন এবং টোগোল্যাণ্ডও দখল করিল।

(৫) স্পেন জিব্রাল্টারের দক্ষিণে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অনেকটা জমি দখল করিল।

(৬) ফ্রান্স আগেই আলজেরিয়া নিয়াছিল। ১৮৮২ সালে নিল টিউনিস এবং ১৯১২ সালে মরক্কো। সমস্ত সাহারার উপর ফ্রান্স প্রভাব বিস্তার করিল। পশ্চিম আফ্রিকায় সেনেগালে আইভরি উপকূল এবং কঙ্গোতে ফ্রান্স অনেক জমি নিয়াছিল। সাহারা অধিকৃত হওয়ায় উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে ইহাদের যোগ স্থাপিত হইল। ১৮৯৬ সালে ফ্রান্স মাদাগাস্কার দখল করিল।

(৭) সবচেয়ে বেশী পাইল ইংলণ্ড। মিশর, টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা, উগাণ্ডা, সোমালিল্যাণ্ডের অংশ, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, গোল্ড কোষ্ট এবং নাইজেরিয়া বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইল। কাইরো হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হইল, মাঝখানে জর্ম্মান পূর্ব্ব-আফ্রিকা থাকায় অবিচ্ছিন্ন হইতে পারিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ উহা জার্ম্মেনীর নিকট হইতে কাড়িয়া নেয় এবং কাইরো হইতে কেপ পর্য্যন্ত অখণ্ড আফ্রিকান সাম্রাজ্যের আশা পূর্ণ হয়। উত্তর আফ্রিকার তুলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা, সোনা এবং হীরা ইংরেজের অধিকারে আসিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভে বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হইল ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের পরে জার্ম্মেনীর

সাম্রাজ্য লুপ্ত হইল। জার্মান সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১০ লক্ষ বর্গমাইল এবং অধিবাসী দেড় কোটি। জাতি সঙ্ঘের নির্দ্দেশে এই বিপুল সাম্রাজ্য বিজেতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন হইল সমগ্র পৃথিবীর মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ এবং উহার জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী। প্রথম যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের পক্ষে সব দিক দিয়া সহায়ক হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

চীন

উনবিংশ শতাব্দীর চীনের ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য জাতিদের হাতে লাঞ্ছনার এত করুণ কাহিনী। চীনের সম্পদ এবং চীনের দুর্ব্বলতা এই দুটি ছিল পাশ্চাত্য শক্তিদের চীন আক্রমণের প্রধান কারণ। অল্পদিনের মধ্যে চীন লুণ্ঠনে ইহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল জাপান।

চীনদেশে ইউরোপীয়েরা প্রথম ঢুকিল বণিকরূপে। ঢুকিয়াই যে যেখানে পারে জোঁকের মত আঁটিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল। পর্টুগীজরা মাকাও, ইংরেজরা ক্যাণ্টনে জোর করিয়া বসিয়া গেল। চীনারা ইহাদিগকে যত রকমে পারে অপমান করিল, নানারকম ট্যাক্স বসাইল, সহস্র রকমের নিষেধাজ্ঞা চাপাইল, তবু দেশ হইতে ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিল না। চীনারা বিদেশীদের সম্পর্কে প্রথম হইতেই একটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদিগকে চীনা ভাষা শিখিতে দিত না। কোন চীনা বিদেশীকে নিজের ভাষা শিখাইতে গেলে তাহাকে মারিয়া ফেলিত। পর্টুগীজ, স্পেনিশ, ডাচ এবং ইংরেজ বণিকেরা এত অপমান এবং ক্ষতি সহ্য করিয়াও ব্যবসা চালাইতে লাগিল।

ইহারা সকলেই চীনে ঢুকিয়াছিল জলপথে। রাশিয়া আসিয়া দেখা দিল উত্তর দিক হইতে স্থলপথে। রাশিয়ার একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল চীনের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ সীমান্ত। চীন সম্রাট বুঝিলেন রাশিয়া চীনে ব্যবসা করিতে আসিলে তাহাকে ঠেকানো যাইবে না। ১৮৮৯ সালে নার্সিঙ্কে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যচুক্তি হইল। ইহাই বিদেশীর সঙ্গে চীনের প্রথম চুক্তি। চুক্তির সর্ত্ত হইল, রাশিয়া জলপথে বাণিজ্য করিতে পারিবে না। বাণিজ্যের জিনিষপত্র সম্বন্ধেও খুব কড়াকড়ি করিয়া দিল। রাশিয়ার প্রথম কারাভান আসিলে সীমান্ত হইতে সৈন্য দিয়া ঘেরাও করিয়া উহাকে পিকিং আনিল, অল্প কয়েকজন চীনা ব্যবসায়ীর নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে দিল, আবার সৈন্য দিয়া সীমান্তে কারাভান পৌছাইয়া দিল। এত কড়াকড়িতে ব্যবসা চলে না বলিয়া চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য অল্পদিনেই প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। বিদেশী বণিক সম্বন্ধে চীন প্রথম হইতেই সন্দেহ পোষণ করিয়াছিল।

চীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহস্র বাধা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও দমিল না। তাহারা চা, রেশম এবং আফিমের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলিল। বাণিজ্যের সুযোগ চাহিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীন সম্রাটের নিকট অনেক আবেদন করিলেন। কোন ফল হইল না। তৃতীয় জর্জ্জ নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য চীন সম্রাটকে উপহার পাঠান, চীন সম্রাটও উহা রাজার প্রাপ্য কর বলিয়া গ্রহণ করেন। ইংরেজ রাজা যে মুহূর্ত্তে বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব করেন, তখনই উহা প্রত্যাখ্যান করেন। চীন সম্রাট চিয়েন লুং তৃতীয় জর্জ্জকে লিখিলেন, "আপনি রাজদূত পাঠাইয়া দেখিতে পারেন আমাদের কোন কিছুরই অভাব নাই। আমি আশ্চর্য্যজনক বা সুন্দর জিনিষের কোন মূল্য দিই না। আপনার দেশের কলে তৈরী জিনিষে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহা দেড় শতাব্দী আগের ঘটনা। চীন কিছুতেই স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় বণিকের জন্ম তার দরজা খুলিল না।

আফিমের ব্যবসায়

চীনের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিল আফিম। চীনারা আফিম ধরিল এবং আফিমের চাহিদা দারুণ ভাবে বাড়িয়া গেল। ১৮১৬ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট বাণিজ্য মিশন নিয়া চীনে গেলেন। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লর্ড নেপিয়ারকে চীনের বাণিজ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। চীনারা ট্রেড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম দিল "বর্ব্বরের চোখ"।

আফিম আমদানীর প্রতিবাদ

আফিমের ব্যবসা নিয়া অল্পদিনেই সঙ্কট দেখা দিল। বিদেশী আফিমের আগেই চীনারা আফিমের সংবাদ জানিত; কিন্তু ইংরেজেরা উহা চীনে আমদানী আরম্ভ করিলে তাহারা ব্যাপকভাবে উহা ধরিল। ১৭৭০ সাল হইতে চীনে আফিম রপ্তানী আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে আফিম উৎপন্ন হইত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহা চীনে চালান দিত। ১৫ বছরে আফিম রপ্তানী চারগুণ বাড়িয়া গেল। চীন সম্রাট আফিম সেবন বন্ধ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ১৮০০ সালে চীন সম্রাট দেশে আফিম আমদানী নিষিদ্ধ করিলেন। তৎসত্ত্বেও অবাধে উহার ব্যবসা চলিল। দুর্নীতিপরায়ণ চীনা সরকারী কর্ম্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের সাহায্য করিতে লাগিল। ১৮৩৩ সালে চীন সম্রাট আফিম আমদানী বন্ধ করিতে ক্যাণ্টনে একজন চীনা কমিশনার পাঠাইলেন। ক্যাণ্টন ছিল আফিম আমদানীর বন্দর। কমিশনার স্বদেশী এবং বিদেশী উভয়ের নিকটে বাধা পাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দরে আফিম আনা বন্ধ করিবার জন্য যে সমস্ত নৌকা নিযুক্ত হইয়াছিল সেই সব নৌকাতেই আফিম ডাঙ্গায় উঠিতে লাগিল। ১৮৩৯ সালে চীন সম্রাট আবার আফিম বন্ধের চেষ্টা করিলেন। এবার লিন নামে একজন জবরদস্ত কমিশনার পাঠাইলেন। তিনি আসিয়াই ক্যাণ্টনের ইংরেজ বসতি অবরোধ করিলেন এবং দাবী করিলেন সমস্ত আমদানী আফিম তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। ইংরেজরা যখন দেখিল লিনের আদেশ পালন

না করিলে অনশনে মরিতে হইবে তখন বৃটিশ ট্রেড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন ইলিয়ট ৩০ হাজার বাক্স আফিম লিনের হাতে দেওয়ার জন্য বণিকদের পরামর্শ দিলেন। লিন সমস্ত আফিম পোড়াইয়া দিলেন। লিন এইবার ইংরেজ বণিকদের নিকট প্রতিশ্রুতি চাহিলেন যে তাহারা ভবিষ্যতে আর চীনে আফিম আনিবে না, আনিলে মৃত্যুদণ্ড হইবে।

প্রথম চীন যুদ্ধ

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই ঘটনা কাজে লাগাইল। তাহারা আফিম পোড়ানোর প্রতিবাদ করিল। ক্যাণ্টন নদীতে বৃটিশ নৌবহরের দুইটি জাহাজ ছিল। ২৯টি বড় নৌকা দিয়া লিন উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ দুই জাহাজ হইতে গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরেজরা নৌকাগুলি ছত্রভঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিল। নৌকা বাহিনীর চীনা অধিনায়কেরা সম্রাটকে সংবাদ দিলেন চীনের জয় হইয়াছে। সম্রাট খুশী হইয়া প্রধান অধিনায়ককে এডমিরাল পদে উন্নীত করিলেন। পরে সংবাদ আসিল ইংরেজ যুদ্ধ চালাইয়াছে এবং প্রতি পদে জয়লাভ করিতেছে। তিন বৎসর যুদ্ধ চলিল। ইংরেজরা একে একে চেরসন, নিংপো, আময়, সাংহাই এবং হংকং অধিকার করিল। নানকিং আক্রান্ত হইল। পিকিং আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিল। সম্রাট কমিশনার লিন এবং তৎপরবর্ত্তী কমিশনারদের পিকিং-এ ডাকিয়া পাঠাইলেন শাস্তি নেওয়ার জন্য। অনেকে আত্মহত্যা করিলেন। ইংরেজের গুলিতে যত চীনা মরিল, তার চেয়ে বেশী মরিল হারাকিরিতে। ইংরেজের আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে চীনারা পারিয়া উঠিল না।

১৮৪২ সালে নানকিং সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। আফিমের ব্যবসা তো বজায় রহিলই, ইংরেজ চীনাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে চুক্তি করিল। নানকিং সন্ধি অনুসারে চীন ইংরেজকে হংকং ছাড়িয়া দিল এবং ক্যাণ্টন, ফুচৌ, নিংপো, আময় এবং সাংহাই এই পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিল। একদল নির্দ্দিষ্ট চীনা ব্যবসায়ীকেই বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত,

সকলকে দেওয়া হইত না। ইহাদিগকে কো হং ব্যবসায়ী বলিত। ইহারা বিদেশী পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ী বলিয়া খুসীমত চড়া দাম আদায় করিত। নানকিং সন্ধিতে এই কো হং একচেটিয়া কারবার উঠিয়া গেল। চীন যুদ্ধের মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হইল।

এই যুদ্ধ প্রথম চীন যুদ্ধ বা আফিম যুদ্ধ নামে অভিহিত। এত কদর্য্য উদ্দেশ্য নিয়া যুদ্ধ পৃথিবীতে আর হইয়াছে কি না সন্দেহ। চীনারা আফিম বন্ধ করিতে চাহিল, কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ অস্ত্রবলে তাহাদের এই বিষ-সেবনের অভ্যাস বজায় রাখিতে বাধ্য করিল।

চীনের উপকূলে ইংরেজ যে ফাটল ধরাইল তাহা দিয়া অন্য শক্তিরা হুড়হুড় করিয়া ঢুকিতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৪ সালে আমেরিকা এবং ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের সন্ধি হইল। তিন বৎসর বাদে নরওয়ে সুইডেন আসিয়া জুটিল। বেলজিয়ামও আসিয়া কিছু সুবিধা আদায় করিল। নানকিং সন্ধি হইল এই সমস্ত সন্ধির আদর্শ।

বলপ্রয়োগে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের চীন প্রবেশে চীনারা খুসী হইল না। বিদেশী দেখিলেই তাহারা বিক্ষোভ প্রকাশ করিত এবং উহাদিগকে "বিদেশী ভূত" বলিয়া অভিহিত করিত।

ইংরেজ এত আদায় করিয়াও খুশী হইল না। সমগ্র ইয়াংসি উপত্যকার উপর তাহাদের নজর পড়িল। নানকিং সন্ধিপত্র বদলাইয়া আরও সুবিধা তাহারা চাহিতে লাগিল। ফ্রান্স ঘনিষ্ঠভাবে জুটিল ইংরেজের সঙ্গে।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ

১৮৫৬ সালে চীনারা এক ফরাসী মিশনারীকে ধরিয়া তার বিচার করিল এবং ফাঁসি দিল। অভিযোগ—সে বন্দরের নির্দ্দিষ্ট এলাকা হইতে বাহিরে আসিয়াছে এবং বিদ্রোহের উস্কানি দিয়াছে। ফ্রান্স দাবী করিল—কোন ফরাসী চীনে কোন অপরাধ করিলে চীনারা তাহার বিচার করিতে পারিবে না, ফরাসীদের দ্বারা গঠিত আদালতে বিচার হইবে। "অ্যারো" নামে একটি

ছোট ইংরেজ জাহাজ উপকূলে চোরাই চালানের ব্যবসা করিতেছিল। চীনারা উহাকে আটক করিল। ফরাসী রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উভয়ে মিলিয়া চীন আক্রমণ ঘোষণা করিলেন। ঠিক এই সময়ে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিল এবং ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চীন আক্রমণ তখনকার মত স্থগিত রহিল।

পর বৎসর ১৮৫৮ সালে সুরু হইল দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ। ইঙ্গ-ফরাসী মিলিত শক্তির নিকট চীন সহজেই পরাজিত হইল। ১৮৬১ সালে তিয়েনৎসিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। উহার সর্ত—

(১) কৌলুন ইংরেজকে ছাড়িতে হইবে,

(২) আরও ১১টি বন্দরে বিদেশীকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিতে হইবে,

(৩) ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে মোটা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে,

(৪) পিকিং-এ বিদেশী মিশনারীদের থাকিতে দিতে হইবে,

(৫) পাসপোর্ট নিয়া চীনের সর্ব্বত্র বিদেশীদের যাতায়াত করিতে দিতে হইবে,

(৬) বাণিজ্য চুক্তির স্বাধীনতা দিতে হইবে,

(৭) মিশনারীদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে,

(৮) কোন বিদেশী চীনের আইন ভঙ্গ করিলে চীনা আইনে চীনা আদালতে তার বিচার হইবে না, অপরাধীর নিজের দেশের আইনে তার দেশের লোক নিয়া গঠিত আদালতে বিচার হইবে। ইহাকেই বলা হয় extra-territoriality.

তিয়েনৎসিন সন্ধিতে বিদেশীরা চীনে অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা, চীনের মাটিতে অতিরিক্ত অধিকার, চীনা শুল্ক ব্যবস্থার উপর প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব, চীনের সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুযোগ এবং মিশনারীদের রক্ষা ব্যবস্থার নামে চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইল। চীন যাহাদিগকে বর্ব্বর

বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগের অস্ত্রবলে বাধ্য হইয়া সমকক্ষ স্বীকার করিতে হইল।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ পর্যন্ত চীনে ইউরোপীয়দের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। এই যুদ্ধের পর ঐ সঙ্গে সাম্রাজ্যলিপ্সা দেখা দিল। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সাম্রাজ্য গঠন সুরু হইল। আরও এক নূতন জটিলতা দেখা দিল জাপানের অভ্যুদয়। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই জাপান আধুনিক কায়দায় নিজের দেশ গড়িয়া তুলিল এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমান তালে চীনে সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিযোগিতায় যোগ দিল।

চীনে পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৮৬০ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরের প্রাচ্য রাজনীতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) চীন এবং জাপানে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের বাণিজ্য কেন্দ্র বিস্তার, (২) চীনের উপর রাজনৈতিক আক্রমণ এবং উহার দূরবর্ত্তী অধীনস্থ রাজ্য-সমূহ অধিকার, এবং (৩) সামরিক শক্তিরূপে জাপানের অভ্যুদয়।

চীনে বৃটিশ বাণিজ্য ছিল অন্যদের দশগুণ। অন্যেরাও বাণিজ্য বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের পর চীনের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল পাঁচটি দেশ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা এবং নরওয়ে-সুইডেন। নরওয়ে-সুইডেন তখন এক রাজ্য। পরবর্ত্তী ৩০ বৎসরে আরও ১১টি দেশের সঙ্গে চীনকে সন্ধি করিতে হইল। তন্মধ্যে ৮টি ইউরোপীয়—প্রুশিয়া, ডেনমার্ক ও নেদারল্যাণ্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, ইতালি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পর্টুগাল; দুইটি দক্ষিণ আমেরিকান—পেরু এবং ব্রেজিল; এবং একটি এশিয়ান—জাপান।

চীনে একজন ইংরেজ কনসাল ছিলেন নাম, মার্গেরি। মার্গেরি হঠাৎ নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ এই হত্যাকাণ্ডকে কাজে লাগাইল। মোটা ক্ষতিপূরণ তো আদায় করিলই, ঐ সঙ্গে আরও কতকগুলি সুবিধা আদায়

করিয়া লইল। বিদেশীদের যে সব জায়গায় থাকিতে দেওয়া হইত সেখানে লিকিন নামে এক যানবাহন শুল্ক আদায় হইত। এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণের নামে ইংরেজরা উহা তুলিয়া দিতে বাধ্য করিল। আরও চারিটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার মিলিল, এবং ইয়াংসি নদীতে ছয়টি ঘাঁটি পাওয়া গেল। মাগেরির হত্যার ফলে ইংরেজ ইয়াংসি নদীর এলাকায় বজ্রমুষ্টি বসাইতে পারিল।

তাইপিং বিদ্রোহ

চীনের তাইপিং বিদ্রোহও ইংরেজের ক্ষমতা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। মাঞ্চু বংশের রাজা ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন। মাঞ্চু রাজার দুর্ব্বলতা ইংরেজ বুঝিয়া নিয়াছিল। নানকিং সন্ধির পর মাঞ্চু বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য চীনে অন্তর্বিপ্লব ঘটে এবং ১৩ বৎসর যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহাই চীনেব তাইপিং বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

বিদ্রোহীদের শক্তিকেন্দ্র ছিল নানকিং। এই গৃহযুদ্ধেব সময় কয়েকজন ইংরেজ এবং ফরাসী বন্দীর উপর চীনারা অত্যাচার করিয়াছিল। উহাব প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইংবেজের আদেশে চীন সম্রাটের অতি সুন্দর গ্রীষ্ম-কালীন প্রাসাদটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

পোর্ট আর্থারের উপর রাশিয়ার দৃষ্টি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া বুঝিয়াছিল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাহাকে ভূমধ্য-সাগরে ঢুকিতে দিবে না, বলকান রাজনীতিতেও হাত দিতে দিবে না। ক্রিমিয়ায় বাধা পাইয়া রাশিয়া এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। পারস্য এবং আফগানিস্থানে বাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। সেখানে দেখিল শক্ত ঠাঁই। চীনকে দুর্ব্বল পাইয়া রাশিয়া তার উপর চাপ দিল। চীন যখন ভিতরে তাইপিং বিদ্রোহ এবং বাহিরে ইঙ্গ-ফরাসীর সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত সেই সুযোগে রাশিয়া তার নিকট হইতে আমুর নদী তীরের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আদায় করিল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চীনের বন্ধু

সাজিয়া রাশিয়া ভ্লাডিভষ্টক বন্দর অধিকার করিল। এইভাবে রাশিয়া কোরিয়া সীমান্তে আসিয়া পৌছিল এবং মাঞ্চুরিয়াকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। ভ্লাডিভষ্টক বন্দর সারা বছর বরফমুক্ত থাকিত না। এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বরফমুক্ত বন্দর ছিল পোর্ট আর্থার। রাশিয়ার নজর উহার উপর পড়িল।

ফ্রান্সের টংকিন এবং আনাম অধিকার

ফ্রান্স ১৮৭০ সালের যুদ্ধে দেশে পরাজিত হইয়া বিদেশে ক্ষতিপূরণের জন্য তাকাইতে আরম্ভ করিল। প্রুশিয়া ফ্রান্স-এর দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রদেশ কাড়িয়া নিয়াছে, উহা কবে ফেরৎ পাওয়া যাইবে, আদৌ ফেরৎ আসিবে কিনা ঠিক নাই। সুতরাং চীনের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। টংকিন এবং আনাম অধিকৃত হইল। ইংলণ্ড বলিল,—ফ্রান্স ভারতবর্ষের এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকেও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইংলণ্ড ব্রহ্মদেশ এবং সিকিম দখল করিল; শ্যামের কতকাংশ ইংলণ্ড, কতকাংশ ফ্রান্স দখল করিল এবং অবশিষ্ট অংশ বৃটিশ ব্রহ্মদেশ এবং ফরাসী আনামের মাঝখানে নিরপেক্ষ রাজ্যরূপে ছাড়িয়া রাখিল। জাপান লু চু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া জানাইয়া দিল এই সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

কোরিয়ায় জাপানী অনুপ্রবেশ

কোরিয়ায় জাপানী স্বার্থ বহুকালের। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই কোরিয়ার কর্তৃত্ব নিয়া চীনের সঙ্গে জাপানের লড়াই চলিয়াছে। জাপান বলিত কোরিয়া জাপানের বুকে উদ্যত একটি ছোরা। ইংলণ্ড যেমন বেলজিয়ামের ভৌগোলিক অবস্থানকে তার নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে, জাপানও কোরিয়ার অবস্থিতি সেই চোখে দেখিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চু রাজা কোরিয়া জয় করিয়া উহাকে চীনের অধীনস্থ দেশে পরিণত করেন। কোরিয়ায় চীনারা বিশেষ কোন অত্যাচার বা শোষণ করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে কোরিয়া সম্বন্ধে জাপানের আগ্রহ আরও

বাড়িল। জাপান বুঝিল কোন পাশ্চাত্ত্য শক্তি কোরিয়া আক্রমণ করিলে চীন উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কোরিয়ায় বাণিজ্যের নামে পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রবেশ এবং চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ সুরু হইয়া গিয়াছে। রাশিয়া কোরিয়ায় এক পা ঢুকিয়াও গিয়াছিল, অন্য ইউরোপীয় শক্তিদের ধমকে হটিয়া গিয়াছে।

চীন-জাপান যুদ্ধ

জাপান প্রথমেই কোরিয়ায় স্বাধীনতা এবং শাসন সংস্কারের দাবীতে গঠিত দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিল। ১৮৭৬ সালে জাপান কোরিয়ানদের বলিল তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে সে তাহা স্বীকার করিবে। ১৮৮৪ সালে কোরিয়ায় ভীষণ দাঙ্গা বাধিল। জাপান চীনকে জানাইয়া দিল যে তাহাকে নোটিশ না দিয়া চীন বিদ্রোহ দমনের জন্য কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাইতে পারিবে না। ১৮৯৪ সালে কোরিয়ায় আবার বিদ্রোহ বাধিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিল টোংঘাক দল। উহাদের উদ্দেশ্য বিদেশী বিতাড়ন। কোরিয়ান গভর্ণমেণ্ট চীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। চীন ২০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিল। জাপান ইহাতে আপত্তি করিল এবং নিজের ৮০০০ সৈন্য কোরিয়ায় পাঠাইল। জাপানী সৈন্য কোরিয়ায় পৌছিবার আগেই টোংঘাক বিদ্রোহ শেষ হইয়া গেল।

চীন প্রস্তাব করিল দুজনেই সৈন্য সরাইবে এবং কোরিয়ায় কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। জাপান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন প্রস্তাব করিল যে কোরিয়ার শাসন সংস্কারের একটি প্রোগ্রাম দুজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া চীন ও জাপান উভয়ে উহা কার্য্যে পরিণত করিবে। চীন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই যুদ্ধে তার প্রয়োজন ছিল দুই কারণে—প্রথম, কোরিয়া অধিকার; দ্বিতীয়, চীনকে পরাজিত করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিকে দেখানো জাপান কত বড় সামরিক শক্তি। পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের মুষ্টি জাপানের উপর তখনও বেশ ভালভাবেই ছিল। জাপান বুঝিল এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ঐগুলি ঝাড়িয়া ফেলা সম্ভব হইবে।

১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসে চীন কোরিয়ায় এক জাহাজ সৈন্য পাঠাইল। জাপান হুকুম দিল জাহাজ বন্দরে ভিড়ানো চলিবে না, উহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। চীনা জাহাজ আত্মসমর্পণে অস্বীকার করিলে জাপান গোলা চালাইল। জাহাজটি ডুবিল। একজন চীনা সৈন্যও রক্ষা পাইল না।

এই ঘটনার পরে চীন এবং জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নয় মাস যুদ্ধ চলিল। প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে জাপান জয়ী হইল, জাপানী জেনারেল, জাপানী সৈন্য, জাপানী সামরিক সংগঠনের দক্ষতা এই যুদ্ধে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। নবেম্বর মাসে জাপান পোর্ট আর্থার সহ লিয়াওটুং উপত্যকা দখল করিল। লিয়াওটুং-এর বিপরীত দিকে শানটুং। সেখানে জাপানী সৈন্য অবতরণ করিল এবং তিয়েনৎসিন ঘেরাও করিয়া পিকিং-এর রাস্তা বন্ধ করিল। ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েই-হেই-ওয়েই বন্দর অধিকৃত হইল। জাপানী সৈন্য ধাবিত হইল রাজধানী পিকিং অভিমুখে।

শিমোনোসেকির সন্ধি

চীন সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইহাই ১৮৯৫ সালের শিমোনোসেকির সন্ধি। সন্ধির সর্ত্ত হইল—

(১) চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিবে।

(২) জাপানকে ফরমোসা, পেসকাডোর এবং লিয়াওটুং উপত্যকা ছাড়িয়া দিবে।

(৩) পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের ন্যায় সমকক্ষভাবে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করিবে।

(৪) চারিটি বন্দরে জাপানকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিবে।

(৫) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিবে।

শিমোনোসেকির সন্ধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য রাজনীতির বৃহত্তম ঘটনা। জাপানের সামরিক শক্তি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইল। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের সঙ্গে জাপানের অসম্মানজনক সমস্ত সন্ধি বাতিল হইল। চীনের দুর্ব্বলতা

সাংঘাতিক ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক শক্তিদের কাছে যুদ্ধে পরাজয়ে চীনের যে সুনাম নষ্ট হয় নাই, এশিয়াতে এক নূতন দেশ জাপানের নিকট পরাজয়ে তাহা ধূলিসাৎ হইল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা আফ্রিকার মত চীনের উপর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সা প্রবলভাবে বাড়িয়া গেল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা বুঝিল জাপানকে আর উপেক্ষা করা চলিবে না। কাইজারের বিখ্যাত কার্টুন—পীত আতঙ্ক—এই সময়ে প্রকাশিত হইয়া, জাপান সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মনোভাব ধরা পড়িয়া গেল।

শিমোনোসেকি সন্ধির প্রতিক্রিয়া

ইউরোপীয় শক্তিদের ধারণা জন্মিল শিমোনোসেকি সন্ধি বজায় থাকিতে দিলে বিপদ আছে, জাপানকে বাধা দেওয়া দরকার। এই সন্ধিতে রাশিয়ার আতঙ্ক হইল সবচেয়ে বেশী। পোর্ট আর্থারের উপর রাশিয়া নজর দিতে না দিতে জাপান উহা কুক্ষিগত করিয়া বসিয়া গেল। নিজের দ্বীপ ছাড়িয়া এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে পদক্ষেপ রাশিয়া পছন্দ করিল না। চীন ইহা বুঝিয়া রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাশিয়া জাপানে নোট পাঠাইল যে জাপান লিয়াংটুং উপত্যকা যেন চিরদিনের জন্য দখল না করে। ইংলণ্ড এই নোট সমর্থন করিল না, জার্ম্মেনী এবং ফ্রান্স করিল। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জার্ম্মেনীকে এক জোট হইতে দেখিয়া জাপান হটিয়া আসিল। চীনের নিকট হইতে টাকা নিয়া পোর্ট আর্থার সহ লিয়াওটুং উপত্যকা চীনকে প্রত্যর্পণ করিল। রাশিয়ার উপর জাপান মর্ম্মান্তিকভাবে চটিল। জাপান ও রাশিয়ার বিরোধে ইংলণ্ড চুপ করিয়া রহিল; জাপানের বিরুদ্ধে গেল না। ভবিষ্যতের ইঙ্গ-জাপানী মিত্রতার এইখানেই সূত্রপাত।

চীনে বৈদেশিক ঋণের প্রতিক্রিয়া

বৈদেশিক ঋণ একটা স্বাধীন দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে, এইবার চীনে সুরু হইল সেই ইতিহাস। জাপানকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার জন্য

চীনকে বৈদেশিক ঋণ তুলিতে হইল। প্রথম ঋণ দিল ফ্রান্স এবং রাশিয়া। বিনিময়ে ফ্রান্স টংকিং সীমান্ত বাড়াইয়া লইল, চীনের ইউনান, কোয়াংসি এবং কোয়াংটুং প্রদেশে খনিজ দ্রব্য তুলিবার লীজ নিল, আনাম রেলওয়ে চীনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল এবং নূতন বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আদায় করিল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অনেক সুবিধা পাইল, মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়া ভ্লাডিভষ্টক পর্যন্ত ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেল লাইন প্রসারের এবং যুদ্ধ বাধিলে পোর্ট আর্থার এবং কিয়াও চু বন্দর দুটিতে নৌঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি নিল। ইংলণ্ড দেখিল ফ্রান্স এবং রাশিয়া চীনের উত্তর এবং দক্ষিণে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিল। জাপানের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি হস্তক্ষেপ ব্যাপারে জার্মেনী ছিল। ভাগ পাইল না বলিয়া জার্মেনী অসন্তুষ্ট হইল।

১৮৫৭ সালে শানটুং-এ দুইজন জর্মান মিশনারী নিহত হইলেন। এইবার জার্মেনীর সুযোগ আসিল। জার্মেনী কিয়াওচৌ উপত্যকা দখল করিল। সন্ধি হইল। কিয়াওচৌ জার্মেনীকে ৯৯ বৎসরের জন্য লীজ দেওয়া হইল; এই সময়ের মধ্যে ঐ উপত্যকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জার্মেনীর থাকিবে। শানটুং-এ দুইটি রেলপথ নির্মাণের অনুমতি মিলিল এবং ঐ এলাকার বিদেশীর সাহায্যে কোন কিছু করিতে হইলে জার্মেনীকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

ঐ বৎসরেরই শেষের দিকে রাশিয়া রব তুলিল, ইংলণ্ড পোর্ট আর্থার অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া পোর্ট আর্থার অধিকার করিল এবং উহা দখলে রাখিবার জন্য লীজ চাহিল। জার্মেনীর নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী লীজের সুবিধা অন্যেরা শিখিয়া লইল। চীন পোর্ট আর্থার লীজ দিতে বাধ্য হইল। লীজের সর্ত হইল—পোর্ট আর্থারে চীনা এবং রাশিয়ান ছাড়া আর কোন জাহাজ ঢুকিতে পারিবে না। রেলওয়ে সম্বন্ধে রাশিয়া আরও কতকগুলি সুবিধা আদায় করিল।

ফ্রান্স কোয়াং চোয়ান লীজ চাহিল এবং টংকিং হইতে ইউনান পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের অনুমতি দাবী করিল। ফ্রান্স এইবার আর এক বুদ্ধির খেলা দেখাইল। চীনা পোষ্ট আফিসের প্রধান পরিচালক পদে একজন

ফরাসীকে নিযুক্ত করিতে হইবে, ফ্রান্স এই দাবী জানাইল। ১৮৯৮ সালে ফ্রান্সের সমস্ত দাবী চীন মানিয়া নিল।

ইংলণ্ড হংকং-এর সীমানা বাড়াইতে চাহিল এবং দাবী করিল পোর্ট আর্থার যতদিন রাশিয়ার হাতে থাকিবে, ততদিনের জন্য তাহাকে ওয়েই হেই ওয়েই বন্দর লীজ দিতে হইবে। ইংলণ্ডের আসল লক্ষ্য রাশিয়া ইহা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিও ইংলণ্ডের অবিশ্বাস প্রকাশ পাইল। ফ্রান্স চীনের পোষ্টঅফিস দখল করিয়াছে। ইংলণ্ড দাবী করিল যতদিন চীনে ইংরেজরা ব্যবসা করিবে ততদিন চীনা শুল্ক বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে ইংরেজ নিযুক্ত করিতে হইবে।

ইতালিও আসিয়া একটা নৌ ঘাঁটি দাবী করিল। তাহার দাবী কেহ সমর্থন করিল না এই কারণে যে চীনে কোন ইতালিয়ান মিশনারী নিহত হয় নাই। ইতালি সরিয়া গেল।

ইহাই শেষ নয়। ইউরোপীয় শক্তিরা চীনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে দাগ দিয়া নিজের প্রভাবাধীন অঞ্চল (Spheres of influence) বলিয়া অভিহিত করিল। ফ্রান্স নিল হাইনান প্রদেশ এবং টংকিং-এর নিকটবর্ত্তী এলাকা, ইংলণ্ড নিল ইয়াংসি উপত্যকা, জার্ম্মেণী শানটুং, জাপান ফু কিয়েন এবং রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চীনা তুর্কিস্থান।

রেল নির্ম্মাণ প্রতিযোগিতা ও বিদেশী অধিকার

এত বিস্তৃত প্রভাবাধীন অঞ্চল হাতে রাখিতে রেলপথ দরকার। সুরু হইল রেল নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জার্ম্মেণী রেল নির্ম্মাণের কনসেশন আগেই আদায় করিয়াছে। এইবার পাল্লা দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সুরু হইল। পিকিং-হ্যাঙ্কাউ রেলওয়ে নির্ম্মাণ নিয়া লাগিল বিরোধ। এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে ইয়াংসি ভ্যালি এবং চীনের রাজধানীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইবে। ইংলণ্ড আমেরিকা এবং বেলজিয়াম এই রেল নির্ম্মাণের অনুমতি চাহিল। বেলজিয়ামকে সমর্থন করিল ফ্রান্স এবং

রাশিয়া। অনুমতি পাইল বেলজিয়াম। ইংলণ্ড চটিয়া আরও কতকগুলি জায়গায় রেলপথ নির্ম্মাণ এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের অধিকার আদায় করিল। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী সকলেই আরও কিছু কিছু আদায় করিল। চীনের অবস্থা হইল—

(১) সমস্ত বৃহৎ দুর্গ বিদেশীরা কাড়িয়া নিয়াছে,

(২) বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক শুল্ক আদায় ব্যবস্থা বিদেশীর হাতে চলিয়া গিয়াছে,

(৩) রাজকোষ এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা বিদেশীর হাতে পড়িতেছে,

(৪) দেশের সমস্ত রেলপথ বিদেশীর টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বিদেশীর দ্বারা চালিত হইতেছে।

কার্য্যতঃ তখন চীন মহাদেশ ইউবোপীয় শক্তিরা ভাগ করিয়া নিয়াছে। চীনেব সার্ব্বভৌমত্ব বলিয়া আর কিছু তখন অবশিষ্ট নাই।

চীনে আমেরিকাব আগমন

তিনটি ঘটনা চীনকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিল—খোলা দরজা (Open door) নীতি, বক্সার বিদ্রোহ এবং ইঙ্গ-জাপান সন্ধি।

চীনের একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অতিশয় ভদ্র দেশ। পরে অবশ্য তাহার এই ধারণা বদলাইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধের পর জাপানের শানটুং অধিকার যখন আমেরিকা সমর্থন করিল তখন চীন বুঝিল সব শ্বেতাঙ্গই সমান। ১৮১৪ সালে আমেরিকা চীনে বাণিজ্য শুরু করিল। অবাধ বাণিজ্যের অধিকার অন্যদের মত সে-ও আদায় করিল। ১৮৭১ সালে কোরিয়ায় আমেরিকান জাহাজ ঢুকিতে দিতে বাধ্য করিল। খাস চীনে আমেরিকা জোর খাটায় নাই। প্রভাবাধীন অঞ্চল গঠনেও চেষ্টা করে নাই। ইহাতেই চীন বিশ্বাস করিয়াছিল আমেরিকা ব্যবসা ছাড়া আর কিছু চায় না। ১৮৯৮-এ আমেরিকা স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে ফিলিপিন লাভ করিল। দেশের বাহিরে

আমেরিকার এই প্রথম ভূখণ্ড অধিকার। এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের পর আমেরিকা এশিয়ায় ঢুকিল এবং চীন ও জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এলাকার মধ্যে মাথা গলাইল। অন্য শক্তিরা আমেরিকার ফিলিপিন দখল সুনজরে দেখিল না। দেশের জনমতের এক বৃহৎ অংশও আমেরিকান রিপাবলিকের এই সাম্রাজ্য গঠন সমর্থন করিল না।

১৮৯৯ সালে আমেরিকা লণ্ডন, বার্লিন, সেণ্টপিটার্সবুর্গ, রোম, প্যারিস টোকিওতে নোট পাঠাইল যে চীনের বাণিজ্যে সব দেশের সমান অধিকার থাকিবে, শুল্ক এবং বন্দর চার্জ্জ সকলের বেলায় সমান হইবে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না, সন্ধিপত্রে নির্দ্দিষ্ট শুল্ক এবং চীন গবর্ণমেণ্টের শুল্ক আদায়ের অধিকার সকলে মানিয়া লইবে। সকলের প্রভাবাধীন অঞ্চলে সকলের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার থাকিবে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক শুল্ক বসাইবে না। ইহাই "খোলা দরজা" নীতি। যে সব দরজা খোলা থাকিবে তাহা চীনের নয়, বিভিন্ন শক্তির দরজা। এতদিন তাহারা চীনকে তার দরজা খুলিতে বাধ্য করিয়াছে এবং এখন একজনের দরজা আর একজন বন্ধ করিতেছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ, অতএব ইয়াংসি উপত্যকায় রাশিয়ার পণ্যের উপর চড়া শুল্ক; দাম বেশী, সুতরাং রাশিয়ান পণ্য এখানে বিক্রয় হইবে না। রাশিয়া পাণ্টা জবাব দিল মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ায় বৃটিশ পণ্যের উপর বৰ্দ্ধিত শুল্কে। পরস্পরের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিরা এবং জাপান তখন এই রেষারেষিই চালাইয়াছে। খোলা দরজা নীতিতে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সুবিধা কারণ তাহাদের শিল্প সবচেয়ে উন্নত, তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্য সবচেয়ে সস্তা। শুল্ক সকলের বেলায় সমান হইলে এই দুই দেশের পণ্য বেশী বিক্রয় হইবে কারণ বৃটিশ এবং আমেরিকান মাল হইবে সকলের চেয়ে সস্তা। আমেরিকার খোলা দরজা নীতিতে চীনের খুব সুবিধা হইল কারণ ইহাতে চীনের অখণ্ডতা স্বীকৃত হইল। যে যার প্রভাবাধীন অঞ্চলে খুসীমত চলিবার যে ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তার অপরিহার্য্য পরিণতি ছিল বিভিন্ন শক্তির মধ্যে চীন বিভাগ। খোলা দরজা নীতির ফলে চীন এই ভয়াবহ

পরিণতি হইতে বাঁচিয়া গেল। রাশিয়া ছাড়া সকলেই আমেরিকান প্রস্তাব মানিয়া নিয়া নোটের জবাব দিল।

বক্সার বিদ্রোহ

১৯০০ সালে বাধিল বক্সার বিদ্রোহ। বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী বিতাড়ন। ইউরোপীয়দের উপর চীনা জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। মাঞ্চু রাজাদের দুর্ব্বলতার জন্য ইউরোপীয়েরা প্রশ্রয় পাইয়া সমগ্র দেশ গ্রাস করিতেছে, এই ধারণাও লোকের মনে জন্মিয়াছে। মাঞ্চু বংশ চীনের নিজস্ব রাজ বংশও নহে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা চীন জয় করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছে। চীন সিংহাসনে ছিলেন বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ৎসে হ্‌সি। তখনকার যুগে তাঁর মত রাজনৈতিক বুদ্ধি খুব কম লোকের ছিল। মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে চীনা জনসাধারণের অসন্তোষ যাহাতে ফাটিয়া না পড়ে তার জন্য তিনিই বিদ্রোহীদের বিদেশী বিতাড়ন সংগ্রামে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের পর হইতে চীনারা মিশনারীদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছিল। ইহাদিগকে তাহারা রাজনৈতিক জবরদখলের অগ্রদূত মনে করিত এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিত। মিশনারীরা চীনা শিশুদের হরণ করিয়া হত্যা করে এমনি একটা অভিযোগ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

চীনাদের আক্রোশ শুধু যে ব্যক্তিগত ভাবে ইউরোপীয়দের উপর জন্মিয়াছিল তাহা নহে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উপরেই তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। সম্রাট কোয়াং-সু চীনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, মাঞ্চু বংশের রাগের ইহাও একটি কারণ। জাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণ করিবার ফলেই উহার খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। টেলিগ্রাফ এবং রেলওয়ের উপযোগিতা দেখিয়া চীন কিছুটা নরম হইয়াছিল কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য সভ্যতা মানিতে চাহে নাই।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান চীনাদের মনে খুব আঘাত দিয়াছিল। একদল তরুণ চীনা বুঝিল জাপানের মত চীনকেও পাশ্চাত্ত্য

সভ্যতা গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশী বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া গেল। পাশ্চাত্ত্য কায়দায় স্কুল খোলা আরম্ভ হইল। বিদেশী বইয়ের চীনা অনুবাদ সুরু হইল। জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চীনা ছাত্রদের বিদেশ যাত্রায় উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। পিকিং-এর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় হাজার ভদ্রবংশীয় ছাত্র পড়িতে গেল। মাথায় লম্বা বেণী রাখা চীনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উহা কাটিয়া ফেলিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। তরুণ সম্রাট কোয়াং-সু এই তরুণ চীন আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়াই চীনের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণে সাহায্য করিতে নামিয়াছিলেন।

চীনের কায়েমী স্বার্থবাদী এবং গোঁড়াদের মধ্যে তরুণ চীন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যত কুসংস্কার এবং রক্ষণশীল মনোভাব ইহারা জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বিদেশীদের বিরুদ্ধে ইহারা রব তুলিল,—চীনাদের সমাধিভূমির উপর দিয়া রেল লাইন নিয়া বিদেশীরা চীনাদের ধর্ম্মে আঘাত করিয়াছে।

সম্রাজ্ঞী ৎসে হ্‌সি ছিলেন নাবালক সম্রাট কোয়াং-সুর অভিভাবিকা। কোয়াং-সু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ঝুঁকিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের দিকে। সম্রাজ্ঞী রহিলেন প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে। সম্রাজ্ঞী একদিন বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখল করিলেন, তাঁহার অভিভাবকত্ব পুনরায় স্বীকার করিয়া তরুণ সম্রাটকে ঘোষণা প্রচার করিতে বাধ্য করিলেন। সম্রাজ্ঞী সংস্কার চেষ্টায় বাধা দিলেন কিন্তু বিদেশী বিরোধী আন্দোলনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তরুণ চীন দলের সমস্ত সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, তাহারা যে সব পত্রিকা বাহির করিয়াছিল তাহা বন্ধ হইল, সম্রাট যে সমস্ত ঘোষণাপত্র জারী করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহৃত হইল।

বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ভীষণ বাড়িয়া গেল। চীনারা বলিতে লাগিল —অস্ত্র না থাকিলেও ক্ষতি নাই, লাঠি, খন্তা, কোদাল, শাবল যাহা হাতের কাছে পাইবে তাহা দিয়াই বিদেশী ঠেঙ্গাইবে; তাহাও না জুটিলে ঘুষি সম্বল করিয়াই সংগ্রামে নামিবে। ইতিমধ্যে চীনে বহু সংখ্যক গুপ্ত সমিতি গড়িয়া

উঠিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী ঠিকই বুঝিয়াছিলেন বিপ্লবের যে বন্যা আসিতেছে তাহা সমগ্রভাবে বিদেশীদের বিরুদ্ধে চালাইয়া দিতে না পারিলে ঐ ধাক্কায় মাঞ্চু বংশও উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। তাঁহার কৌশলে বক্সার বিদ্রোহের শ্লোগান দাঁড়াইয়া গেল—বিদেশী তাড়াও, রাজবংশ বাঁচাও।

যত্র তত্র বিদেশী ঠেঙ্গানো সুরু হইয়া গেল। ইউরোপীয়েরা প্রতিবাদ করিল। চীন গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু কিছুই করিল না। ১৯০০ সালের জুন এবং জুলাই মাস ধরিয়া বেপরোয়া বিদেশী হত্যা, বিদেশী সম্পত্তি লুঠ ও গৃহদাহ চলিতে লাগিল। সৈন্যেরা বক্সারদের সঙ্গে যোগ দিল। মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। শুধু বিদেশী নয়, যে সমস্ত চীনা খৃষ্টান হইয়াছিল তাহারাও আক্রান্ত হইল। জর্মান এবং জাপানী রাজদূত নিহত হইলেন। পিকিং-এর সমস্ত বিদেশী যে যার দূতাবাসে আশ্রয় নিল। চীনা জনতা দূতাবাস ঘেরাও করিয়া রাখিল যাহাতে কোনরূপ খাদ্য বা সাহায্য দূতাবাসে ঢুকিতে না পারে। তার উপর চলিল আক্রমণ। ছয় সপ্তাহ বিদেশীরা কোনমতে আত্মরক্ষা করিল। খাদ্য এবং গুলিবারুদ শেষ হইয়া আসিল। আর আত্মরক্ষা চলে না, এমনি সময় এক আন্তর্জাতিক বাহিনী আসিয়া বিদেশীদের রক্ষা করিল। এই বাহিনীতে বৃটিশ, রাশিয়ান, ফরাসী, জর্মান, ইতালিয়ান,আমেরিকান এবং জাপানী—এই সাত জাতির সৈন্য ছিল।

এইবার সুরু হইল প্রতিশোধ গ্রহণ। মন্ত্রী পরিষদ সহ সম্রাজ্ঞী পিকিং হইতে পলায়ন করিলেন। বিদেশী বিতাড়ন তো হইলই না, এই বিদ্রোহ অবসানে চীন আরও অসহায় ভাবে বিদেশীর কবলে পড়িয়া গেল। ইউরোপীয় শক্তিরা চীন বিভাগের জন্য প্রস্তুত হইল। বাধা দিল আমেরিকা। আমেরিকা জানাইল চীনের অখণ্ডতা নষ্ট হইতে সে দিবে না। খোলা দরজা নীতি বজায় রাখিতেই হইবে। ইংলণ্ড এবং জার্মেনীও এই মর্মে এক চুক্তি করিল যে অবাধ বাণিজ্য এবং খোলা দরজা মানিয়া চলিবে, চীনের কোন অংশ কেহ গ্রাস করিবে না, অন্যে গ্রাস করিতে আসিলে বাধা দিবে। চীন বিভাগের সিদ্ধান্ত করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ হইত না। তাহাতে বহু

জটিলতা দেখা দিত। বিশেষভাবে আমেরিকা এবং জাপান কি পাইবে তাহা নিয়াই প্রচণ্ড মতভেদের সম্ভাবনা ছিল। চীন বিভাগ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মধ্যে মতৈক্য হইল না, অনেকটা এই কারণে চীনের অখণ্ডতা বাঁচিয়া গেল।

বক্সার বিদ্রোহের খেসারৎ

অখণ্ডতা বাঁচিল বটে তবে চীনের খেসারৎ দিতে হইল বিস্তর। শুধু জর্ম্মান ও জাপানী দূতের হত্যার ক্ষতিপূরণই দিতে হইল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ তখনকার বিনিময় হারে ৬৭ কোটি টাকা। ইহার উপর সাধারণ ক্ষতিপূরণ আরও দিতে হইল। ক্ষতিপূরণের টাকা যাহাতে নিয়মিত আদায় হয় তার জন্য চীনের শুল্ক বিভাগ বন্ধক পড়িল। উত্তর চীনে, বিদেশী দূতাবাস সমুহে এবং পিকিং-তিয়েনৎসিন রেলের পাহারায় বিদেশী সৈন্য মানিয়া নিতে হইল। চীনের ৎসুংলি-ইয়ামেন বা বৈদেশিক আফিস বিদেশীদের নির্দ্দেশে পুনর্গঠিত হইল।

রাশিয়া কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার

ইঙ্গ-জর্ম্মান চুক্তিতে রাশিয়া চটিল। পঞ্চাশ বছর ধরিয়া রাশিয়া চীনে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। চীনের বন্ধু সাজিয়া মাঞ্চুরিয়া, বহির্মঙ্গোলিয়া এবং পূর্ব্ব তুর্কীস্থান গ্রাস করিয়াছে, আমুর নদীতীর ধরিয়া কোরিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে। জাপানকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাহাকে ঠেকাইবার জন্য লিয়াংটুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার অধিকার করিয়াছে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে প্রসারিত করিয়া ভ্লাডিভষ্টক এবং পোর্ট আর্থারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়াছে। চীন রাজদরবারে সমস্ত বিদেশীর মধ্যে রাশিয়ার খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী। বক্সার বিদ্রোহের হাঙ্গামার মধ্যে আরও কিছু গুছাইয়া নেওয়ার চেষ্টায় হাত দিতে না দিতে চীনের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ইঙ্গ-জর্ম্মান চুক্তি বাধা হইয়া দাঁড়াইল। রাশিয়া কি করে ভাবিতেছে—এমন সময় চীনে এক রাশিয়ান বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন ঘটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া উহা পাকাপাকিভাবে

অধিকার করিল। আগে মাঞ্চুরিয়া তার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারে ছিল না, উহা ছিল তার প্রভাবাধীন অঞ্চল।

ইঙ্গ-জাপান সন্ধি

রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া দখলে ইংলণ্ড ও জাপান দুজনেই শঙ্কিত হইল। ইহারই ফল ১৯০২ সালের ইঙ্গ-জাপান সন্ধি। সন্ধির সর্ত্ত হইল—দুজনেই খোলা দরজা নীতি মানিয়া চলিবে এবং ইহাদের যে কোন একজন যদি দুইটি দেশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তবে অন্যজন তার সাহায্যে আসিবে। এই সন্ধি বলেই ইংলণ্ড জাপানের কোরিয়া দখল সমর্থন করে এবং জাপান তার সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে জোর পায়। রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ অনিবার্য্য ইহা বুঝা গিয়াছিল। ইঙ্গ-জাপান সন্ধির ফলে এই সংঘর্ষ রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইল। রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স জুটিলেই জাপানের পক্ষে ইংলণ্ড নামিবে—এই ভীতি ফ্রান্সের সামনে প্রথমেই তুলিয়া ধরা হইল। ফলে সমুদ্রে জাপানের প্রভাব অপ্রতিহত হইল।

বিপদ বুঝিয়া রাশিয়া এইবার কিছুটা সংযত হইল। মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া নিল। কিন্তু ঐ সঙ্গে জাপানের কাছে দাবী জানাইল যে মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়া ছাড়া আর কোন দেশ শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারিবে না। একদিকে রাশিয়া অপরদিকে অন্য সব শক্তি, মাঝখানে পড়িয়া চীন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্য শক্তিরা রাশিয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। এই যুদ্ধের ইতিহাস পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

চীনে সংস্কার চেষ্টা

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব চীনের উপর দুই দিক দিয়া পড়িল। একদিকে পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা বুঝিল জাপানের সঙ্গে সংঘর্ষে নামিয়া লাভ নাই, বরং উহার সঙ্গে বখরায় সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চালানোই লাভজনক। অপরদিকে জাপানের জয় চীনে নবজাগরণ আনয়ন করিল।

চীনে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের প্রথম প্রতিবাদ হইয়াছিল বক্সার বিদ্রোহ, দ্বিতীয় প্রতিবাদ হইল চীন বিপ্লব। অভিভাবিকা সম্রাজ্ঞী ৎসে-হ্‌সি বক্সার বিদ্রোহে প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর তিনি লক্ষ্য করিলেন প্রগতিশীল আন্দোলন অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। আবার সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া উঠিতেছে। এইবার সম্রাজ্ঞী প্রগতিশীলদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

সম্রাজ্ঞী সংস্কার চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিলেন এবং বিদেশীদের সন্তুষ্ট করিবার দিকেও মন দিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণের জন্য কয়েকটি আইনও তিনি অনুমোদন করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে স্কুল স্থাপন আরম্ভ হইল এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান স্কুলের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। চীনের অতি প্রাচীন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়া গেল। হাজার হাজার নূতন ধরণের স্কুল বসানো হইল। ১৯১০ সালে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩২,১৯০ এবং ছাত্র সংখ্যা ৮৭৫,৭৬০। হাজার হাজার ছাত্র জাপানে এবং শত শত আমেরিকা ও ইউরোপে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের জন্য যাইতে আরম্ভ করিল। ১৯০৮ সালে আমেরিকা ঘোষণা করিল যে বক্সার ক্ষতিপূরণের টাকার একটা অংশ তাহারা চীনকে ফেরৎ দিবে। ঐ টাকাটা চীনের ছাত্রদের আমেরিকা গিয়া পড়ার ছাত্রবৃত্তির জন্য জমা রাখা হইল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে চীনে ছাপাখানা, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি খুব বাড়িয়া গেল।

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সৈন্যদল সংগঠনের দিকেও মন দেওয়া হইল। পাশ্চাত্ত্য কায়দায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখানো আরম্ভ হইল। আগে ছিল প্রাদেশিক বাহিনী, এবার জাতীয় সৈন্যদল গঠিত হইতে লাগিল।

১৯১০ সালে ক্রীতদাস প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল। আফিম ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা সুরু হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি হইল যে

তাহারা আফিম আমদানী বন্ধ করিবে এই সর্ত্তে যে চীন দেশে আফিমের চাষ বন্ধ করিতে হইবে। চীন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজী হইল এবং আফিম চাষ এত দ্রুত কমিতে লাগিল যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯১১ সালে আফিম ব্যবসা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিল।

আইন এবং বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা হইল কিন্তু উহা সফল হইল না। কেবলমাত্র কয়েকটি শাস্তির নিষ্ঠুর পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়া হইল। মুদ্রা সংস্কার চেষ্টাও সফল হইল না। নূতন এবং পুরাণো মুদ্রায় মিলিয়া এক বিষম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইল।

সর্ব্বপ্রধান সংস্কার হইল নির্ব্বাচিত আইন সভা স্থাপন। ১৯০৫ সালে পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি বুঝিয়া আসিবার জন্য বিদেশে মিশন পাঠানো হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে চীনে পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে ঘোষণা করা হইল যে নয় বৎসরের মধ্যে পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে। নবেম্বর মাসে সম্রাট এবং রাজ মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইল। নূতন সম্রাটের বয়স আড়াই বৎসর। সম্রাটের পিতা প্রিন্স চুন রিজেণ্ট হইলেন।

১৯০৯ সালে প্রাদেশিক আইন সভা বসিল। অল্প লোকের ভোটে উহা গঠিত হইল। ১৯১০ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় আইন সভা গঠিত হইল। উহার অর্দ্ধেক সদস্য হইলেন নির্ব্বাচিত, অর্দ্ধেক মনোনীত। কেন্দ্রীয় আইন সভা আইন প্রণয়নের অধিকার চাহিল। ১৯১৩ সাল হইতে উহাকে আইন তৈরির অধিকার দেওয়া হইবে—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

শিক্ষা এবং শাসন সংস্কারের সঙ্গে আরও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল। অনেক রেলপথ তৈরী হইল। উপকূলে জাহাজী বাণিজ্য বাড়িল। টেলিগ্রাফ লাইন এবং পোষ্টাফিসের সংখ্যা অনেক বাড়িল। বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়িয়া দ্বিগুণ হইল। সেই সঙ্গে খৃষ্টান মিশনারীদের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলে।

চীন বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে চীনে বিপ্লব প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল। দক্ষিণ চীনে বহু গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৮৬-তে কুড়ি বৎসর বয়স্ক যুবক সান ইয়াৎ সেন একটি গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেন। ১৮৯২-তে তিনি ডাক্তারী পাশ করিলেন। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ৭০ জন যুবককে সঙ্গে নিয়া একটি বড় গুপ্ত সমিতি গঠন করিলেন। উদ্দেশ্য হইল বিপ্লবান্দোলনের সাহায্যে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৫-তে চীন-জাপান যুদ্ধের পর ডাঃ সান চীন পুনর্জ্জীবন সমিতি নামে এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করিলেন। মাঞ্চু রাজা তাঁহার তিনজন সহকর্ম্মীকে ধরিয়া শিরচ্ছেদ করিলেন। এই সমিতির প্রধান ঘাঁটি হইল সাংঘাই। ১৫ জন করিয়া সদস্য নিয়া সারা চীনে ইহারা 'সেল' গড়িয়া তুলিতে লাগিল। সাংঘাই এবং অন্যান্য স্থানের ধনী ব্যবসায়ীরা ডাঃ সানকে মুক্ত হস্তে টাকা দিতে লাগিলেন।

চীন পুনর্গঠন সমিতির প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা হইল ক্যাণ্টনে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল। ডাঃ সান জাপানে পলায়ন করিলেন। সেখানে গিয়া টিকি কাটিয়া ফেলিলেন, ইউরোপীয় পোষাক ধরিলেন এবং নিজেকে জাপানী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর মাঞ্চু বংশ উচ্ছেদের জন্য চীনে কতকগুলি বিপ্লব প্রচেষ্টা হইল। ডাঃ সান তাহা জাপান হইতে চালাইলেন। দশ বার বিদ্রোহ হইল। ডাঃ সান ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়া সেখানকার চীনা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আরও টাকা আনিলেন। ফিলাডেলফিয়ার এক চীনা লণ্ড্রিওয়ালা একটি ব্যাগে করিয়া তার সারা জীবনের সঞ্চয় ডাঃ সানের হাতে দিয়া দেয়।

মাঞ্চু রাজা ডাঃ সানের মাথার দাম বসাইলেন ৫ লক্ষ ডলার। যে তাঁহাকে জীবিত ধরিয়া দিবে সে এই টাকা পাইবে। মুচীর ছদ্মবেশে ডাঃ সান সারা চীনে গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁর জলন্ত স্বদেশ প্রেম মানুষকে এত মুগ্ধ করিত যে কোন সরকারী গোয়েন্দা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেও গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিত না।

১৯০৫-এ ডাঃ সান চীনের সমস্ত মাঞ্চু বিরোধী এবং প্রজাতন্ত্রকামী শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। তুং মেং হুই নামে নূতন সংগঠন তৈরি হইল। ডাঃ সানের মত এত দক্ষ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈপ্লবিক সংগঠনকর্ত্তা সারা বিশ্বে কমই জন্মিয়াছে। বিপ্লবোত্তর গঠনের কাজে বিপ্লবী যুবকেরা যাহাতে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারে তার জন্য তিনি অনেক যুবককে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকা পাঠাইয়া দিতেন।

একদিকে যেমন চীনের বিপ্লবী শক্তি ডাঃ সানের নেতৃত্বে সুগঠিত হইতেছিল, অপরদিকে তেমনি সমস্ত বিপ্লব বিরোধী শক্তি আশ্রয় করিয়াছিল উয়ান শি কাইকে। ১৯১১-তে ডাঃ সানের বয়স ৪৫, উয়ান শি কাইয়ের ৫২। উয়ান শি কাই সাম্রাজ্ঞীর বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁর আমলে তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর রিজেণ্ট আসিয়া প্রথমেই তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন। রিজেণ্টের ভ্রাতা যখন সম্রাট ছিলেন তখন উয়ান শি কাই তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, রিজেণ্ট প্রিন্স চুন ইহা ভোলেন নাই। তিনি ক্ষমতার অধিকারী হইয়াই উয়ানকে তাড়াইলেন। তবে মনের কথা বলিলেন না। উয়ান শি কাইকে সরাইবার কারণ বলা হইল—তাঁর পায়ে রোগ হইয়াছে, ইহা নিয়া তাঁর পক্ষে কাজ করা অসম্ভব, তাই তাঁহাকে বাড়ীতে থাকিবার জন্য অবসর দেওয়া হইল।

১০ই অক্টোবর ১৯১১ তারিখে হ্যাঙ্কাউ সহরে এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াংসি নদীতীরের নিকট তিনটি বৃহত্তম সহর হ্যাঙ্কাউ, উচাউ এবং হানইয়াং-এ বিদ্রোহ সুরু হইয়া গেল। রিজেণ্ট প্রিন্স চুন ভয় পাইয়া উয়ান শি কাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উয়ান জবাব দিলেন—পায়ের যে অসুখের জন্য তিন বছর আগে তাহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল সেই রোগ এখনও সারে নাই। ১লা নবেম্বর রিজেণ্ট উয়ানকে প্রধানমন্ত্রী করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উয়ান আসিয়া সৈন্যদল এবং গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

উয়ান আসিয়া যে চণ্ডনীতি চালাইতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে জনমত আরও ক্ষেপিয়া গেল। চীনের ১৮টি প্রদেশেই সমানভাবে প্রজাতন্ত্রের দাবী

উঠিতে লাগিল। বৎসর শেষ হইবার আগেই ১৬টি প্রদেশ ঘোষণা করিল তাহারা মাঞ্চু শাসন মানিবে না, প্রজাতন্ত্র চাই। মাঞ্চু সমর্থকদের ঘাঁটি হইল উত্তর চীনে পিকিং, প্রজাতন্ত্রীদের দক্ষিণ চীনে ক্যাণ্টন।

বিদ্রোহ থামিল না। ২রা ডিসেম্বর নানকিং সহরের সৈন্যদল রিপাবলিকানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। বিপ্লবীরা নানকিং সহরকে প্রজাতন্ত্রী চীনের রাজধানী ঘোষণা করিল। ৬ই ডিসেম্বর রিজেণ্ট প্রিন্স চুন পদত্যাগ করিলেন। ১১ই ডিসেম্বর উয়ান শি কাই যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর সান ইয়াৎ সেন সাংঘাই সহরে অবতরণ করিলেন এবং নানকিং অভিমুখে রওনা হইলেন। নানকিং-এ চীনের ১৮টি প্রদেশের মধ্যে ১৪টির বিপ্লবী প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়াছিলেন। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে তাঁহারা চীনা প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ তারিখে বালক সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করা হইল। উয়ান শি কাইকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। দেশের ঐক্যের জন্য ডাঃ সান পদত্যাগ করিলেন এবং উয়ান শি কাই তাঁহার স্থলে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে নানকিং পার্লামেণ্ট একটি অস্থায়ী সংবিধান ঘোষণা করিল। এপ্রিলে প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের রাজধানী নানকিং হইতে পিকিং-এ স্থানান্তরিত হইল।

ডাঃ সান যে ঐক্যের জন্য এত বড় স্বার্থত্যাগ করিলেন সেই ঐক্য কিন্তু হইল না। উত্তর ও দক্ষিণ চীনে প্রচণ্ড বিরোধ সুরু হইল। ঐক্য না হওয়ার তিনটি কারণ ছিল—

(১) প্রত্যেক রাজবংশ পতনের পর গৃহযুদ্ধ হইয়াছে। সামরিক লর্ডেরা শাসন ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা চীনে অনুপ্রবেশের সঙ্গে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে কতকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।

(৩) বিদেশী হস্তক্ষেপে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়াছে। জাপান সব সময়েই চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

উয়ান শি কাই প্রেসিডেণ্ট হইয়া বিপ্লব বিরোধী পথ ধরিলেন। তিনি নিজে সম্রাট হইয়া নূতন রাজবংশ স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রজাতন্ত্রীরা তাঁহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। ১৯১২ সালের আগষ্ট মাসে প্রজাতন্ত্রীরা কুওমিনটাং পার্টি গঠন করিল। তাহারা দাবী করিল যে শাসন ক্ষমতা দিতে হইবে পার্লামেণ্টকে, প্রেসিডেণ্টের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। অন্যান্য সামরিক লর্ডরাও এই সুযোগে মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করিলেন। আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এই অবস্থাতেও উয়ান শি কাই প্রথম দিকে সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিলেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, জাপান এবং রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিলেন। ইহারা যৌথভাবে টাকাটা দিল এবং চীনের রাজস্ব ইহাদের নিকট বন্ধক রহিল। এই টাকার জোরে উয়ান কুওমিনটাংকে অগ্রাহ্য করিতে অগ্রসর হইলেন। কুওমিনটাং এই ঋণ গ্রহণে বাধা দিতে লাগিল। সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে উয়ানের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নানকিং অধিকার করিলেন। উয়ান কুওমিনটাংকে বেআইনি ঘোষণা করিলেন এবং পার্লামেণ্ট হইতে কুওমিনটাং সদস্যদের বিতাড়িত করিলেন। ১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি পার্লামেণ্টের বাকি অংশও ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তৎস্থলে একটি শাসনতান্ত্রিক কাউন্সিল (administrative council) গঠন করিলেন। ১৯১৪ সালের মে মাসে উয়ান এক সংবিধান জারী করিলেন। উহাতে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হইল, তাঁর কার্য্যকাল দশ বৎসর করা হইল, তার পরেও তাঁর পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা রহিল। ১৯১৫ সালে তিনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া উয়ান শি কাইয়ের এই চেষ্টা ভাল চোখে দেখিল না। কুওমিনটাং-ও মরীয়া হইয়া উঠিল। আবার সর্ব্বত্র বিদ্রোহ সুরু হইয়া গেল। উয়ানকে উস্কানি দিল জাপান। জাপানের ২১ দফা দাবী সম্রাট

হওয়ার লোভে তিনি মানিয়া নিলেন। উহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। ৬ই জুন ১৯১৬ তারিখে উয়ানের মৃত্যু হইল।

উয়ানের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অবস্থা অনেক সহজ হইয়া আসিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট লি উয়ান হুং বিনাবাধায় প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

বিপ্লবে চীনের দুইটি বৃহৎ প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বহির্মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত প্রকৃতপক্ষে (Virtual) স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। প্রথমটিকে রাশিয়া এবং দ্বিতীয়টিকে বৃটেন স্বীকার করিয়া হইল। চীনে প্রজাতন্ত্র গঠনে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ বিশেষ আপত্তি করে নাই।

১৯২৫-এ ডাঃ সানের মৃত্যু হইল। কুওমিনটাং-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন চিয়াং কাই শেক। ১৯২৮-এর মধ্যে হ্যাঙ্কাউ, নানকিং, সাংহাই এবং পিকিং-এ কুওমিনটাং-এর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কতকটা জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইল এবং সমস্ত চীন এক শাসনাধীনে আসিল। ডাঃ সানের দুই প্রিয় শিষ্য চিয়াং কাই শেক এবং ওয়াং চিং ওয়েব বিরোধের ফলে এই ঐক্য স্থায়ী হইতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জাপানের অভ্যুদয়

চীনের মত জাপানও ইউরোপীয় বণিক এবং ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বুঝিল, ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিলে আধুনিক যুগের উপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপান সমগ্র দেশ ইউরোপীয় কায়দায় গড়িয়া তুলিতে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করিল। স্পেন, পর্টুগাল এবং নেদারল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাপানে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের পিছন পিছন গিয়াছিল ক্যাথলিক মিশনারীর দল। জাপানীরা প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়াছিল

মিশনারীদের পিছনে আসিবে রাজনৈতিক অভিযান। বিদেশীরা জাপানী আইন কানুনও বিশেষ মানিতে চাহিত না। ১৬৩৭ সালে দুইটি অর্ডিনান্স জারী হইল। প্রথম অর্ডিনান্স চীনা এবং ডাচ ভিন্ন অন্য সব দেশের লোক এবং মিশনারীর জাপান প্রবেশ বন্ধ হইল। ডাচেরা পুরাদস্তুর খৃষ্টান নয় এবং যথেষ্ট বিপজ্জনকও নয়, এই ধারণা হইতেই ইহাদের অর্ডিনান্সের কবল হইতে বাদ দেওয়া হইল। বেআইনী প্রবেশের শাস্তি হইল মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয় অর্ডিনান্সে জাপানীদের বিদেশ যাত্রা বন্ধ হইল। কেহ লুকাইয়া বিদেশ গেলে তাহারও শাস্তি হইল প্রাণদণ্ড। ৫০ টনের বেশী জাহাজ তৈরিও নিষিদ্ধ হইল। দুই শত বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডাচেরা জাপানকে খবর দিল চীনে ইংরেজরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে; জাপান সমুদ্রে রুশ জাহাজ ঘোরাফেরা করিতেছে। ১৮২৫ সালে জাপান এক অর্ডিনান্স জারী করিল। বিদেশী জাহাজ নিজের এলাকায় দেখিবামাত্র তাহাকে গুলি করিবে। প্রথম চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের সংবাদে জাপান চিন্তিত হইল। হলাণ্ড হইতে কিছু কামান আনিয়া দেশ রক্ষার খানিকটা ব্যবস্থা করিল। ইউরোপীয়দের প্রবেশ আটকাইবার সকল ব্যবস্থা সতর্কভাবে পালন করিতে লাগিল।

জাপানকে আঘাত করিল ইউরোপ নয়, আমেরিকা। ওয়াটার্লু যুদ্ধের সঙ্গেই আমেরিকার দৃষ্টি তাহার পশ্চিমে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৪৮ সালে আমেরিকা কালিফোর্ণিয়া এবং সানফ্রান্সিস্কো অধিকার করিল। কালিফোর্ণিয়ার সোণার খনির সংবাদ পাইয়া বহু লোক আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর তীরে ছুটিয়া গেল। ইহাদের দৃষ্টি পড়িল আরও পশ্চিমে জাপানের দিকে। ১৮৪৬ সালে একটি আমেরিকান জাহাজ জাপানী উপকূলে গিয়া বিপদে পড়ে এবং জাপানী বন্দরে আশ্রয় চায়। জাপান তাহাকে বন্দরে ঢুকিতে দেয় নাই। আমেরিকা উপলব্ধি করিল প্রশান্ত মহাসাগরে কোথাও জাহাজ ভিড়াইবার ঘাঁটি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

জাপানে কমোডোর পেরী

১৮৫৩ সালে আমেরিকার নৌবহরের কমোডোর পেরী চারিটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়া টোকিও উপসাগরে প্রবেশ করিলেন এবং জাপানকে অনুরোধ করিলেন তাহারা যেন আমেরিকান জাহাজ বন্দরে ঢুকিতে দেয়। কমোডোর পেরী একটি টেলিগ্রাফ এবং একটি রেলের মডেল সহ একটি চিঠি জাপানী সম্রাটের নামে দিয়া বলিয়া আসিলেন এক বৎসর বাদে তিনি উত্তর নিতে আসিবেন।

এক বৎসর পরে কমোডোর পেরী আসিলেন। এবার সঙ্গে আনিলেন আটটি যুদ্ধ জাহাজ এবং চার হাজার সৈন্য। চিঠির উত্তর তখনও ঠিক হয় নাই। নেতাদের পরামর্শ সভা বসিয়া গেল। একদল বলিলেন,—ইহারা আমাদের ভাল ভাল জিনিষ দেখাইতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের আসল উদ্দেশ্য বাণিজ্য এবং দেশ শোষণ; ইহাদিগকে ঢুকিতে দিলে দেশের লোক দরিদ্র হইয়া পড়িবে। অপর দল বলিলেন,—ইহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ইহাদেরই কলা ও বিজ্ঞান শিখিয়া লওয়া। শেষোক্ত দলই জয়ী হইলেন। আমেরিকার সঙ্গে সন্ধি হইল—দুইটি বন্দরে তাহারা রসদপত্র নিতে ঢুকিতে পারিবে। কিছু কিছু বাণিজ্যের অধিকারও দেওয়া হইল।

ইউরোপীয় দেশসমূহের আগমন

আমেরিকা জাপানে ঢুকিয়াছে এই সংবাদ পাইবা মাত্র অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিও নিজেদের ভাগ আদায়ের জন্য ছুটিয়া আসিল। সকলের আগে আগে ইংলণ্ড আসিয়া সন্ধি করিল। তাহারও বেলায় জাপান বলিল—জাহাজ মেরামত ও রসদপত্রের জন্য বৃটিশ জাহাজ জাপানী বন্দরে ঢুকিতে পারিবে। একে একে ১৫টি দেশ জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিল। ইহাদের একবার বন্দরে প্রবেশাধিকার দেওয়ার পর বাণিজ্য সম্পর্ক জাপান ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। ১৮৬৭ সালে দেখা গেল বিদেশীরা জাপানীদের নিকট হইতে বাণিজ্যের ও বন্দরে অবাধ প্রবেশের অধিকার, নিজেদের আইন খাটাইবার ক্ষমতা, শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা এবং কনসাল ও দূত নিয়োগ এবং তাহাদের জন্য অনেক

সুবিধা আদায় করিয়া নিয়াছে। বিদেশীদের ধর্ম্মাচরণের এবং জাপানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার স্বাধীনতাও বিদেশীরা আদায় করিল। চীনে ইউরোপীয়েরা যাহা করিয়াছিল জাপানেও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটাইল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে জাপান অপমানজনক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হইল।

সমাজ সংস্কার

জাপানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা তখন অত্যন্ত অনগ্রসর। জাতিগত রেষারেষি এবং ফিউডালিজম, সামরিক লর্ডদের হানাহানি অবাধে চলিতেছিল। দামিও নামক জাতির হাতে ছিল শাসন ক্ষমতা। ইহাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। তাহাদের বলিত সামুরাই। জাপ সম্রাট নামেই সম্রাট, একেবারে ক্ষমতাহীন। প্রকৃত শাসক ছিলেন ষেড়ো বা টোকিওর শোগুন। শোগুনের অর্থ সামরিক জেনারেল। নামে তিনি মিকাডো বা সম্রাটের এজেণ্ট কিন্তু কাজে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। সম্রাট তাঁর হাতের পুতুল। বিদেশীদের সঙ্গে সন্ধিপত্রে ইনিই স্বাক্ষর করিতেন।

শোগুন বিদেশীদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন, দেশের এক বৃহৎ অংশ তাঁহাকে সমর্থন কারল, কিন্তু সকলে বিদেশী আগমন মানিয়া নিল না। মাঝে মাঝে বিদেশীদের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। আন্দোলন সুরু হইল—শোগুনকে তাড়াইতে হইবে, সম্রাটের ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। ১৮৬৭ সালে শোগুন বিতাড়িত হইলেন। মিকাডোর পূর্ণ শাসনক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অল্পদিনেই বোঝা গেল মিকাডোর ক্ষমতা আ... বাড়ে নাই। এক উপজাতির বদলে তুই উপজাতির হাতে ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। বিতাড়িত শোগুন ছিলেন তোকুগাওয়া জাতির লোক। মিকাডোকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে মাৎসুমা এব চোসু জাতির নেতারা। আন্দোলন হইল বিদেশী বিতাড়ন এবং বিদেশী সভ্যতা বর্জ্জনের। আন্দোলন সফল হইবার পরই ক্ষমতাশালী তুই জাতির নেতারা দেশে পাশ্চাত্ত্য বহু জিনিষ একের পর এক প্রবর্ত্তন করিতে সুরু করিলেন। জাপান নিজের শিল্পকলা বিসর্জ্জন দিয়া লিথোগ্রাফ

আমদানী করিল। পাঁচতলা প্যাগোডাগুলি পোড়াইয়া ফেলিল। পাশ্চাত্ত্য কায়দায় দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং শিল্প ও বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ফিউডালিজম উঠিয়া গেল।

পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল সংস্কার কার্য্য। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) ফরাসী প্রিফেকচার পদ্ধতিতে প্রদেশ গঠিত হইল,

(২) সামুরাই তুলিয়া দিয়া জর্ম্মান আদর্শে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল,

(৩) বৃটিশ আদর্শে নৌবহর পুনর্গঠিত হইল,

(৪) বৃটিশ আদর্শে শিল্পগঠন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইল,

(৫) রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডক, লাইটহাউস নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল,

(৬) কয়লা খনির কাজ আরম্ভ হইল,

(৭) রেশমের মিল স্থাপিত হইল,

(৮) ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং কমার্স চেম্বার স্থাপিত হইল,

(৯) জাতীয় শিক্ষা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল,

(১০) বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল; সরকারী তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, টেকনিকাল স্কুল স্থাপিত হইল,

(১১) বিদেশী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল,

(১২) স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইল, ইংরেজিকে জাতীয় ভাষা করারও প্রস্তাব হইল,

(১৩) ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বই জাপানী ভাষায় অনুদিত হইতে লাগিল; অসুবিধা ঘটিলে জাপানী ভাষা বদলাইয়া ফেলা হইল,

(১৪) জাপানীদের বিদেশ গমনের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া গেল, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে ছাত্র ও ডেলিগেশন বিদেশে পাঠানো হইল,

(১৫) গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার গৃহীত হইল,

(১৬) জমি জরীপ এবং জমির মূল্য নির্দ্ধারণ সুরু হইল,

(১৭) জমির উপর ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইল.

(১৮) আইন সংস্কার হইল, বিদেশী আইনজ্ঞের সাহায্যে নূতন ফৌজদারী আইন তৈরি হইল।

সব দেশের সংবিধান আছ। ১৮৮৯ সালে জাপানও প্রুশিয়ার আদর্শে নিজের সংবিধান রচনা করিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও অনেকে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

কুড়ি বছরেব মধ্যে জাপানের চেহারা ফিরিয়া গেল। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য বাইরের। আচার ব্যবহার সামাজিকতায় জাপান কিন্তু পূরা দস্তর প্রাচ্য রহিল।

বৈদেশিক সন্ধি পরিবর্ত্তন চেষ্টা

দেশ গড়িয়া তুলিয়া জাপান প্রথমেই মন দিল বিদেশীদের সঙ্গে অপমান-জনক সন্ধিপত্র পরিবর্ত্তনে। প্রথমে ইওয়াকুরার নেতৃত্বে ইউরোপে এক মিশন পাঠাইল। মিশনের উদ্দেশ্য সফল হইল না। জাপান বুঝিল অনুরোধ উপরোধে কাজ হইবে না, বৃহৎ শক্তিদের সঙ্গে সমানভাবে শক্তিশালী হইতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি অসম্ভব। জাপান প্রাণপণে সামরিক সংগঠন সুরু করিল।

জাপান প্রথমে নজর দিল নরম মাটি চীনের দিকে। ১৮৭২ সালে পশ্চিমী শক্তিদের কায়দায় কোরিয়ার বন্দরে জাপানী জাহাজের অবাধ প্রবেশের দাবী জানাইল। চীন অস্বীকার করিলে বন্দরে গোলা চালাইল। দুই বৎসর বাদে ফরমোসা আক্রমণ করিল। সফল হইল না, হটিয়া আসিল। ১৮৭৯ সালে লু চু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিল।

আবার সন্ধিপত্র পরিবর্ত্তনের জন্য ইউরোপীয় শক্তিদের নিকট অনুরোধ জানাইল, আবার প্রত্যাখ্যাত হইল। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ১৮৮৪ সালে সন্ধিপত্র পরিবর্ত্তনের আশ্বাস দিল। জাপান বুঝিল, আরও কিছু সামরিক শক্তি দেখাইতে হইবে। এইবার পরিকল্পনা করিল কোরিয়ায় চীনের ক্ষমতা মুছিয়া ফেলিয়া নিজের শক্তি দেখাইবে।

ইহারই পরিণতি চীন-জাপান যুদ্ধ এবং ১৮৯৫ সালের শিমোনোসেকির সন্ধি। শক্তিমানের সম্মান দিতে বৃহৎ শক্তিরা বাধ্য হইল। অপমানজনক সমস্ত সন্ধি বাতিল হইয়া গেল। বক্সার বিদ্রোহ দমনে জাপান পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের সঙ্গে সমানভাবে সহযোগিতা করেন। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপান সন্ধির পর জাপান ঠিক করিল এইবার ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর শক্তি রাশিয়াকে হারাইয়া সামরিক প্রেষ্টিজ আরও বাড়াইয়া নিতে হইবে।

রুশ-জাপান বিরোধ

ইঙ্গ জাপান সন্ধিতে শঙ্কিত হইয়া রাশিয়া প্রথমটা মাঞ্চুরিয়া হইতে হটিয়া গিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়া আবার পূর্ণোত্তমে মাঞ্চুরিয়ায় ফিরিয়া আসিল। ১৯০৩ সালের আগষ্ট মাসে রাশিয়া এবং পোর্ট আর্থারের মধ্যে সরাসরি রেল চলাচল আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্ব এশিয়ার জন্য একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করিল। ফলে মাঞ্চুরিয়া প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান প্রদেশে পরিণত হইল। কাঠ কাটিবার ছুতা করিয়া রুশ সৈন্য কোরিয়ার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

জাপান এইবার অগ্রসর হইয়া দাবী জানাইল, চীন এবং কোরিয়ার স্বাধীনতা রাশিয়া এবং জাপান উভয়কে স্বীকার করিতে হইবে, উভয়কে খোলা দরজা নীতি এবং কোরিয়ায় জাপানী স্বার্থ ও মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ান স্বার্থ উভয়কে মানিতে হইবে। রাশিয়া জবাব দিল—মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ান স্বার্থ জাপানকে বিনাসর্ত্তে স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু কোরিয়ায় জাপানী স্বার্থ রাশিয়া অনেকটা সর্ত্তাধীনে স্বীকার করিবে। সর্ত্তগুলিও খুব কঠোর রকমের হইল। রাশিয়া ভাবিয়াছিল ইঙ্গ জাপান সন্ধি সত্ত্বেও জাপান যুদ্ধে নামিতে সাহস করিবে না। দুর্ব্বল চীনের সঙ্গে লড়িয়া যে প্রেষ্টিজ জাপান অর্জ্জন করিয়াছে, শক্তিমান বিরাট দেশ রাশিয়ার সঙ্গে লড়িতে আসিয়া ক্ষুদ্র জাপান তাহা নষ্ট করিতে চাহিবে না। জাপানের মতলব গোড়া হইতেই ছিল রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দশবার সন্ধিপত্রের মুসাবিদা হইল, দশবারই উহা বাতিল হইল। তারপর বাধিল যুদ্ধ।

সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল ক্ষুদ্র জাপান বিরাট রাশিয়ার সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে। যে মাসে জাপান ইয়ালু নদীর যুদ্ধে জিতিল, আগষ্টে লিয়াও টুং-এর যুদ্ধ নয় দিনে শেষ হইল, দীর্ঘকাল যাবং পোর্টআর্থার অবরোধ চলিল, ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৪০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে জাপান লড়িতে লাগিল। তিন মাসের রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও পোর্ট আর্থার আত্মসমর্পণ করিল। মুকডেনের যুদ্ধে উভয় পক্ষ সমান সমান গেল, কাহারও জয় পরাজয় হইল না।

রুশ-জাপান যুদ্ধের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইল নৌসংগ্রামে।

প্রাচ্যে রাশিয়ার তুইটি নৌবহর ছিল— একটি ব্লাডিভষ্টকে, একটি পোর্ট আর্থারে। জাপানের উদ্দেশ্য ছিল এই তুই নৌবহরকে একসঙ্গে হইতে না দেওয়া। কোরিয়া এবং জাপানের মাঝখানে ৎসুসিমা প্রণালী জাপানের পাহারায় রহিল। বালটিক সাগরে রাশিয়ার নৌবহর ছিল। অক্টোবর মাসে রাশিয়া উহা এশিয়ায় পাঠাইয়া দিল। ১৯০৫ সালের মে মাসে এই নৌবহর চীন সাগরে আসিয়া পৌছিল। ৎসুসিমা দিয়া এই জাহাজগুলি ভ্লাডিভষ্টক অভিমুখে অগ্রসর হইল। জাপানী এডমিরাল টোগো এই নৌবহরের জন্য ৎসুসিমার মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৮ই মে এইখানে প্রচণ্ড জলযুদ্ধ হইল, রাশিয়ান নৌবহর পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। তুই-তৃতীয়াংশ জাহাজ ডুবিল, ছয়টি জাহাজ বন্দী হইল। সমগ্র নৌবহরের মধ্যে চারিটিমাত্র জাহাজ কোনওরূপে ভ্লাডিভষ্টকে পৌছিল। ট্রাফালগারের পর এত বড় জলযুদ্ধ আর হয় নাই।

পোর্টসমাউথের সন্ধি

আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ থামিল। ১৯০৫ সালের আগষ্টে পোর্টসমাউথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। উহার সর্ত্ত হইল :

(১) রাশিয়া লিয়াও টুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানকে অর্পণ করিবে।

(২) ১৮৭৫ সালে রাশিয়া সাখালিন দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল; উহার দক্ষিণের অর্দ্ধাংশ জাপানকে দিবে।

(৩) মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইবে।

(৪) মাঞ্চুরিয়া চীনকে প্রত্যর্পণ করিবে।

(৫) কোরিয়ায় জাপানী স্বার্থ রাশিয়া স্বীকার করিবে।

(৬) কেহ কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দিবে না।

এই সন্ধিতে জাপান সন্তুষ্ট হইল না। আরও বেশী জমি এবং ক্ষতিপূরণ জাপান আশা করিয়াছিল। তাহা পাইল না। রাশিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ—জাপানী সামরিক শক্তির পরিমাণ সে বুঝিতে পারে নাই, যুদ্ধের ঘাঁটি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ছিল, নেতাদের মধ্যে মতৈক্য ছিল না, সামরিক সংগঠন দুর্ব্বল ছিল। জাপানীদের বেলায় এই যুদ্ধ ছিল জীবনমরণ সংগ্রাম। এই কারণেই জাপানীরা অমিতবিক্রমে লড়াই করিয়াছে।

জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার

রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর জাপান বেপরোয়া ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া দখল করিল।

প্রথম যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে ২৩শে আগষ্ট জাপান ইংলণ্ডের মিত্ররূপে যুদ্ধে নামিল। যুদ্ধে ইংরেজের হইয়া জাপানকে লড়িতে হইল না কিন্তু প্রাপ্তি হইল বিস্তর। প্রথমেই জাপান জার্ম্মেণী আক্রমণের নামে চীনের জার্ম্মাণ অধিকৃত এলাকা শানটুং দখল করিল। শানটুং-এর রাজধানী

ৎসিনান হইতে ৎসিংতাল পর্য্যন্ত রেলওয়ে কাড়িয়া নিল। কিয়াও চৌ এবং অন্য যে সব স্থানে জর্ম্মাণ স্বার্থ ছিল সমস্ত অধিকার করিল। যুদ্ধটা নামে হইল জার্ম্মেণীর সঙ্গে কিন্তু কার্য্যতঃ চীনের অংশ জাপানের অধিকারে আসিল।

চীনের উপর ২১ দফা দাবী

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে জাপান চীনের নিকট এক ২১ দফা দাবী পাঠাইল। উয়ান শি কাই তখন চীন রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট। গভীর রাত্রে এক জাপানী মন্ত্রী নিজে উয়ান শি কাইয়ের হাতে ঐ চিঠি দিয়া আসিলেন। চিঠিখানা গোপন রাখিবার জন্য জাপান প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া গেল। ২১ দফা দাবী পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল—

(১) শান্টুং অধিকার,

(২) মাঞ্চুরিয়া এবং ভিতর মঙ্গোলিয়ার পূর্ব্বদিকে প্রভাব বিস্তার,

(৩) কতকগুলি কয়লা এবং লোহার খনির লীজ,

(৪) চীনা উপসাগর, বন্দর এবং উপকূল ব্যবহার,

(৫) (ক) জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ,

(খ) জাপানী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়,

(গ) ধর্ম্ম প্রচারের স্বাধীনতা,

(ঘ) পুলিশের উপর ক্ষমতা,

(ঙ) অর্থ নৈতিক অস্ত্রাধিকার,

এই দাবী আদায়ের জন্য উয়ান শি কাইকে একদিকে লোভ দেখানো হইল যে উহা মানিলে তাঁহাকে প্রমোশন দিয়া চীনের সম্রাট করিয়া দেওয়া হইবে, অপর দিকে বলা হইল, এই প্রস্তাব না মানিলে যুদ্ধ হইবে। ৭ই মে জাপান উয়ান-শি-কাইয়ের নিকট এক চরম পত্র পাঠাইল। এই চিঠির কাগজে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধজাহাজ এবং মেসিনগানের জলছাপ দেওয়া দিল। উয়ান-শি-কাই প্রথম চার ভাগ দাবী মানিয়া নিলেন এবং বলিলেন

যে পঞ্চমটি আরও আলোচনা করিতে হইবে, উহা মানিয়া নিলে চীনের সার্ব্বভৌমত্ব অবশিষ্ট থাকে না।

জাপান ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল। এক ধাক্কায় যাহা আদায় হইল তাহার গুরুত্ব অসামান্য। উয়ান-শি-কাই নিজেকে চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি নিজে সম্রাট হুং শিয়েন নাম গ্রহণ করিয়া নিজের বংশের নাম দিলেন হুং শিয়েন রাজবংশ। সম্রাটত্ব এক বছরের বেশী টিঁকিল না। এক বছর পার হইতে না হইতে সম্রাট হুং শিয়েন একদিন এত রাগিয়া গেলেন যে রাগের চোট সামলাইতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ভার্সাই সন্ধি ও চীন

চীনে জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা যুদ্ধের পর স্থির হইবে ইহাই ছিল মিত্রশক্তির ধারণা। জাপান তার আগেই ঐগুলি অধিকার করিয়া নিজেকে জার্ম্মেণীর উত্তরাধিকারী করিয়া রাখিয়াছিল। চীন সন্ধিপত্রের দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারীত্ব স্বীকার করিল। জাপান জানিত শানটুং শুধু চীনের নিকট হইতে নিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই অধিকার ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিদের দিয়াও অনুমোদন করাইতে হইবে। ১৯১৭ সালে সুযোগ আসিল। জার্ম্মেণীর সাবমেরিনে মিত্রশক্তির জাহাজ এত বেশী ডুবিতে লাগিল যে তাহারা জাপানের নিকট জাহাজ চাহিল। জাপান জাহাজ দিতে রাজি হইল এই সর্ত্তে যে শান্তি সম্মেলনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালি তাহার শানটুং দখল অনুমোদন করিবে। কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকার নিকটেও জাপান ঐ স্বীকৃতি আদায় করিল।

এই সময় চীনের এক চাপে মিত্রশক্তি বিব্রত হইয়া পড়িল। ১৯১৭ সালের ১৪ আগষ্ট চীনও জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯১৫ সালেই উয়ান শি কাই মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইংলণ্ড এবং জাপান চীনকে সঙ্গে নিতে চাহে নাই। ১৯১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন সমস্ত নিরপেক্ষ দেশগুলির নিকট এক সার্কুলার নোট

পাঠাইলেন যে এই যুদ্ধে কোন দেশের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা উচিত নয়। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া চীন যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ড এবং জাপান এবার আর বাধা দিতে পারিল না। জাপান অসন্তুষ্ট হইল কিন্তু চুপ করিয়া গেল। যুদ্ধে যোগ দিয়া চীন আশা করিয়াছিল ইহাতে চীনে ইউরোপীয় শক্তিদের লুণ্ঠন বন্ধ হইবে, জাপানকে আর বক্সার বিদ্রোহের খেসারত দিতে হইবে না।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীনের আশা ধূলিসাৎ হইল। চীন এই কয়টি দাবী সম্মেলনে উপস্থিত করিল—

(১) শানটুং চীনকে প্রত্যর্পণ,

(২) বিদেশী আইনের প্রভুত্ব (extra territoriality) এবং শুল্কের উপর বিদেশী কর্তৃত্বের অবসান,

(৩) বিদেশী সৈন্য অপসারণ,

(৪) ডাক ও তার বিভাগ হইতে বিদেশী অফিসার অপসারণ,

(৫) প্রভাবাধীন অঞ্চলের অবসান।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন শানটুং চীনকে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ওদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালি উহা জাপানকে দিয়া রাখিয়াছে। উইলসন বিরুদ্ধে ভোট দিলে জাপান জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল এবং তিনি রাজি হইয়া গেলেন। জাপান শানটুং পাইল। চীনের অন্যান্য দাবী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নয় বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইল। অসন্তুষ্ট এবং অপমানিত চীন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর না করিয়াই চলিয়া গেল।

সিমোনোসেকির সন্ধিতে যে জাপ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা, ভার্সাই সন্ধিতে তার চরম বিকাশ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকায় ইংরেজের উপনিবেশ ত্রয়োদশ কলোনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল। ফ্রান্সের উপনিবেশ কানাডা ইংলণ্ড ১৩ বৎসর আগে কাড়িয়া নিয়াছিল। আমেরিকাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করিয়া ফ্রান্স তার শোধ লইল।

স্বাধীনতা লাভের পর ওয়াশিংটন কংগ্রেসের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মাউণ্ট ভার্ণনে তাঁর কৃষিক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ কলোনি যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন তাহারা বৃটিশ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। স্বাধীনতার পর বাণিজ্যের দিক দিয়া তাহাদের খুব ক্ষতি হইল। সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকায় বহির্জ্জগতের যে সুবিধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল। ত্রয়োদশ কলোনি ছিল স্ব স্ব প্রধান। উহারা একে অপরের বিরুদ্ধে শুল্ক-প্রাচীর তুলিতে আরম্ভ করিল। ১৭৮১ সালে কনফেডারেশন এবং ইউনিয়ন গঠিত হইল। পার্লামেণ্টের নাম হইল কংগ্রেস কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষমতা যথেষ্ট হইল না। উহা পরামর্শদাতা সভামাত্র হইয়া রহিল। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের কিন্তু উহার জন্য ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা ছিল না। ত্রয়োদশ কলোনির নিকট হইতে আলাদাভাবে চাঁদা নিয়া যুদ্ধের খরচ তুলিতে হইত। সব কলোনি প্রতিশ্রুত টাকা দিত না। ঘাটতি মিটাইবার জন্য অন্য কলোনিদের নিকট বেশী টাকা চাহিতে হইত। যে যেমন খুসী নোট ছাপিত। কংগ্রেসের টাকা অনেক সময় নগদে না দিয়া মালপত্রে দিত। ইহাতে শৃঙ্খলা রাখা অসম্ভব হইল। দেশে এবং বিদেশে কংগ্রেসের বিপুল ঋণ হইয়া গেল। বৈদেশিক ঋণের সুদ যোগানো কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আমেরিকান ইউনিয়নের নোটের কোন মূল্য

রহিল না। শুধু কংগ্রেস নয়, আলাদাভাবে কলোনিগুলিরও আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

আর্থিক বিশৃঙ্খলা

আর্থিক বিশৃঙ্খলার ফলে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। সৈন্তেরা বেতন পায় না। একবার একদল সৈন্য কংগ্রেস নেতাদের এমন তাড়া করিল যে তাঁহারা ফিলাডেলফিয়ায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বিক্ষুব্ধ সৈন্তেরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

বিদেশীরা সদ্য স্বাধীন ইউনিয়নকে অবজ্ঞা এবং ঘৃণার চোখে দেখিতে লাগিল। যাহারা পাওনাদার তাহারা চটিতে আরম্ভ করিল। ফ্রান্স এবং স্পেন কে আমেরিকান ইউনিয়নের কতটা ভাগ গ্রহণ করিবে তাহার পরামর্শ স্থরু করিল। ইংলণ্ড কোন সাহায্য করিল না বরং বৃটিশ বণিকদের পাওনা টাকার গ্যারাণ্টি স্বরূপ কতকগুলি দুর্গে সৈন্য রাখিয়া দিল। স্পেন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া ইউনিয়নের মধ্যে হস্তক্ষেপ স্থরু করিল। বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য এবং অপমান হইয়া দাঁড়াইল স্বাধীনতার ফল।

দেশে এবং বিদেশে অনেকে বলিতে লাগিলেন যে আমেরিকান ইউনিয়ন রিপাবলিক থাকিতে চাহিলে ধ্বংস হইবে, রাজতন্ত্র অবলম্বন করিলে বাঁচিবে। ফ্রেডারিক দি গ্রেটও এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকান ইউনিয়নের রাজা করিবার প্রস্তাবও হইল কিন্তু ওয়াশিংটন নিজে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব

হ্যামিলটন প্রস্তাব করিলেন যে ত্রয়োদশ কলোনির প্রত্যেকে যদি নিজেদের ক্ষমতা কমাইয়া এক শক্তিশালী অচ্ছেদ্য ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিতে পারে, তবে আমেরিকান রিপাবলিক বাঁচানো যাইবে। জেফারসনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সমর্থন করিলেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে আন্তঃকলোনি বাণিজ্যেও বিস্তর অস্থবিধা ঘটিতে লাগিল।

ফিলাডেলফিয়া কনভেন্সন

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে এক কনভেনসন আহূত হইল। উদ্দেশ্য—কনফেডারেসনের নিয়মাবলী সংশোধন। পেশাদার আন্দোলনকারী, মেঠো বক্তা শ্রেণীর লোকেরা এই কনভেনসনে আসিতে পারিলেন না। উহাতে নির্ব্বাচিত হইলেন এমন সব লোক যাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত। ওয়াশিংটন এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন —আমরা নির্ব্বাচনে এমন একটা মান বজায় রাখিব যাহাতে জ্ঞানী এবং সৎ লোকেরা আসিতে পারেন; তারপর ঈশ্বরের হাত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, এডামস ভ্রাতৃদ্বয়, জেফারসন, প্যাট্রিক হেনরী, রবার্ট মরিস, জেমস উইলসন, জেমস আডিসন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্রমুখ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কনভেনসনে সমবেত হইলেন। কনভেনসন পাঁচ হাজার শব্দের একটি সংবিধান রচনা করিল। আমেরিকা ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত হইল। কেন্দ্র এবং প্রদেশ সমূহের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। যে যার ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করিবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র ১৮টি বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া হইল। তন্মধ্যে যুদ্ধঘোষণা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি রহিল। প্রদেশগুলিকে রিপাবলিকান কাঠামোর মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্টের রূপ নির্দ্ধারণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আমেরিকান সংবিধানের প্রধান বিশেষত্ব। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট নীতি গৃহীত হইল না; নূতন এক পদ্ধতি অবলম্বিত হইল যাহাতে মন্ত্রীসভা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং পার্লামেণ্ট উহা ভাঙ্গিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেসের দুই সভা হইল—সিনেটে প্রত্যেক প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকিবে, প্রতিনিধি সভায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি আসিবে। নিউইয়র্ক হইতে প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন ১৩ জন, সিনেটে দুইজন; আবার ক্ষুদ্র ডেলাওয়ার হইতে প্রতিনিধি সভায় যান মাত্র

একজন, সিনেটে দুইজন। দেড়শত বৎসরে আমেরিকান সংবিধানের মাত্র ২০টি সংশোধন হইয়াছে।

প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ্জ ওয়াশিংটন

নূতন ফেডারেল সংবিধান অনুসারে ১৭৮৯ সালের ৩০শে এপ্রিল জর্জ্জ ওয়াশিংটন সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

ওয়াশিংটন যখন কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন তখন আমেরিকার নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজধানী নাই, প্রেসিডেন্টের কোন সরকারী বাড়ী নাই, সুগঠিত ফেডারেল সৈন্যবাহিনী নাই, হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে জজ নাই, মন্ত্রীসভা নাই। বেতন এত কম যে ভাল লোক পাওয়া কঠিন। অথচ সংবিধান সফল করিতে হইবে। এই অবস্থা হইতে ওয়াশিংটন নূতন দেশ গড়িয়া তুলিলেন একটিমাত্র কাজের ফলে—উপযুক্ত পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ। বৈদেশিক সচিব নিযুক্ত হইলেন টমাস জেফারসন, সমর সচিব নিযুক্ত হইলেন জেনারেল হেনরী নক্স (ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা), এটর্ণী জেনারেল পদে নিযুক্ত হইলেন এডমণ্ড রানডল্‌ফ, অর্থসচিব পদে নিযুক্ত হইলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। হ্যামিলটন ছিলেন একাধারে সৈনিক, রাষ্ট্রবিদ, দার্শনিক, বাগ্মী এবং আইনজ্ঞ। নবীন আমেরিকা যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্থান জর্জ্জ ওয়াশিংটনের, তারপরেই হ্যামিলটনের স্থান। হ্যামিলটন ছিলেন ইউনিয়নিষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষপাতী। অল্পদিনের মধ্যেই দেউলিয়া দেশকে তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

উত্তর দক্ষিণ বিরোধ

উত্তরের কলোনি এবং দক্ষিণের কলোনিদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি ছিল। উত্তরের কলোনিরা ছিল প্রধানতঃ শিল্পজীবী, সেখানে কেহ ক্রীতদাস রাখিত না। দক্ষিণের কলোনিগুলি ছিল কৃষিজীবী, তূলা ছিল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য,

সেখানে দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। এই দুইয়ের মাঝখানে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে ফেডারেল রাজধানী স্থাপিত হইল। নূতন রাজধানীর নাম হইল ওয়াশিংটন।

রাজনৈতিক দল গঠন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিল। হ্যামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেলিষ্ট দল। ইহাদের দাবী ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। অন্য দলের নাম হইল রিপাবলিকান। এই দলের উদ্দেশ্য—সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতার যেটুকু সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার একচুল বাড়ানো চলিবে না। এই দলের নেতা হইলেন টমাস জেফারসন। এই রিপাবলিকান দলই পরবর্ত্তীকালের ডেমোক্রাট দল। এই দুই বিবদমান দলকে একসঙ্গে মন্ত্রীসভায় নিয়া ওয়াশিংটনকে কাজ করিতে হইয়াছে। হ্যামিলটন অর্থসচিব, জেফারসন বৈদেশিক সচিব। ওয়াশিংটন নিজে ছিলেন ফেডারেলিষ্ট পার্টির মতাবলম্বী। চার বৎসর পর জেফারসন মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিলেন। ওয়াশিংটন এইবার তাঁর জায়গায় একজন ফেডারেলিষ্টকে গ্রহণ করিলেন। ফলে ডেমোক্রেট দলের সংবাদপত্র সমূহে ওয়াশিংটনের তীব্র নিন্দা সুরু হইল। টমাস পেইন তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—এই সমস্ত বিষোদ্গার বাহিরের লোক পড়িলে আপনি সৎ লোক অথবা অসৎ লোক তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে। নীরোকেও লোকে এত কটূক্তি করে নাই। ওয়াশিংটনকে তৃতীয় বার প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৯৭ সালে তিনি পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, দেশের লোককে বলিয়া গেলেন এত তীব্র দলাদলি যেন তাঁহারা বন্ধ করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা প্রদাতা, নবীন আমেরিকার স্রষ্টিকর্ত্তা, সততা ও উদারতার মূর্ত্ত প্রতীক ওয়াশিংটন পদত্যাগ করিলে ডেমোক্রাট দলের সংবাদপত্র আবার লিখিল—"যে লোকটা আমাদের দেশের সকল দুর্গতির মূল, সে আজ সাধারণ লোকের স্তরে নামিয়া গিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের আর ক্ষতি করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।" ওয়াশিংটন সম্বন্ধে হেনরী লী

বলিয়াছিলেন—তিনি শান্তিতে প্রথম, যুদ্ধে প্রথম, দেশবাসীর হৃদয়েও তাঁহার স্থান প্রথম। ওয়াশিংটনের মৃত্যু সংবাদে বৃটিশ নৌবহর ইউনিয়ন জ্যাক অর্দ্ধনমিত করিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা এবং আমেরিকার ইউনিয়নের মূল জর্জ্জ ওয়াশিংটন।

ওয়াশিংটনের পর প্রেসিডেণ্ট হইলেন ফেডারেলিষ্ট দলের জন এডাম্‌স। ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন ডেমোক্রাট দলের জেফারসন। এডামসের অদূরদর্শিতা, হঠকারিতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য ফেডারেলিষ্ট দলের প্রভাব দ্রুত কমিতে লাগিল। ডেমোক্রাট দল শক্তিশালী হইল। জেফারসন ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়াতে ডেমোক্রাট দল অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল। এডামস গবর্ণমেণ্ট চারিটি আইন পাশ করিয়া ডেমোক্রাট দলকে ক্ষেপাইয়া দিলেন। নূতন আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেক খর্ব্ব হইল, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গেল। ইউরোপের লোক অবাধে আমেরিকায় আসিতে পারিত। নূতন আইনে তাহাতেও কড়াকড়ি করা হইল। ডেমোক্রাটরা বলিল—ফেডারেলিষ্টরা বিপ্লবের মূলনীতি অস্বীকার করিতেছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করিতেছে এবং প্রদেশের স্বাধীনতা হরণ করিতেছে।

১৮০০ সালে নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন। হ্যামিলটনের নিকট দেশ ছিল দলের উর্দ্ধে। জেফারসন বহুক্ষেত্রে হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও হ্যামিলটন প্রেসিডেণ্টপদপ্রার্থী জেফারসনকে সমর্থন করিলেন।

ডেমোক্রাট দলের ক্ষমতা লাভ

জেফারসনের নির্ব্বাচনকে ডেমোক্রাটরা বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করিল। বিপ্লব উহা ঠিকই, তবে দেশের দিক দিয়া নহে, ডেমোক্রাট দলের প্রোগ্রামে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। নির্ব্বাচনের সময় ডেমোক্রাট দলের শ্লোগান ছিল —সরকারী মিতব্যয়িতা এবং সংবিধানের আক্ষরিক অর্থ পালন। (Strict

Construction)। ফেডারেলিষ্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাহারা এই দুইটির একটিও মানে না। ডেমোক্রাট দল ক্ষমতা লাভ করিয়াই দুইটি নীতিই বিসর্জ্জন দিল। সরকারের টাকার অপচয় ফেডারেলিষ্টদের চেয়েও ইহারা বেশী সুরু করিল। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাও ইহারা আরও বেশী বাড়াইতে লাগিল।

আমেরিকায় তখন নিয়ম ছিল যে দল যখন গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিবে সেই দল তার নিজের লোক ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার সরকারী চাকুরীতে ঢুকাইবে। চাকরি খালি না থাকিলে বেদলের লোক বরখাস্ত করিয়াও নিজের দলের লোক নিতে হইবে। ফেডারেলিষ্ট দলের কর্ম্মচারীদের বিতাড়িত করিয়া জেফারসন ডেমোক্রাট দলের লোকদের নিযুক্ত করিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজদেরও জেফারসন দলীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ফ্রান্স কর্ত্তৃক লুইজিয়ানা অধিকার

মিসিসিপি আমেরিকার প্রধান নদী। এই নদীপথে বহু বাণিজ্য চলে। মিসিসিপির মোহনায় নিউ অর্লিয়ন্স সহর এবং নদীর পশ্চিমে লুইজিনিয়া ছিল স্পেনের হাতে। নদীপথে মাল চলাচলের উপর স্পেন এত চড়া হারে শুল্ক বসাইত যে আমেরিকার বাণিজ্যে খুব ক্ষতি হইত। ১৮০১ সালে নেপোলিয়ন লুইজিয়ানা তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। দুর্ব্বল স্পেনের হাত হইতে শক্তিমান ফ্রান্সের হাতে লুইজিয়ানা চলিয়া যাওয়ায় জেফারসন শঙ্কিত হইলেন এবং বুঝিলেন ফ্রান্স নিউ অর্লিয়ন্সও ছাড়িবে না, উহা দখল করিলে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর কূলে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিবে, তখন আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।

লুইজিয়ানা ক্রয়

জেফারসন নিউ অর্লিয়ন্স সহ মিসিসিপির মোহনায় কিছু জমি কিনিবার জন্য নেপোলিয়নের কাছে দূত পাঠাইলেন। নেপোলিয়ন প্রস্তাব করিলেন তিনি দেড় কোটি ডলারে সমগ্র লুইজিয়ানা বেচিয়া দিতে রাজি আছেন।

জেফারসন প্রথমটা ভয় পাইলেন, এত টাকা সংবিধান সংশোধন না করিয়া দেওয়া যাইবে কি না ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। তারপর সাহসে ভর করিয়া রাজি হইয়া গেলেন। ৮ লক্ষ বর্গমাইল জমি দেড় কোটি ডলারে কেনা হইয়া গেল। আমেরিকার জনসাধারণ ইহাতে এত খুসী হইয়াছিল—সংবিধান সংশোধনের কথা কেহ আর তুলিল না।

লুইজিয়ানা ক্রয় আমেরিকার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই জমি হইতে ছয়টি প্রদেশ গঠিত হইল। এতদিন আমেরিকান রাজনীতি চলিতেছিল উত্তর ও দক্ষিণে, এবার পশ্চিম আসিয়া উহাতে যোগ দিল।

নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধে আমেরিকার ক্ষতি

ইংলণ্ডের সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধ পারস্পরিক অর্থনৈতিক বয়কটের আকার ধারণ করিলে আমেরিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমেরিকান জাহাজ নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে এমন বন্দর কমই রহিল। আমেরিকা নিজের দেশে আগত ইউরোপীয়দের অতি সহজে নাগরিক অধিকার দিত। বহু ইংরেজ এই সুবিধা নিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদিকে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লোকসানের ফলে ইংলণ্ড কোন অধিবাসীকে দেশ ছাড়িতে দিতে চাহিত না। ইংরেজদের বৃটিশ নাগরিকত্ব ত্যাগ গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিলেন। আমেরিকার লোক দরকার। আমেরিকান ব্যবসায়ীরা বৃটিশ নাবিকদের ফুসলাইয়া নিজের জাহাজে আনিতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশত্যাগ দণ্ডনীয় করিল। তারপর সুরু করিল পলাতকের সন্ধানে আমেরিকান জাহাজ তল্লাসী। ১৮০৭ সালের জুন মাসে লিওপার্ড নামে এক বৃটিশ জাহাজ চেসাপিক নামে এক আমেরিকান জাহাজে তল্লাসী করিয়া চারজনকে ধরিয়া নিয়া গেল। তন্মধ্যে একজনের ফাঁসি হইল। পাঁচ বছর বিরোধের পর ১৮১২ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বাধিল। আমেরিকা ভাবিয়াছিল এই সুযোগে কানাডা কাড়িয়া নিবে। কিন্তু পারিল না। কানাডা নিজেই আত্মরক্ষা করিল। নৌযুদ্ধে প্রথমটা আমেরিকান জাহাজ কতকগুলি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইল, কতকগুলি বন্দী করিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বৃটিশ নৌবহর সমুদ্রে

সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিল। আমেরিকান জাহাজের আটলান্টিক সমুদ্রে গমন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ইংলণ্ড আমেরিকার দুইদিক দিয়া সৈন্য নামাইল। একদল ওয়াশিংটন দখল করিয়া হোয়াইট হাউস পোড়াইয়া দিল, অপর দল নিউ অর্লিয়ন্স দখলের চেষ্টা করিলে জেনারেল এনড্রু জ্যাকসন উহাকে পরাজিত করিলেন।

ওদিকে ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হইল। আমেরিকার সঙ্গে মন কষাকষির মূল কারণ দূব হইল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে সন্ধি হইয়া গেল। সন্ধির অন্যতম সর্ত্ত হইল আমেরিকা বা কানাডা সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে বাস করিবে; কেহ কাহারও সীমান্তে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবে না।

ফেডারেলিষ্ট দলের অবনতি

এই যুদ্ধেব পর ফেডারেলিষ্ট দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই দল লুইজিয়ানা ক্রয়ে ডেমোক্রাট দলকে বাধা দিয়াছিল। ডেমোক্রাট দল ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে নামিলে ফেডারেলিষ্ট দল তাহাতেও বাধা দিয়াছিল। ইহাদের ঘাঁটি ছিল উত্তরাঞ্চল, বিশেষভাবে নিউ ইংলণ্ড। উত্তরের প্রদেশগুলির মিলিশিয়া কানাডা অভিযানে যায় নাই, নিউ ইংলণ্ড ইংরেজ সৈন্যদের রসদ সরবরাহ কবিয়াছে। এই দুই কাজের ফলে ফেডারেলিষ্ট দল দেশের চোখে একেবারে নামিয়া গেল।

ডেমোক্রাট দলের কর্ম্মসূচী পরিবর্ত্তন

ডেমোক্রাট দল ফেডারেলিষ্ট দলের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিল। তাহারা আগে ছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিস্তারের বিরোধী। এখন তাহারাই হইয়া দাঁড়াইল গোঁড়া ফেডারেলিষ্টদের মত কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপরিমিত প্রসারের পক্ষপাতী। ফেডারেলিষ্ট নেতা কেন্দ্রীয় অর্থ নৈতিক ক্ষমতার প্রতীক জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১১ সালে ডেমোক্রাটরা উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ১৮১৬ সালে যুদ্ধের পরেই, ডেমোক্রাটরা আবার জাতীয় ব্যাঙ্ক খুলিয়া দিল। ফেডারেলিষ্ট দল মরিল বটে, তবে তাহাদের কর্ম্মসূচী ডেমোক্রাট দলকে দিয়া গেল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার এই যুদ্ধ দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের ফলে প্রাদেশিকতা একেবারে দূর হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পারস্পরিক রেষারেষির বিপদ সকলেই উপলব্ধি করিল। জাতীয় চেতনা অনেক বাড়িয়া গেল।

মনরো নীতি

প্রেসিডেন্ট মনরো আমেরিকার বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন—"ইউরোপীয়েরা যেন আমেরিকার দুই মহাদেশকে উপনিবেশ স্থাপনের স্থান বলিয়া মনে না করে।.........ইউরোপীয় মিত্রশক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক প্রভেদ।......আমরা ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব বজায় রখিবার জন্য স্পষ্ট ভাবেই তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতেছি তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের মহাদেশে চালাইতে না আসেন, আসিলে আমরা তাহা আমাদের শান্তি এবং নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিব।"

ইহাই বিখ্যাত মনরো ডক্‌ট্রিন বা মনরো নীতি। আমেরিকা ইউরোপকে জানাইয়া দিল তাহারা আমেরিকায় ইউরোপীয় শোষণ সহ্য করিবে না, অষ্ট্রিয়া বা প্রুশিয়ার মত অটোক্রাসির রাজনীতি আমেরিকায় প্রবেশ করিত দিবে না, ট্রোপো প্রোটোকলের—"আইনসঙ্গত শাসন" নীতি (theory of Legitimacy) মানিবে না, "নূতন পৃথিবী"কে (New World) আমেরিকা গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করিয়া রাখিবে। আমেরিকা নিজেও ইউরোপে তার নিজের রাজনীতি প্রচারে যাইবে না ইহাও জানাইয়া দিল। ইংলণ্ড আমেরিকাকে সমর্থন করিল। ফলে রাশিয়া আলাস্কা হইতে আমেরিকায় ঢুকিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইল এবং দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের কলোনিগুলি উদ্ধারে ফ্রান্সের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মনরো নীতির ফলে ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার রাজনৈতিক সম্পর্ক রহিল না বলিয়া রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদ (Political isolation) বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে।

মনরো নীতিতে আমেরিকান মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য গঠন বা বিস্তারে কিন্তু বাধা হইল না। একে একে টেক্সাস, ওরেগন এবং কালিফোর্ণিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। স্পেনীয় কলোনি কিউবা আক্রমণেও বাধা হইল না।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি

আমেরিকার শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য প্রভৃতিতেও অভূতপূর্ব্ব নবজাগরণ দেখা দিল। ১৮২৯ সালে আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হইল। এমার্সন, হথোর্ণ, লংফেলো, পো, ফেনিমোর কুপার প্রভৃতি আমেরিকান সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। বোষ্টনে রামমোহন রায়ের প্রভাব পৌছিল এবং সেখানে বেদান্ত চর্চ্চা সুরু হইল। সুপ্রীম কোর্টে মার্শালের মত প্রধান বিচারপতি দেশের আইন ও সংবিধানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আমেরিকার আইন ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন।

আমেরিকার অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ত্রুটি রহিয়া গেল। সমগ্রভাবে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি হইল না, উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম আলাদাভাবে নিজ নিজ অর্থ নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ১৮১২ সালের যুদ্ধে বৃটিশ পণ্য আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে উত্তর দিকের শিল্পপ্রধান প্রদেশগুলির খুব লাভ হইয়াছিল। নূতন নূতন কারখানা স্থাপিত হইল, পুরাণো কারখানার উৎপাদন বাড়িল। যুদ্ধ শেষে আবার বিলাতী পণ্য আসিতে আরম্ভ করিল। তখন উঠিল শিল্প সংরক্ষণের দাবী। উত্তরাঞ্চলে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পশ্চিমদিকে প্রচুর জমি ফাঁকা পড়িয়া আছে, যার খুসী গিয়া বসিলেই হইল। লোকে সেইদিকে যাইতে আরম্ভ করিল। কারখানার শ্রমিক পাওয়া কঠিন হইল। যাহারা রহিল তাহারাও নানারূপ গোলমাল আরম্ভ করিল। মজুরী বাড়াইতে হইল। কাজের সময় কমাইতে হইল। ফলে উৎপাদন ব্যয় আরও বাড়িয়া গেল। শিল্পপতিরা গবর্ণমেণ্টকে ধরিলেন—সংরক্ষণ ভিন্ন জাতীয় শিল্প ধ্বংস হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমটা

বিনা সংরক্ষণে স্বদেশী শিল্পে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট নিজে হাতে কাটা সুতায় হাতে তাঁতে বোনা কাপড় অর্থাৎ খাদি পরিতে সুরু করিলেন। ইহাতে ফল হইল না। ১৮১৬ সালে গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশুল্ক বসাইতে বাধ্য হইলেন। সরকারের আয় বাড়িয়া গেল। বাড়তি রাজস্ব যানবাহন এবং অন্যান্য উন্নতিতে ব্যয় হইতে লাগিল।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে স্বার্থ সংঘাত

দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলি ছিল কৃষিজীবী। বড় বড় জমিদারেরা ক্রীতদাস রাখিতেন, উহাদের দ্বারা কাজ করাইতেন, উত্তরাঞ্চল হইতে শিল্পদ্রব্য এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে গবাদি পশু কিনিতেন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তূলা। কাপড় তৈরির চেয়ে তূলা উৎপাদন এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে তূলা রপ্তানীই ইহারা অধিকতর লাভজনক মনে করিত। পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তারে সঙ্গে কাপড়ের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। তূলার চাহিদাও বাড়িয়া চলিল। তূলা এবং ক্রীতদাসকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণের প্রদেশগুলির সমগ্র সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিল। উত্তরাঞ্চল দাবী করিল শিল্প সংরক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চল চাহিল ক্রীতদাস সংরক্ষণ। উত্তরে দাস প্রথা অবসানের পর দক্ষিণের ক্রীতদাস সেখানে পলাইয়া যাইত। এই ক্ষতিপূরণের জন্য পলাতক ক্রীতদাস আইন পাশ হইল। উত্তর এবং দক্ষিণে স্বার্থের একটা বড় সংঘাত দেখা দিল। উত্তর চায় সস্তা শ্রমিক, দক্ষিণ চায় সস্তা জিনিষ। শিল্প সংরক্ষণে জিনিষের দাম বাড়ে, দক্ষিণ উহাতে বাধা দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি

পশ্চিমের প্রদেশগুলির দাবী আলাদা। তাহারা সস্তা শ্রমিক বা সস্তা জিনিষ কোনটিতেই উৎসাহী নয়, তাহারা চায় সস্তা জমি। সেখানে শিল্পও নাই, তূলার চাষও নাই। অন্যান্য ফসল উৎপাদন, গবাদি পশু পালন এবং জমির ফাটকাবাজীতে তাহারা ব্যস্ত। ১৮২০ সালে এই অঞ্চলে ৮০ একর

জমির প্লট সওয়া ডলার দামে বিক্রী হইয়াছে। জমির উন্নতির জন্য তাহাদের মূলধন দরকার, তাহাদের প্রধান চাহিদা ছিল অল্প সুদে ঋণ। স্বর্ণমানের বিরোধিতা করিয়া তাহারা সস্তা রৌপ্যমান এমন কি কাগজের টাকার দাবী জানাইল, কঠোর নিয়ম সম্বলিত জাতীয় ব্যাঙ্কের শাখার বদলে অল্প সুদে এবং সহজে ঋণ দিতে পারে এরূপ স্থানীয় ব্যাঙ্ক চাহিল। উত্তরের সঙ্গে পশ্চিমেরও বিরোধ—তাহাদের কারখানার শ্রমিক উহাদের সস্তা জমিতে চলিয়া যাইতেছিল। শুধু উত্তরের শ্রমিক নয়, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, পোলাণ্ড, বলকান প্রভৃতি হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক পশ্চিম আমেরিকায় আসিতে লাগিল। প্রথমে চলিল বেআইনী জবর দখল। পরে এই দখলীস্বত্ব আইনসঙ্গত করিয়া দেওয়া হইল।

টেক্সাস এবং কালিফোর্ণিয়া অধিকার

এত বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হইয়াও যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইল না। তার দৃষ্টি পড়িল টেক্সাস এবং কালিফোর্ণিয়ার দিকে। টেক্সাস ছিল মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণের তুলা চাষীরা টেক্সাসে ঢুকিয়া গিয়াছিল, মেক্সিকো ভদ্রতা করিয়া কিছু বলে নাই। ১৮৩৩ সালে ইহারা টেক্সাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। নয় বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্র টেক্সাস অধিকার করিয়া লইল। ক্ষতিপূরণ বাবদ মেক্সিকোকে দেড় কোটি ডলার দিয়া দিল। প্রশান্ত সাগর তীরে কালিফোর্ণিয়া ছিল আসল লক্ষ্য। টেক্সাস কুক্ষিগত করিবার পর কালিফোর্ণিয়া কাড়িয়া নিতে অসুবিধা হইল না। ১৮৪৮ সালে মার্শাল নামে এক ব্যক্তি কালিফোর্ণিয়ায় সোনার সন্ধান পাইল। সোনার খনির সন্ধানে পাগলের মত লোক ছোটা সুরু হইল। ইহাই কালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত goldrush। সোনা পাইল কম লোক, দুর্গতির একশেষ হইল বহুজনের। কানাডা সীমান্তে ওরেগন ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ড উভয়ের যৌথ শাসনের অধীন। উভয়ের সম্মতিক্রমে ওরেগন দুই ভাগ হইয়া একাংশ কানাডা এবং অপরাংশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট

হইতে আলাস্কা কিনিয়া নিল। স্পেনীয় উপনিবেশ কিউবাতে গিয়া হানা দিল। দক্ষিণ আমেরিকা এবং কানাডার উপরেও যুক্তরাষ্ট্রের লোলুপদৃষ্টি পড়িল।

এন্‌ড্রু জ্যাকসনের নির্ব্বাচন

১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলদের হাতে ছিল। ইতিমধ্যে জর্জ্জ ওয়াশিংটন দুইবার, জন এডামস একবার, টমাস জেফারসন দুইবার, জেমস আডিসন দুইবার, জেমস মনরো দুইবার, জন কুইন্সি এডামস একবার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। এঁদের মধ্যে চারজনই ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের লোক। ১৮২৯ সালে পশ্চিমের টেনেসি প্রদেশের এন্‌ড্রু জ্যাকসন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

আমেরিকার গণতন্ত্রের মধ্যেও এতদিন একটা আভিজাত্য ছিল। এই প্রথম জ্যাকসনের নির্ব্বাচনে সাধারণ লোক হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার পাইল। কার্ল স্যাণ্ডবুর্গ লিখিয়াছেন,—এন্‌ড্রু জ্যাকসন তাঁর বুটের তলায় আমেরিকার নদী এবং বন্ধজলার কাদা নিয়া হোয়াইট হাউসে ঢুকিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি লড়িয়াছেন, অনেক গুলির দাগ তাঁর গায়ে আছে। তিনি ব্যাকরণ সামান্যই জানেন, সাহিত্য খুব কমই পড়িয়াছেন। জ্যাকসনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেসিডেণ্ট জন কুইন্সি এডামস ছিলেন বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি।

হোয়াইট হাউসে জ্যাকসনের অভ্যর্থনায় আসিয়া ঢুকিল রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, জুয়াড়ী প্রভৃতির দল। ইহারা পিপা ভাঙ্গিয়া হুইস্কী খাইল, মদের গেলাস মেঝেতে উল্টাইল, গ্লাস এবং চীনামাটির বাসন ভাঙ্গিল, সাটিনে মোড়া চেয়ারে চড়িয়া চীৎকার সুরু করিল—আমাদের প্রেসিডেণ্ট এণ্ডি জ্যাকসন।

এবার সত্য সত্যই আমেরিকা গণতান্ত্রিক হইল।

জ্যাকসন প্রেসিডেণ্ট হইয়া সমস্ত কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া নিজের লোক ঢুকাইলেন। দলের লোক নয়, নিজস্ব অনুচরেরা চাকরি পাইল। জ্যাকসনের পরের কাজ হইল জাতীয় ব্যাঙ্ক ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

আইনসঙ্গত উপায়ে উহা ধ্বংস করিতে পারিলেন না, সমস্ত সরকারী টাকা জাতীয় ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া নিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা দিয়া উহাকে ঘায়েল করিলেন। তখন সমস্ত ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইতে পারিত। সরকারের টাকা জমা পাইয়া ব্যাঙ্কগুলি জ্যাকসনের উপর মহা খুসী হইল, বেপরোয়া নোট ছাপাইয়া পশ্চিমের লোকদের উহা অবাধে এবং অল্প সুদে ঋণ দিতে লাগিল। ফলে সুরু হইল জমির প্রচণ্ড ফাটকাবাজী। জমি বিক্রির টাকা কাগজের নোটে গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিল, গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত নোট ব্যাঙ্কে জমা দিল। এইভাবে সাংঘাতিক রকমের ইনফ্লেশন সুরু হইয়া গেল। জ্যাকসন হঠাৎ এক আদেশ জারী করিলেন—জমির দাম সোনা এবং রূপার টাকায় দিতে হইবে, নোট দেওয়া চলিবে না। ফলে নোট ছাপাই বন্ধ হইল, ঋণ সঙ্কুচিত হইল, আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সরকারী এবং ব্যক্তিগত পাওনা টাকা আদায় প্রায় বন্ধ হইতে বসিল। জমি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংস্কার করিয়া তাল সামলানো হইল।

সংরক্ষণ শুল্কে দক্ষিণাঞ্চলের আপত্তি

১৮২৮ সালে প্রেসিডেণ্ট এডামস চড়া হারে রক্ষণশুল্ক বসাইয়াছিলেন। দক্ষিণের প্রদেশগুলি উহাতে ভীষণ আপত্তি করিয়াছিল। উহাদের মুখপাত্র ছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট কলহুন। সিনেটে ইহা নিয়া ঘোর বিতর্ক হইল। তর্কের বিষয় হইল—রক্ষণশুল্ক বসাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছেন কি না। সিনেটর হেইন ছিলেন শুল্কের বিরুদ্ধে, ডানিয়েল ওয়েবষ্টার পক্ষে। এই দুইজনের বক্তৃতা আমেরিকার রাজনৈতিক সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের লেখার মত প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ওয়েবষ্টারের বক্তৃতায় অব্রাহাম লিঙ্কন খুব প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

জ্যাকসন দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থনে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত জানিবার জন্য জেফারসনের জন্মদিনে এক ভোজ সভায় জ্যাকসনকে নিমন্ত্রণ করা হইল। জ্যাকসন উঠিয়া বলিলেন,—ইউনিয়ন রক্ষা করিতেই হইবে। কলহুন জবাব দিলেন,—ইউনিয়ন

আমাদের প্রিয় কিন্তু তার স্থান আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার পরে। উত্তর ও দক্ষিণে গৃহযুদ্ধের বীজ এইখানেই বপন করা হইল। বিভেদসৃষ্টিকারীদের চ্যালেঞ্জ জ্যাকসন গ্রহণ করিলেন। সহস্র ভুল-ভ্রান্তি স্বেচ্ছাচার সত্ত্বেও এই একটি কারণে জ্যাকসন শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেণ্টদের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত।

গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত

১৮৩২ সালে দক্ষিণের প্রদেশগুলি ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছেদ ঘোষণা করিল। কলহুন হইলেন তাহাদের কনফেডারেশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ইহাদের জাতীয় পতাকায় একটি পামেটো গাছ জড়াইয়া সাপের ছবি দেওয়া হইল, তলায় লেখা হইল—আমাকে মাড়াইও না।

জ্যাকসন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। বিদ্রোহী দক্ষিণ ক্যারোলিনাকে জানাইলেন,—একজন লোকও যদি ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুল তোলে তবে তৎক্ষণাৎ আমি সেখানে উপস্থিত হইব এবং সামনে প্রথম যে গাছ পাইব সেই গাছে যাহাকে পাইব ঝুলাইব। গোপনে খবর দিয়া দিলেন সকলের আগে ঝুলাইবেন কলহুনকে। গৃহযুদ্ধ তখনকার মত বন্ধ হইল। শুল্ক সম্বন্ধে একটা আপোষ হইয়া গেল। জ্যাকসন এই আপোষে খুসী হইলেন না। তিনি বলিলেন,—ইহাদের আসল মতলব ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া; শুল্ক ছুতা মাত্র; ইহাদের পরবর্ত্তী ছুতা হইবে নিগ্রো অথবা দাস সমস্যা।

জ্যাকসনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

হুইগ দল গঠন

জ্যাকসনের আমলে আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলি নূতন করিয়া গঠিত হইল। ফেডারেলিষ্ট দলের ধ্বংসের পর একমাত্র ডেমোক্রাট দল অবশিষ্ট ছিল, দলাদলিও দূর হইয়াছিল। জ্যাকসনের নির্ব্বাচনের পর আবার দলাদলি সুরু হইল। ডেমোক্রাট দল জ্যাকসনকে সমর্থন করিল। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা একত্র হইয়া হুইগ দল নামে নূতন দল গঠন করিল। প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসন যে ভাবে নিজের ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে

বাধা দিয়া পার্লামেণ্টের শাসন প্রবর্ত্তন করাই ছিল হুইগ দলের উদ্দেশ্য। ডেমোক্রাটরা শক্তিশালী ইউনিয়নের নীতি অবলম্বন করিল, হুইগ দল চাহিল প্রাদেশিক শাসন কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ। দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা হুইগ দলে যোগ দিলেন। এই দলে ছিলেন হেনরী ক্লে, ডানিয়েল ওয়েবষ্টার, আব্রাহাম লিঙ্কন, জন কুইন্সি এডামস। ইউরোপের ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর সেখানকার অনেক মনীষী আমেরিকায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন ভিক্টর হুগো। হুগো হুইগ দলকে সমর্থন করিলেন।

আমেরিকান রাজনীতির একটি বিশেষত্ব এই সময় হইতেই দেখা দিল। রাজনীতি পেশাদারী হইয়া দাঁড়াইল। যে দল প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করিবে, সেই দল সমস্ত চাকরি এবং সরকারী ক্ষমতার সুবিধা ভোগ করিবে, এই নিয়ম পেশাদার ধনী রাজনীতিকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিব বিপুল সুযোগ ছিল, গবর্ণমেণ্ট হাতে থাকিলে উহার সদ্ব্যবহার সহজ হইবে ধনীরা উহা বুঝিয়াছিল। নিজেরা উচ্চতম পদগুলি হাতে রাখিয়াও দলের লোকদের অসংখ্য চাকরি দেওয়ার সুযোগ ছিল বলিয়া দলে লোকের অভাব হইত না। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল গবর্ণমেণ্ট দখল। ম্যাক্স ফারাগু লিখিয়াছেন—আমেরিকায় দুই শ্রেণীর লোক দেখা দিল—"একদলের স্বার্থ ব্যবসা আর একদলের স্বার্থ রাজনীতি ; এক কথায় বলা যায় সকলেরই স্বার্থ ব্যবসা, কতক লোকের নিকট রাজনীতি হইল ব্যবসা, আমেরিকান রাজনীতি গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ধারায় চলিয়াছে ; ইহা মনে রাখিতে হইবে।"

আমেরিকার দাসপ্রথা

আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন মাসাচুসেট ছাড়া আর সর্ব্বত্র দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ডাচরা আমেরিকায় কুড়িটি ক্রীতদাস আনিয়া বিক্রয় করে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ক্রমাগত আমদানীর ফলে ক্রীতদাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ লক্ষ। ১৭৮৭ সালে এক

অর্ডিনান্সে আলেঘানির পশ্চিমে এবং ওহিও নদীর উত্তরে ক্রীতদাস রাখা নিষিদ্ধ হইল। এই সীমারেখা মাসন-ডিক্সন লাইন নামে পরিচিত। কিন্তু ব্যবস্থা রহিল দক্ষিণের কোন দাস ঐ লাইনের ওপারে পলাইলে তাহাকে ধরিয়া মালিকের জন্য রাখা হইবে। ওয়াশিংটন স্বেচ্ছায় নিজের জমিদারী হইতে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়া দাসপ্রথা অবসানের পথ দেখাইলেন। জেফারসনও তাঁহার ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দিলেন এবং উহাদিগকে আমেরিকা হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন।

স্বেচ্ছায় ক্রীতদাসদের মুক্তি দান খুব ধীরে চলিতে লাগিল। তুলার বীজ ছাড়ানোর এবং তুলা চাষের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর দাস রাখা আরও লাভজনক হইয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণের প্রদেশগুলি দাসপ্রথা যে কোন উপায়ে বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

মিস্সুরী আপোষ

দাসপ্রথা অবসানকামী এবং দাসপ্রথাকামী দুই দলে তুমুল বিরোধ শুরু হইল। পশ্চিমের প্রদেশরাও দাস রাখিবার দাবী জানাইল। ১৮২০ সালে মিস্সুরীতে এক আপোষ হইল। স্থির হইল মিস্সুরী দাস রাখিতে পারিবে। মাসন-ডিক্সন লাইন আলেঘানি এবং ওহিও নদী হইতে বাড়াইয়া মিসিসিপি পর্য্যন্ত নেওয়া হইল এবং সেখান হইতে ৩৬°.৩০′ অক্ষাংশ ধরিয়া লাইন দক্ষিণ ও পশ্চিমে চলিয়া গেল। দাসপ্রথাকামীরা উহার সমর্থনে নানাবিধ যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এমনও বলিলেন—শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মধ্যে আর কোন সম্পর্ক সম্ভবই নয়।

মিস্সুরী আপোষে দাসপ্রথা ইউনিয়ন কর্তৃক স্বীকৃত হইল কিন্তু উহা সীমাবদ্ধও হইয়া গেল। আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ উত্তরের নেতারা বলিলেন,—দাসপ্রথা যখন একবার সীমাবদ্ধ হইয়াছে তখন উহার ধ্বংস অপরিহার্য্য। আর একদল অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—এই বর্ব্বর প্রথা এখনই তুলিয়া দাও।

দক্ষিণের নেতারা বলিলেন,—উহারা দেখাইবে বিশ্বপ্রেম আর আমরা ক্রীতদাসের মুক্তি দিয়া তার খেসারৎ দিব, ইহা হইতে পারে না।

টেক্সাস এবং কালিফোর্ণিয়ায়ও দাসপ্রথা প্রবর্ত্তন নিয়া বিরোধ বাধিল। টেক্সাস যখন মেক্সিকোর অধীনে ছিল তখন মেক্সিকো সেখানে দাসপ্রথা তুলিয়া দিয়াছিল। টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে দক্ষিণের প্রদেশগুলির চেষ্টায় এবং উহাদের স্বার্থে টেক্সাসের যুক্তরাষ্ট্রভুক্তির পর সেখানে দাসপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। মেক্সিকো হইতে আগত প্রদেশগুলিতে দাসপ্রথা ঢুকিবে না বলিয়া চেষ্টা হইল কিন্তু উহা সফল হইল না। চূড়ান্ত সংঘর্ষ হইল কালিফোর্ণিয়ায়। সেখানে সোনার খনি বাহির হইয়াছে। কংগ্রেস মনস্থির করিতে পারে না দেখিয়া তাহারা নিজেরাই ঠিক করিল কালিফোর্ণিয়ায় দাসপ্রথা ঢুকিতে দিবে না। ১৮৫০ সালে আপোষ হইল। কালিফোর্ণিয়ায় দাসপ্রথা রহিল না, তবে অন্যান্য দাসপ্রথাকামী অঞ্চলের জন্য এই মর্ম্মে এক পলাতক দাস আইন পাশ হইল যে কাহারও দাস মুক্ত অঞ্চলে পলাইয়া গেলে কেন্দ্রীয় পুলিশ তাহাকে ধরিয়া মালিকের হাতে সমর্পণ করিবে। ইহাই ক্লে আপোষ নামে খ্যাত।

পলাতক দাস আইন প্রয়োগ

পলাতক দাস আইন প্রয়োগে অত্যাচারের চরম স্থরু হইল। ১৮৫২ সালে হেরিয়েট বীচার ষ্টো নাম্নী এক ধার্ম্মিকা মহিলা "টম কাকার কুটীর" নামে একটি বই লিখিলেন। এই একখানি বই সমগ্র সভ্য জগৎকে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে দাসপ্রথার শ্রেষ্ঠ তিন নেতা—ক্লে, ওয়েবষ্টার এবং কলহুনের মৃত্যু হইল। নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ষ্টিফেন ডগলাস।

নূতন প্রদেশ গঠন

ডগলাস মিস্থরীর পশ্চিমের পতিত জমি উদ্ধারের জন্য সেখানে কানসাস এবং নেব্রাস্কা নামে দুইটি প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করিলেন। ১৮৫৪ সালে

কানসাস-নেব্রাস্কা বিল পাশ হইল। নূতন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া গেল। জমি দখলের জন্য ঘুষ, জালিয়াতি, রক্তপাত কিছুই বাদ পড়িল না। এখানেও দাসপ্রথা ঢুকিয়া গেল। নূতন আইনে মিসৌরী আপোষ বাতিল হইয়া যাওয়ায় দাসপ্রথা বিস্তারে বাধা রহিল না। দাসপ্রথা অবসান-কামীরা দেখিলেন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, দাসপ্রথা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ড্রেড স্কট রায়

১৮৫৭ সালে ফেডারেল আদালতের এক সিদ্ধান্তে দাসপ্রথা অবসান-কামীদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। বিচারপতি ড্রেড স্কট রায় দিলেন—ক্রীতদাসের মানুষ হিসাবে কোন অধিকার নাই, ঘটি বাটির মত ক্রীতদাসও বিক্রয়যোগ্য পণ্য, মিসৌরী আপোষ বেআইনী হইয়াছিল এবং আইনতঃ ইউনিয়নের কোন জায়গা হইতে দাসপ্রথার অবসান করা যায় না।

১৮৫৪ সালে কানসাস নেব্রাস্কা আইন পাশ হইবার পরেই দাসপ্রথার প্রসারে বাধাদানের জন্য রিপাবলিকান দল নামে আর একটি দল গঠিত হইল। ড্রেড স্কট রায়ের পর কোন কোন জায়গায় বিদ্রোহ হইল। রিপাবলিকান দলে যোগ দিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি বলিলেন,—যুক্তরাষ্ট্র অর্দ্ধেক স্বাধীন অর্দ্ধেক ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে পারে না।

আব্রাহাম লিঙ্কনের নির্ব্বাচন

১৮৫৮ সালে লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। ডেমোক্রাট দলে বিভেদের ফলে কেবলমাত্র দাসপ্রথা বিরোধী প্রদেশগুলির ভোটে লিঙ্কন জয়যুক্ত হইলেন।

লিঙ্কনের নির্ব্বাচনে দক্ষিণাঞ্চল ভীষণ ভয় পাইয়া গেল। ছয় সপ্তাহ বাদে দক্ষিণ ক্যারোলিনা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। লিঙ্কনের কার্য্যভার গ্রহণে তখনও তিনমাস দেরী আছে। বুকানন তখনও প্রেসিডেণ্ট। বুকাননের দুর্ব্বলতার সুযোগে আপোষের চেষ্টা হইল। ক্রিসেনডন প্রস্তাব করিলেন—

আবার মাসন-ডিক্সন লাইন টানিয়া মুক্ত অঞ্চল এবং দাস অঞ্চল ঠিক করিয়া দিলেই দক্ষিণাঞ্চল সন্তুষ্ট হইবে। ড্রেড স্কট রায়ের পর আর ঐ মর্ম্মে আইন পাশ করিবার অধিকার ছিল না। সংবিধান সংশোধন করিয়া উহাতে ঐ ধারা সংযোজনের প্রস্তাব হইল। লিঙ্কনের বাধায় ক্রিসেনডন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

গৃহযুদ্ধের আরম্ভ

আপোষ ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৬১ সালের জানুয়ারী মাসে আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুইজিয়ানা, টেক্সাস এবং জর্জ্জিয়া ইউনিয়ন ত্যাগ ঘোষণা করিল। নূতন কনফেডারেসি গঠিত হইল এবং তার প্রেসিডেণ্ট হইলেন জেফারসন ডেভিস।

উত্তরাঞ্চলে মতভেদ হইল। একদল বলিলেন—যাহারা বাহিরে যাইতে চায় তাহারা যাক। কিন্তু লিঙ্কন শুনিলেন না, তিনি ইউনিয়ন বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল দক্ষিণ ক্যারোলিনা ফেডারেল দুর্গ ফোর্ট সুমটারের উপর গোলাবর্ষণ করিল।

লিঙ্কন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করিলেন। তাঁহাকে সশস্ত্র বলপ্রয়োগে বদ্ধপরিকর দেখিয়া ভার্জ্জিনিয়া, টেনেসি, উত্তর ক্যারোলিনা এবং আরকানসাস ইউনিয়ন ত্যাগ ঘোষণা করিল। মিসুরী, কেনটাকি এবং প্রেসিডেন্টের নিজের প্রদেশ মেরীল্যাণ্ড ইউনিয়ন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। লিঙ্কন তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করাইলেন।

উত্তরের সঙ্গে পশ্চিমের প্রদেশগুলি যোগ দেওয়াতে উহাদের দলে হইল ২ কোটি লোক এবং প্রচুর টাকা। ফেডারেল সৈন্য এবং নৌবহর রহিল ইহাদের সঙ্গে। দক্ষিণের দলে রহিল ৫৫ লক্ষ লোক।

সুরু হইল গৃহযুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে ফেডারেল সৈন্যদল হারিয়া পলায়ন করিল। ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফেডারেল সৈন্য জয়লাভ করিল। মেরীল্যাণ্ডে দক্ষিণের জেনারেল লী পরাজিত হইলেন। মেরীল্যাণ্ডকে কনফেডারেসিতে টানিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

লিঙ্কনের দাসমুক্তি ঘোষণা

১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী লিঙ্কন তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে আমেরিকার সর্ব্বত্র ক্রীতদাসদের মুক্তি দান করিলেন। লিঙ্কন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন এ যুগে ক্রীতদাস প্রথা বেশীদিন টি঺কিতে পারে না। দাসপ্রথার অবসানের জন্য তিনি যুদ্ধে নামেন নাই। তিনি যুদ্ধে নামিয়াছিলেন ইউনিয়নের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য। যে সব প্রদেশ ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং বিদ্রোহীর মতই তাহাদিগকে বল প্রয়োগে ইউনিয়নে আবার আনিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার যুক্তি। হোরেস গ্রীলিকে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমার উদ্দেশ্য ইউনিয়নের অখণ্ডতা রক্ষা, দাসপ্রথা বাঁচানো বা দাসপ্রথা ধ্বংস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। একটিও ক্রীতদাসকে মুক্তি না দিয়া অথবা কতককে মুক্তি দিয়া কতককে না দিয়া অথবা সকলকে মুক্তি দিয়া যদি আমি ইউনিয়ন বাঁচাইতে পারিতাম তবে আমি তাহাই করিতাম। দাসপ্রথা অবসান এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তির জন্য আমি যাহা করিতেছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাতে ইউনিয়ন রক্ষায় সাহায্য হইবে, যাহা করিতে আমি বিরত হইতেছি তাহা করিতেছি এইজন্য যে ইহাতে ইউনিয়ন রক্ষায় সাহায্য হইবে।"

লিঙ্কনের ঘোষণায় ইউনিয়নের সর্ব্বত্র ক্রীতদাসেরা সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া বলা হইল। যুদ্ধে বাজেয়াপ্ত শত্রুর সম্পত্তির ন্যায় ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হইল। ইহার ফল হইল সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধে লোক জুটাইবার জন্য কনফেডারেসিও ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। লিঙ্কনের এই ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সহানুভূতি লাভ করিল। বিশেষভাবে সহানুভূতি দেখাইল ইংলণ্ড।

লিঙ্কন কনফেডারেসিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। জেনারেল লী অবরোধ ভঙ্গ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। ১৮৬৪ সালে ফেডারেল জেনারেল শেরমান এবং গ্রাণ্ট কনফেডারেসির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সুরু হইল চতুর্দ্দিকে নিদারুণ ধ্বংসাত্মক কাজ।

গৃহযুদ্ধের অবসান

১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল কনফেডারেসি আত্মসমর্পণ করিল। কেহ কোনরূপ অসম্মানজনক সর্ত্ত আরোপ করিল না। জেনারেল লী চিরদিনের মত অস্ত্র নামাইয়া রাখিয়া একটি কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিয়া চলিয়া গেলেন। লিঙ্কনের আহ্বানে ৫ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে আমেরিকায় নেপোলিয়নের সামরিক সাম্রাজ্য-বাদের অভ্যুদয় মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে যার কাজে ফিরিয়া গেল। সামরিক প্রভুত্বের আশঙ্কা দূর হইল। সৈন্যদলে ২৫ হাজার মাত্র লোক রহিল।

আততায়ীর হস্তে লিঙ্কনের মৃত্যু

জেনারেল লীর আত্মসমর্পণের পাঁচ দিন পর ১৪ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডের দিন জন উইলকিস বুথ নামে এক বিকৃত মস্তিষ্ক নটের গুলিতে লিঙ্কন নিহত হইলেন। তিনি থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট জনসন ও কংগ্রেসে সংঘর্ষ

লিঙ্কনের পর প্রেসিডেণ্ট হইলেন এন্ড্রু জনসন। জনসন দুর্ব্বলচিত্ত লোক। প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ সুরু হইল। রিপাবলিকান পার্টি প্রেসিডেণ্টকে ইমপীচ করিল। জনগণ মুক্তি পাইল কিন্তু তাঁর কার্য্যকালের শেষের দিকে উত্তরের বিজয়ী জেনারেল ইউলিসিস গ্রাণ্ট তাঁহাকে সরাইয়া প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করিলেন। দক্ষিণের প্রদেশগুলি মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন পাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উত্তরাঞ্চল নিগ্রোদের সমান নাগরিক অধিকার দিতে চাহিল। সংবিধানের দুইটি সংশোধনের দ্বারা নিগ্রোদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হইল। দক্ষিণের প্রদেশে ইহা নিয়া তুমুল আন্দোলন এবং রক্তপাত সুরু হইল। সেখানে ইউনিয়নের সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। ঐ সব প্রদেশের কালা আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। নিগ্রোদের বিভিন্ন গবর্ণিং.বডিতে স্থান

দেওয়ায় প্রচণ্ড দুর্নীতি আরম্ভ হইয়া আর এক সমস্যা দেখা দিল। একজন নিগ্রো বলিল,—আমি পাঁচবার আমার ভোট বিক্রয় করিয়াছি।

অবশেষে উত্তরাঞ্চল দক্ষিণ হইতে সৈন্য সরাইতে রাজি হইল। দক্ষিণে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত নিগ্রোদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গেরা আইন করিল লেখাপড়া না জানিলে কেহ ভোটাধিকার পাইবে না।

কালের গতি অমোঘ। দক্ষিণে তূলার চাষে মন্দা পড়িল। উহারাও উত্তরের সঙ্গে সমান তালে শিল্পোন্নতি স্বরু করিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভেদাভেদের মূল কারণ ঘুচিয়া গেল। উভয়েরই স্বার্থ অভিন্ন হইল। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ঐক্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯

ভার্সাই সন্ধিতে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হইল কিন্তু বিশ্বশান্তি আসিল না। পুরানো সমস্যা অনেক রহিয়া গেল, নূতন সমস্যা অনেক সৃষ্টি হইল। ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত হইল। ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ অসন্তুষ্ট হইল। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) গঠিত হইল, কিন্তু জার্ম্মেনী, আমেরিকা, রাশিয়া উহাতে না থাকায় জাতিসঙ্ঘ শক্তিশালী হইতে পারিল না। ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর শত্রুতা অব্যাহত রহিল।

কেন্দ্রীয় এবং পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিকে ঢালিয়া সাজা হইল। আট কোটি লোক এক দেশ হইতে অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হইল কিন্তু তাহাদের কোন মতামত নেওয়া হইল না। এখানেও অনেক বিরোধের কারণ ঘটিল। যেমন—

(১) ডানজিগ মুক্ত বন্দর করা হইল, উহাতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য পোলাণ্ডকে জর্ম্মান পূর্ব্ব প্রুশিয়ার অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি করিডোর দেওয়া হইল,

(২) রাশিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাল্‌টিক সাগর তীরে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, লিথুনিয়া এবং লাটভিয়া এই চারিটি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হইল,

(৩) বাল্‌টিক সাগরের আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ জাতিসঙ্ঘ ফিনল্যাণ্ডকে দেওয়ায় সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডে এবং কারেলিয়া নিয়া রাশিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডে বিরোধ বাধিল,

(৪) ভিল্‌না সহর নিয়া পোলাণ্ড এবং লিথুনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হইল এবং পোলাণ্ড মেমেল বন্দর কাড়িয়া নিল,

(৫) অষ্ট্রিয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বুঝিল জার্ম্মেনীর সঙ্গে সংযুক্তি ভিন্ন তাহার বাঁচিবার উপায় নাই, অথচ সন্ধিপত্রে এই সংযুক্তি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ; হতাশার ফলে অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইল,

(৬) হাঙ্গেরীর অনেকগুলি প্রদেশ কাটিয়া নিয়া যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়াকে দেওয়া হইল, ফলে হাঙ্গেরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল,

(৭) বেসারাবিয়া নিয়া রাশিয়া এবং রুমানিয়ায় মনকষাকষি চলিতে লাগিল,

(৮) বুলগেরিয়ার কতকাংশ কাটিয়া নিয়া গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল, উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুলগেরিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া রহিল, ঐ সব এলাকার বুলগেরিয়ান অধিবাসীরাও নূতন রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হইল না,

(৯) মাসিডোনিয়া গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উহার অধিবাসীরা চটিয়া রহিল,

(১০) আদ্রিয়াতিক উপকূলে প্রভুত্ব নিয়া ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস এবং আলবেনিয়ার মধ্যে বিরোধ চলিতে লাগিল,

(১১) ১৯০৮-এ আলবেনিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হইল এবং ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ১৯১৯-এ আলবেনিয়াকে তিন ভাগ করিয়া ইতালি, সার্ব্বিয়া এবং গ্রীসের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। আলবেনিয়ানরা ইহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু করিলে ১৯২০ সালে উহার স্বাধীনতা আবার স্বীকৃত হইল,

(১২) আদ্রিয়াতিক উপকূলের ফিউম সহরটি ইতালি চাহিয়াছিল কিন্তু শান্তি সম্মেলনে তাহার দাবী মঞ্জুর হইল না; ইতালি বলপূর্ব্বক ঐ সহর অধিকার করিল; ইহাতে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালির শত্রুতা সুরু হইল,

(১৩) তুরস্ক সেভার্স সন্ধির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এশিয়া মাইনর হইতে তাহারা গ্রীকদের বিতাড়িত করিল।

পূর্ব্ব ইউরোপের নবগঠিত রাজ্যগুলিতে এক বিরাট আভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিল—মাইনরিটি সমস্যা। প্রত্যেকটি রাজ্যকে এমন সুকৌশলে গঠন করা হইয়াছিল যেন উহাদের প্রত্যেকে মাইনরিটি সমস্যায় জর্জ্জরিত থাকে এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে। রুমানিয়ায় হাঙ্গেরিয়ান মাইনরিটি, গ্রীসে বুলগেরিয়ান, চেকোশ্লোভাকিয়ায় জর্ম্মান এবং বুলগেরিয়ান, যুগোশ্লাভিয়ায় ক্রোট এবং মণ্টেনেগ্রিণ গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া রাখিল। মাইনরিটির ভাষা এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণ নিয়া এমন বিরোধ সুরু হইল যে প্রত্যেকটি রাজ্যের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ইহার উপর আসিল উদ্বাস্তু সমস্যা। জাতি হিসাবে রাজ্য গঠনের নীতি অনুসরণ করিবার ফলে লোকবিনিময়ের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। সরকারী তত্ত্বাবধানে বহু ক্ষেত্রে লোকবিনিময় সুরু হইল। গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকবিনিময় হইল। ইহার উপর রহিল নূতন রাজ্যে অত্যাচারে জর্জ্জরিত বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা। বহু আর্ম্মেনিয়ান, গ্রীক,

বুলগেরিয়ান, রাশিয়ান এবং তুর্কী উদ্বাস্তুর আহার এবং বাসস্থান দেওয়া এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

ইউরোপের বহু দেশ দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিল। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হইয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত হইতে লাগিল। জর্ম্মান কাইজার পলায়ন করিলেন, জার্ম্মেনীতে রিপাবলিক স্থাপিত হইল। অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হইল। রুশ বিপ্লবের পর ইউরোপের প্রত্যেক দেশে বলশেভিকবাদের ছায়া পতিত হইল।

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের চেয়েও বড় হইয়া দেখা দিল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। যুদ্ধোত্তর বৈভব অল্পদিনে শেষ হইয়া দেখা দিল বিশ্বব্যাপী মন্দা। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্ম্মেনী এবং রাশিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল। উহার প্রতিক্রিয়া পড়িল সারা ইউরোপে। বেপরোয়া নোট প্রচারের পরিণামে ইনফ্লেসন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি, জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি, এক একটি দেশের পক্ষে ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইহার উপর আছে যুদ্ধের দেনা এবং মিত্রশক্তিদের নিজেদের দেনাপাওনা। অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে দেখা দিতে লাগিল বিপ্লববাদ। পদে পদে মালিক-শ্রমিক বিরোধ, ধর্ম্মঘট আসিতে লাগিল। সর্ব্বত্র একই অবস্থা,—অভিযোগ, অসন্তোষ এবং হতাশা।

অসন্তোষ এবং বিশৃঙ্খলার প্রথম ধাক্কা শেষ হইবার পর কতকটা স্থিতি-স্থাপকতা সুরু হইল। উহার মধ্যে এই কয়টি ঘটনা প্রধান—

(১) আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল,

(২) আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস লাভ করিল,

(৩) ইতালিকে ফিউম রাখিতে দেওয়া হইল,

(৪) লিথুনিয়াকে মেমেল রাখিতে দেওয়া হইল,

(৫) পোলাণ্ডকে ভিল্‌না রাখিতে দেওয়া হইল,

(৬) ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া এবং লাটভিয়ার সীমানা ঠিক করিয়া দেওয়া হইল,

(৭) রাশিয়া এবং পোলাণ্ডের সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হইল,

(৮) তুরস্ককে শান্ত করা হইল,

(৯) জাপান শানটুং ছাড়িতে বাধ্য হইল,

(১০) মিশর স্বাধীনতা লাভ করিল,

(১১) ফ্রান্স রুঢ় ছাড়িয়া দিল,

(১২) ফ্রান্স এবং জার্ম্মেনীর সীমান্ত গ্যারাণ্টি দিয়া লোকার্ণোতে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী এবং ইতালির মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল,

(১৩) আলসাস-লোরেণের উপর ফ্রান্সের অধিকার জার্ম্মেনী স্বীকার করিয়া নেওয়ায় এই দুই দেশের পুরাণো শত্রুতার অবসান ঘটিল।

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল জার্ম্মেনী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে পারিতেছে না। উহার নিকট হইতে মালপত্র আদায় সুরু হইল। অল্পদিনেই আমেরিকা বুঝিল জার্ম্মেনী হইতে কয়লা বা অন্য সব জিনিষ আনিলে তাহার নিজের ঐ সব শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ১৯২৪-এ ডজ কমিশন (Dawes Commission) এক নূতন প্লান করিলেন। উহাতে জার্ম্মেনীর ক্ষতিপূরণের বোঝা অনেক কমাইয়া দেওয়া হইল। রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অসন্তোষ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনও কমিতে লাগিল। বলশেভিকবাদের ভয় কাটিতে লাগিল। সোভিয়েট রাশিয়াকে সকলে স্বীকার করিয়া লইল। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উঠিতে লাগিল। ১৯২৮-এ ১৫টি দেশ কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিল।

ইউরোপে জাতীয়তাবাদ নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল। অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় শিল্প সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হইল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুল্ক প্রাচীর উঠিতে লাগিল। নব জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। সীমান্ত সংরক্ষণের দিকেও ঝোঁক পড়িল। উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে ইউরোপে তিনটি নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠিল—ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ এবং কমুনিজম বা বলশেভিকবাদ। বিপ্লবী শক্তি পূর্ণ দক্ষিণপন্থী এবং পূর্ণ বামপন্থী এই দুই প্রান্তে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইল।

জাতি সঙ্ঘ

প্রথম যুদ্ধের পর জাতি সঙ্ঘ গঠিত হইল। উহার স্থায়ী কেন্দ্র হইল জেনেভা। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি এবং বিনা যুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষা। সঙ্ঘের একটি সাধারণ পরিষদ (Assembly) গঠিত হইল। উহাতে থাকিবেন প্রত্যেক সদস্য দেশের তিনজন প্রতিনিধি। বৎসরে অন্ততঃ একবার জেনেভায় বৈঠক বসিবে বলিয়া স্থির হইল। সাধারণ পরিষদ ছাড়া একটি ছোট কর্ম্মপরিষদ রহিল—উহার স্থায়ী সদস্য হইবেন বৃহৎ শক্তিদের প্রতিনিধিবৃন্দ; ছোট শক্তিদের প্রতিনিধিরা অস্থায়ী ভাবে উহাতে নির্ব্বাচিত হইবেন। কর্ম্মপরিষদের বৈঠক বৎসরে অন্ততঃ তিনবার বসিবে। একটি স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। উহাতে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ বিচারের ব্যবস্থা হইল। একটি আন্তর্জ্জাতিক শ্রম অফিস গঠিত হইল। উহাতে সদস্য দেশের কলকারখানার মালিক এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা থাকিবেন। উহার কাজ হইবে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ মীমাংসা এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন।

যে সকল দেশ জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইল তাহাদের সার্ব্বভৌম অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না। জাতিসঙ্ঘের কোন সৈন্যদল রহিল না। স্থায়ী শাসন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করা হইল না। জাতিসঙ্ঘ প্রথমটা ভাল-ভাবেই কাজ করিতে লাগিল। ১৯২৭ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক আদালতে ২৬টি মামলার শুনানী হইল। ১১টির রায় বাহির হইল, এবং ১৩টিতে পরামর্শ দেওয়া হইল।

বহু সদিচ্ছা সত্ত্বেও জাতি সঙ্ঘ শক্তিশালী হইতে পারিল না। উহার দুর্ব্বলতার প্রথম কারণ—আমেরিকা প্রথম হইতেই দূরে সরিয়া রহিল, জাতি-সঙ্ঘে যোগ দিল না। ১৯২৬-এ জার্ম্মানীকে সদস্যপদে যোগ দিতে দেওয়া হইল। ১৯৩৩-এ আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া বৃহৎ শক্তিদের সকলেই জাতিসঙ্ঘে ছিল। ১৯৩৪-এ রাশিয়াও যোগ দিল। ছোট দেশগুলি প্রায়

সকলেই আসিয়া যোগ দিল। ছোট-খাট কয়েকটি বিরোধ ছাড়া জাতিসঙ্ঘ কোন বড় বিরোধ মীমাংসায় সফল হইল না। বৃহৎ শক্তিদের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতের চাপে উহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার এই কয়টি কারণ প্রধান—

(১) জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ,

(২) ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ,

(৩) স্পেনের গৃহযুদ্ধে কমুনিষ্ট ও ফাসিষ্ট শক্তিদের হস্তক্ষেপ,

(৪) জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেমেল এবং পোলাণ্ড অধিকার,

(৫) ইতালি কর্ত্তৃক আলবেনিয়া অধিকার,

(৬) বালটিক রাষ্ট্রদের উপর রাশিয়ার খবরদারী এবং ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ।

জার্ম্মেনী, ইতালি, জাপান এবং রাশিয়ার আক্রমণাত্মক অভিযানে জাতি সঙ্ঘ বাধা দিতে পারিল না। ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধও ব্যর্থ হইল।

জাতিসঙ্ঘ প্রথম কড়া ব্যবস্থা প্রয়োগ করিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ফিনলাণ্ড আক্রমণের প্রতিবাদে রাশিয়াকে জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ হইতে বিতাড়িত করা হইল। এই বিতাড়নসত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘের দুর্ব্বলতা ঢাকা পড়িল না। জার্ম্মেনী এবং জাপান আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। ১৯৩৯-এ ইতালিও জাতিসঙ্ঘ ছাড়িল।

১৯৪০-এ জাতিসঙ্ঘে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিল শুধু বৃটেন ও ফ্রান্স।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হইল বটে, তবে কতকগুলি বিষয়ে উহা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছে। স্বাস্থ্য এবং অর্থ নৈতিক বিষয়ে বহু সমস্যা নিয়া জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটি গবেষণা করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি বড় মিলনক্ষেত্র ছিল জাতিসঙ্ঘ।

আন্তর্জ্জাতিক আদালত এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রম অফিস অনেক বৃহৎ সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

রুশ বিপ্লব

প্রথম যুদ্ধের সময় রাশিয়ার জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। রাশিয়ান ডুমা যুদ্ধে যোগদান সমর্থন করিল। বামপন্থী দুই দল—সোসাল রেভোলিউসনারি এবং মার্কসবাদী সোসাল ডেমোক্রাট যুদ্ধের বাজেটে ভোট দিল না কিন্তু যুদ্ধে সাহায্য করিল। ১৯১৫ সালেব মাঝামাঝি হইতে বামপন্থী এবং কেন্দ্রীয় দলেরা অধিকতর শাসন সংস্কার চাহিতে লাগিল। সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা নিকোলাসকে কঠোরতা অবলম্বনে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বৎসরের শেষের দিকে নিকোলাস ডুমার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নিজে সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। ফলে সর্ব্বময় ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইলেন আলেকজান্দ্রা এবং তাঁহার কুখ্যাত সহচর রাসপুটিন। ইহারা নিজেদের খুসীমত লোককে মন্ত্রী করিতে লাগিলেন। কেলেঙ্কারিতে দেশ ভরিয়া গেল। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে রাসপুটিন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন।

বাহিরে যুদ্ধ, ভিতরে খাদ্যাভাব এবং নানাবিধ অশান্তি—বিপ্লবের ক্ষেত্র দ্রুতভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ্চ সেণ্টপিটার্সবুর্গে খাদ্যের দাবীতে দাঙ্গা আরম্ভ হইল। বিনা নেতৃত্বে মার্চ্চ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গেল। মার্কসবাদী সোসাল ডেমোক্রাটরা তখন দুই দলে বিভক্ত—মেনশেভিক এবং বলশেভিক। বলশেভিক নেতাদের অনেকেই তখন পলাতক অথবা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত। জার জনতার উপর গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন। অধিকাংশ সৈন্যই বন্দুক তুলিল না। ১২ই মার্চ্চ সৈন্যেরা দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগ দিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিল। ১৪ই মার্চ্চ জার দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু তখন সময় বহিয়া গিয়াছে। যে সৈন্যদলকে বিদ্রোহ দমনে পাঠানো হয় তাহারাই গিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উহারা জেল ভাঙ্গিয়া রামপন্থী নেতাদের উদ্ধার করিয়া আনিল। শ্রমিক ও সৈন্যদল মিলিত হইল। পনেরো জনের এক কর্ম্মপরিষদ বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ

করিলেন। শ্রমিকদের সোভিয়েট গঠিত হইল। জার ডুমা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ দিলেন কিন্তু সদস্যেরা ঐ আদেশ মানিলেন না। মার্কসবাদী নেতারা ডুমার অধিবেশন চালাইতে লাগিলেন। একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। প্রকৃতপক্ষে ডুমাই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। স্থির হইল সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ আহ্বান করা হইবে। প্রিন্স লভভ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। উহাতে রহিলেন কেরেন্স্কী। জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। রোমানফ বংশের উপরই জনসাধারণ এত ক্ষেপিয়া গিয়াছিল যে তাঁহার ভ্রাতাও সিংহাসনে বসিতে সাহসী হইলেন না। ২০শে মার্চ্চ জার নিকোলাস এবং সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। একদিকে প্রচণ্ড কৃষক অসন্তোষ, অপর দিকে যুদ্ধ পরিচালনার সমস্যা—এই দুয়ের চাপ অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সামলাইতে পারিল না। সোভিয়েটগুলি তখন প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

মার্চ্চ বিদ্রোহের সময় লেনিন সুইজারলাণ্ডে নির্ব্বাসিত ছিলেন। জার্ম্মেনীর সহায়তায় এক বন্ধ রেল গাড়ীতে চড়িয়া লেনিন দেশে ফিরিলেন। জার্ম্মেনী ভাবিয়াছিল লেনিন রাশিয়ায় পৌঁছুলে বিপ্লব আরও জোরদার হইবে এবং রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ১৬ই এপ্রিল ১৯১৭ তারিখে লেনিন সেণ্টপিটার্সবুর্গে পৌছিলেন। জনসাধারণ নিজেরা একটা বিপ্লব চালাইতে পারে লেনিন ইহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি আসিয়াই বলশেভিক পার্টির ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ট্রটস্কী বলিলেন লেনিন পার্টির নামে নিজের ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। ট্রটস্কী মেনশেভিক বা বলশেভিক কাহারও মতানুবর্ত্তী ছিলেন না। তাঁর ছিল নিজস্ব আদর্শ। লেনিন অল্পদিনেই সমস্ত সোভিয়েটগুলি এমন ভাবে সংগঠিত করিলেন যেন প্রয়োজনমাত্রই তাহারা ক্ষমতা অধিকার করিতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট লেনিনকে জার্ম্মেনীর চর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য লেনিনকে আত্মগোপন করিতে হইল। তখন জুলাই মাস।

এই সময় কেরেন্স্কী প্রধান মন্ত্রী হইলেন এবং কর্ণিলভকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। আগষ্ট মাসে ইহারা সোভিয়েটগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কর্ণিলভ যে সব সৈন্যকে সোভিয়েট ভাঙ্গিতে পাঠাইয়াছিলেন তাহারা অনেকে আদেশ অমান্য করিল, শ্রমিকরা রেল এবং টেলিগ্রাফ লাইন ছিন্ন করিয়া সৈন্যদের গতিবিধি বন্ধ করিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর কর্ণিলভ গ্রেপ্তার হইলেন। সৈন্যদলে ব্যাপক বিদ্রোহ সুরু হইল। কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করিল।

২০শে অক্টোবর লেনিন সেণ্টপিটার্সবুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। বলশেভিক নেতৃত্বে সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠিত হইল। জার্মান আক্রমণ হইতে রাজধানী রক্ষার জন্য এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল কিন্তু ট্রটস্কী উহাকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিলেন। ৪ঠা নভেম্বর বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং জনসমাবেশ হইল। ট্রটস্কী বক্তৃতা করিলেন। ৭ই নভেম্বর বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গেল।

কেরেন্স্কী আমেরিকান দূতাবাসে গিয়া আশ্রয় নিলেন। সামরিক বিপ্লবী কমিটি শাসনভার গ্রহণ করিল। বলশেভিকরা সোভিয়েটসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিল। মেনশেভিক এবং দক্ষিণ পন্থীরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গেল। অবশেষে কাউন্সিল অফ পিপ্‌লস কমিশার নামে মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। লেনিন হইলেন প্রেসিডেণ্ট, ট্রটস্কী হইলেন বৈদেশিক কমিশার। এই মন্ত্রীসভাতেই তরুণ ষ্টালিনকে গ্রহণ করা হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে গণপরিষদ নির্ব্বাচিত হইল। বলশেভিকরা প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভোট পাইল। অন্যান্য সোসালিষ্ট পার্টিরা, বিশেষ ভাবে সোসাল রিভোলিউসনারি দল শতকরা ৬২টি ভোট পাইল। বলশেভিকদের বেশী ভোট হইল বড় সহরে, সোসাল-রিভোলিউসনারিদের গ্রামে। ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে একবার মাত্র গণপরিষদের অধিবেশন বসিল; পরদিন লেনিনের আদেশে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। উহার দরজায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন হইল। মেজরিটি ছিল বলশেভিক বিরোধী, তাহারা ক্রুদ্ধ হইল কিন্তু কিছু করিতে পারিল না।

৩রা মার্চ্চ ১৯১৮ তারিখে রাশিয়া ব্রেষ্টলিটভ্স্ক সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির ফলে সমগ্র ইউক্রেণ, বালটিকের তিনটি প্রদেশ, ফিনল্যাণ্ড এবং ককেসাসের কতক অঞ্চল রাশিয়ার হাতছাড়া হইয়া গেল।

ব্রেষ্টলিটভ্স্ক সন্ধি বলশেভিক পার্টিরও অনেকে সমর্থন করে নাই। ইহার ফলে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। সমগ্র পরিবার সহ জার নিকোলাস নিহত হইলেন।

১৯১৮ সালের জুন মাসে মিত্রশক্তি বলশেভিক বিরোধীদের পক্ষে রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইল। প্রথমে চেকরা ভ্লাডিভষ্টকের সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিল। আগষ্ট মাসে বৃটিশ, ফরাসী, জাপানী এবং আমেরিকান সৈন্য ভ্লাডিভষ্টকে নামিল। আর্চ্চাঞ্জেলেও বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের একটি বাহিনী নামিল।

ট্রটস্কী তখন সমর সচিব। তিনি বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের আদেশ দিলেন। লালফৌজ তাঁহারই সৃষ্টি। ১৯২০ সালে লালফৌজের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩০ লক্ষ। পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মেনীর পরাজয়ের পূর্ণ সুযোগ নিল রাশিয়া। ইউক্রেণের অধিকাংশ রাশিয়া পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। শেষ পর্য্যন্ত লালফৌজ জয়লাভ করিল, বিদেশীরা হটিয়া গেল।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গঠনের পর প্রথমটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। লেনিনের নূতন অর্থনীতি (NEP) অনেক সফল হইল। ১৯২৬-২৭ সালে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল।

১৯২৪-এর জানুয়ারীতে লেনিন পরলোক গমন করিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়া টটস্কী এবং ষ্টালিনের মধ্যে দারুণ লড়াই বাধিয়া গেল। লেনিন জীবিত থাকিতেই এই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ষ্টালিনের উপর লেনিনের বেশী বিশ্বাস ছিল কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ষ্টালিনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। জর্জ্জিয়ার মেনশেভিক রিপাবলিকের নেতাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্য লেনিন ষ্টালিনকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। ষ্টালিন আপোষের কথা না তুলিয়া নিষ্ঠুরভাবে মেনশেভিকদের দমন করেন।

ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া লেনিন ষ্টালিনকে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পদ হইতে অপসারিত করিতে বলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লেনিন ষ্টালিনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লেনিনের মৃত্যুতে ষ্টালিনের বিপদ কাটিয়া গেল।

বুখারিন তখন প্রাভদার সম্পাদক। ট্রটস্কীর সঙ্গে তর্ক করার যোগ্যতা তাঁহারই ছিল। ষ্টালিন বুখারিনকে কাজে লাগাইলেন। ট্রটস্কীকে কিছুটা কোণঠাসা করিয়াই তিনি বুখারিনকে বাতিল করিলেন। ট্রটস্কী এবং ষ্টালিনের মধ্যে তর্কের প্রধান বিষয় হইল—ট্রটস্কী বলিলেন, কোন একটি দেশে বিচ্ছিন্নভাবে সোসালিজম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ষ্টালিন বলিলেন স্বাধীন সোসালিষ্ট দেশ গঠিত হইতে পারে, বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ পরিত্যাগ না করিয়াও তাহা করা যায়; বিশ্বের সব দেশে কমুনিষ্ট বিপ্লবের কেন্দ্র হইবে রাশিয়া, রাশিয়াই তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

ষ্টালিনের সঙ্গে যোগ দিলেন জিনোভিফ এবং কামেনেভ। এই ত্রয়ী দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। ১৯২৫-এ ইঁহারা ট্রটস্কীকে সমরসচিবের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। ইহার পর ষ্টালিন বুখারিনকে দলে নিয়া জিনোভিফকে পলিটবুরো হইতে বিতাড়িত করিলেন। ১৯২৭ এ ট্রটস্কীকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইল। সেখান হইতে তিনি পলায়ন করিয়া প্রথমে যান তুরস্কে, তারপর নরওয়েতে, অবশেষে মেক্সিকোতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৪০-এ মেক্সিকোতে ট্রটস্কী নিহত হন।

রামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন রাশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইংলণ্ড এবং পরে ফ্রান্স কর্তৃক স্বীকৃত হইল।

যৌথ খামার, শিল্প বিস্তার এবং পাঁচশালা প্লান ষ্টালিনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতে তিনি বাধাও পাইয়াছেন বিস্তর। যাহাদিগকে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিলেন তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে অপসারণ আরম্ভ করিলেন। ১৯৩৪-এ কিরোভি এক তরুণ কমুনিষ্টের হাতে নিহত হইলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই অভিযোগে কামেনেভ এবং জিনোভিফকে জেলে দেওয়া হইল। জেলে তাহারা "স্বীকারোক্তি" করিলেন যে ক্যাপিটালিজম

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। জিনোভিফ, কামেনেভ এবং আর ১৪ জনকে এই অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। ইহাই প্রথম "পার্জ্জ" (Purge)। দ্বিতীয় পার্জ্জে আরও ১৭ জনের প্রাণদণ্ড হইল। তৃতীয় পার্জ্জে লালফৌজের কয়েকজন নেতার প্রাণদণ্ড হইল। চতুর্থ পার্জ্জে বুখারিনসহ ২১ জন বলশেভিক নেতার প্রাণদণ্ড হইল। প্রত্যেকটিতে "বিচার" হইল এবং সব অপরাধী "স্বীকারোক্তি" করিলেন। লেনিনের পলিটবুরোর মধ্যে জীবিত রহিলেন শুধু ষ্টালিন এবং ট্রটস্কী।

১৯৩৬-এ ষ্টালিন রাশিয়ার নূতন সংবিধান রচনা করিলেন।

বৈদেশিক নীতিতে ষ্টালিন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। হিটলারের অভ্যুদয়ে কমুনিষ্টদের যতটা বাধা দেওয়া উচিত ছিল কোমিনটার্ণ তাহা করিতে দেয় নাই। তাহারা বলিয়াছে—নাৎসিদের চেয়ে সোসাল ডেমোক্রাটরা কমুনিজমের বৃহত্তর শত্রু। রাইখষ্টাগে কমুনিষ্টরা নাৎসিদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। কোমিনটার্ণের ধারণা ছিল নাৎসিরা ক্ষমতা অধিকার করিলেই তার পরে কমুনিষ্ট বিপ্লব আসিবে।

১৯৩৪-এ রাশিয়া জাতি সঙ্ঘে যোগ দিল। লিটভিনভ হইলেন সোভিয়েট প্রতিনিধি। ১৯৩৫-এ রাশিয়া ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল যে জাতিসঙ্ঘ যদি বলে আক্রমণ ঘটিয়াছে তবে তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিবে। কোমিনটার্ণও তাহাদের নীতি বদলাইয়া সোসাল ডেমোক্রাট এবং বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে অধিকতর মেলামেশার নির্দ্দেশ দিল। ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়ে রাশিয়া বিপন্ন হইবে ইহা তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈপ্লবিক প্রচারকার্য্য এবং ক্যাপিটালিষ্ট বিরোধী আন্দোলন কমাইয়া দেওয়া হইল।

১৯৩৬-এর ১২ই সেপ্টেম্বর ন্যুরেমবুর্গে এক বক্তৃতায় হিটলার বলিলেন, —"আমি যদি উরাল পর্ব্বতের খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সাইবেরিয়ার বিশাল বনজ সম্পদ এবং ইউক্রেনের সুবিস্তীর্ণ গমক্ষেত অধিকার করিতে পারি তাহা হইলে জর্ম্মান সোসালিষ্ট নেতৃত্বে জার্ম্মেনী প্রাচুর্য্যের সাগরে ভাসিবে।"

১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরের মিউনিক চুক্তিতে ষ্টালিন ভাবিলেন জার্ম্মেনী এইবার পশ্চিম সীমান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া রাশিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে। ষ্টালিন পশ্চিমী শক্তি এবং জার্ম্মেনী উভয়ের সঙ্গেই আলোচনা চালাইলেন। বৃটিশ এবং ফরাসী মিশন রাশিয়ায় আসিল। ষ্টালিন জার্ম্মেনীকে ঠেকাইবার ঘাঁটি হিসাবে ফিনলাণ্ড, এস্থোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুনিয়া অধিকারের অনুমতি চাহিলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স রাজী হইল না।

এইবার ষ্টালিন জার্ম্মেনীর সঙ্গে সন্ধির জন্য ঝুঁকিলেন। সোভিয়েট বৈদেশিক দূত লিটভিনভ ছিলেন ইহুদী। জার্ম্মেনী তাঁর সঙ্গে কথা বলিতে আপত্তি করিল। ষ্টালিন লিটভিনভকে পদচ্যুত করিলেন। তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইলেন মলোটভ। ১৯৩৯-এর আগষ্টে হিটলার ষ্টালিন চুক্তি হইল—যুদ্ধ বাধিলে উহারা নিজেরা কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। গোপন চুক্তি হইল—জার্ম্মেনী পোলাণ্ড আক্রমণ করিলে উহা দুজনের মধ্যে ভাগ হইবে।

যুদ্ধ বাধিল। হিটলার ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে আপোষের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া ষ্টালিন বুঝিলেন হিটলারের এই উদ্দেশ্য সফল হইলেই তিনি রাশিয়া আক্রমণ করিবেন। ষ্টালিন ফিনলাণ্ডের নিকট ঘাঁটি চাহিলেন। ফিনলাণ্ড অস্বীকার করিল। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে ষ্টালিন ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। জাতিসঙ্ঘ রাশিয়াকে বহিষ্কৃত করিল। ষ্টালিন ১৯৪০-এ ফিনলাণ্ড অধিকার করিলেন।

ইহার পরেই ষ্টালিন লাটভিয়া, এস্থোনিয়া, লিথুনিয়া অধিকার করিলেন। এক গণভোটে উহাদের সোভিয়েট ভুক্তি ঘোষণা করিলেন। অতঃপর তিনি রুমানিয়ার নিকট বেসারাবিয়া এবং বুকোভিনা দাবী করিলেন। বেসারাবিয়া অধিকৃত হইলে ডানিয়ুব নদীর মোহানা ষ্টালিনের হাতে আসিল।

১৯৪০-এর হেমন্তকালে ফিনলাণ্ডে এবং রুমানিয়ায় জার্ম্মান সৈন্য ঢুকিল। ষ্টালিন চিন্তিত হইলেন।

মলোটভ হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করিতে বার্লিন গেলেন। হিটলার মলোটভকে লোভ দেখাইলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে রাশিয়া

পারস্যের উপর দিয়া শুধু পারস্য উপসাগর নয়, ভারত মহাসাগরে, এমন কি ভারতবর্ষেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। মলোটভ যতই ফিনল্যাণ্ড এবং রুমানিয়ার কথা তোলেন, হিটলার তার চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে রাশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্রিত করেন। মলোটভ ব্যর্থ হইয়া মস্কো ফিরিলেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন।

২২শে জুন ১৯৪১ জার্ম্মেনী রাশিয়া আক্রমণ করিল।

কম্যুনিজম

লেনিন রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। চাষীকে জমি দিয়া বলিলেন তার জন্য খাজনা দিতে হইবে না। কলকারখানার মালিকানা শ্রমিকদের দিয়া দিলেন। মুদ্রা ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেন, গির্জ্জা বন্ধ করিলেন। সোসালিজমের চরম লক্ষ্য একবারে প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় লেনিন ৮ই নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৯৩টি অর্ডিনান্স জারী করিলেন। শুধু রুশ বি া নয়, এই ভিত্তিতে বিশ্ববিপ্লবের জন্য লেনিন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইহাতে সমগ্র রাশিয়ায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। জার্ম্মেনী উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধিতে রুশ জার্ম্মান যুদ্ধ বন্ধ হইল কিন্তু উহার বলে জার্ম্মেনী রাশিয়ার উপর অনেক অপমানজনক সর্ত্ত চাপাইল। বলশেভিক গবর্ণমেণ্টকে মিত্রশক্তি স্বীকার করিল না। উহারা বিপ্লব-বিরোধীদের সাহায্য করিতে লাগিল। জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিল। সৈন্যদলে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দিল। বিনা খাজনায় জমি পাওয়া যাইবে শুনিয়া সৈন্যেরা অফিসারদের হত্যা করিয়া জমির আশায় যে যার গ্রামে ছুটিল। মূলধন সরিয়া যাওয়ায় শ্রমিকেরা কলকারখানার মালিক হইয়াও উহা চালাইতে পারিল না। মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ব্যবসা অচল হইয়া গেল। শিল্পজাত দ্রব্য না পাইলে চাষীরা ফসল ছাড়িতে অস্বীকার করিল। কলকারখানা বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে

দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। অনাহারে এবং পারস্পরিক হানাহানিতে হাজারে হাজারে লোক মরিতে লাগিল।

লেনিন দেখিলেন এই নীতি না বদলাইলে দেশ ধ্বংস হইবে, এই অবস্থা বেশীদিন চলিলে দলের কর্তৃত্বও বজায় রাখা যাইবে না। তিনি তাঁর নূতন অর্থনৈতিক পলিসি ঘোষণা করিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং পুঁজিবাদ কতকটা মানিয়া নিলেন। চাষীদের জমির উপর অধিকার এবং ফসল বাজারে বিক্রয়ের দাবী স্বীকার করিলেন। খামারে শ্রমিক নিয়োগ এবং ফসল বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জ্জনের অনুমতি দিলেন। শিল্পক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করিতে দেওয়া হইল। বিদেশী মূলধন আনিবার জন্য বলা হইল রুশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যৌথভাবে কারবার চালাইয়া লাভ করিতে দেওয়া হইবে এবং তার জন্য বিদেশীরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান লীজ নিতে পারিবে। কলকারখানার শৃঙ্খলা রক্ষা বাধ্যতামূলক হইল। ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ হইল। বেশী কাজ পাওয়ার জন্য অধিক মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। স্বর্ণমানের ভিত্তিতে নূতন মুদ্রা প্রচলিত হইল। ধর্ম্ম এবং পরিবারবন্ধন ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

নূতন অর্থনৈতিক পলিসিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হইল কিন্তু সোসালিজমের মূলনীতি হইতে উহা বিচ্যুত হইল না, বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শও লেনিন ত্যাগ করিলেন না।

মার্কসবাদ

কার্ল মার্কসের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদ "কাল্পনিক" (Utopian Socialism) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উহার আদর্শ ছিল কিন্তু কর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। মার্কস সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে পৌছিবার উপযুক্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন এবং উহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন। উহা "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ" (Scientific Socialism) নামে গৃহীত হইয়াছে।

মার্কসবাদের মূলসূত্র তিনটি—(১) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, (২) শ্রেণীসংগ্রাম এবং (৩) শ্রমমূল্য। তাঁহার মতে, মানবসমাজের সব কিছু

ঘাত-প্রতিঘাতের মূল কারণ অর্থনৈতিক ; অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরাজিতের মনোভাব হইতে ধর্ম্ম, কলা, দর্শন প্রভৃতির উদ্ভব হয় ; ইতিহাস বলিতে বুঝায় শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্কসের মতে অত্যাচারিত কর্ত্তৃক অত্যাচারীকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়াছে। ক্রমে উহা আরও তীব্র এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত ধনিক ও সর্ব্বহারার যুগান্তকারী সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইবে।

মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে বাঁচিতে হইলে পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে, পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে এমন কতকগুলি সম্পর্কের মধ্যে তাহাকে আসিয়া পড়িতে হইবে যার উপর সব সময় তার কর্তৃত্ব থাকিবে না। উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করিবে। এইজন্য মার্কস বলিয়াছেন,—বাস্তবজীবনে উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মজীবনের সাধারণ চরিত্র নির্ভর করিবে।

মার্কসের মতে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া মানুষ সামাজিক সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ফেলিবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ফিউডাল লর্ড এবং হাতে চালানো কারখানা একসঙ্গে চলিতে পারিবে। কিন্তু ষ্টীম ইঞ্জিন আসিলে এমন সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেখানে সামন্ত প্রভুর কর্তৃত্ব থাকিবে না, কারখানার মালিকের প্রভুত্ব প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে। উহাদের প্রয়োজন অনুসারে নীতি আদর্শ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং মানবসমাজে নীতি বা আদর্শ বাঁধা-ধরা বা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ঐগুলিও বদলাইতে থাকিবে।

১৮৪৮-এ প্রকাশিত "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো"তে মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখাইয়াছিলেন যে বুর্জ্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলে সমস্ত রূপ বদলাইয়া যাইবে।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় মার্কস হেগেলকে অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। দ্বন্দ্ববাদ (dialecticism) উভয়ে মানিয়া নিয়াছিলেন।

দ্বন্দ্ববাদ মোটামুটি এই : প্রত্যেকটি জিনিষ যখন আমরা বিচার করি তখন তাহাকে বলি থিসিস। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি জিনিষ যে অবস্থায় থাকে তাহাই এই থিসিস। উহার একটি বিপরীত দিক থাকে, তাহাকে বলা হয় এন্টি-থিসিস। এই দুইয়ের সংঘাত সব সময় চলিতেছে, উভয়ের সংঘাতে উভয় বস্তু লোপ পাইয়া এক নূতন জিনিষ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা হইতেছে সিন্‌থিসিস। সিন্‌থিসিসরূপে যাহা এই মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইল তাহা তখন হইয়া দাঁড়াইল থিসিস্ কারণ কোন বস্তু বা ব্যবস্থা স্থায়ী নয়; সবই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং আবার আসিল উহার এন্টি-থিসিস এবং আবার আসিল সিন্‌থিসিস। এইভাবে চলিতে থাকিবে। হেগেল বলিলেন—এই সিন্‌থিসিস ঘটাইতেছে কে? উহা Universal Spirit, একটি অতীন্দ্রিয় বিশ্বজনীনভাব। মার্কস বলিলেন,—না, উহা হইতেছে অর্থনৈতিক শক্তি। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক শক্তি বা তাগিদ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

এইখান হইতে আসিল মার্কসের দ্বিতীয় মূলনীতি—শ্রেণী-সংগ্রাম। প্রাচীন হইতে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের ইতিহাস শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়। অত্যাচারী শোষককে চূর্ণ করিয়া শোষিতের মুক্তিলাভ—ইহাই ইতিহাস। মার্কস বলিয়াছেন, এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। শোষক ও শোষিতের চূড়ান্ত সংগ্রাম একদিন আসিবেই এবং সেদিন যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই মঙ্গল। উহাকে অগ্রসর হইয়া ডাকিয়া আনিতে হইবে। শ্রেণী সংগ্রাম হইবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাতিয়ার। শ্রমিকেরা যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের নিয়ন্তা না হইবে শ্রেণী সংগ্রাম ততদিন চলিতে থাকিবে। এই অবস্থা যখন আসিবে, তখনই সমাজের সকল লোক উৎপাদনে যোগ দিবে, সমাজ হইতে শোষণ, উৎপীড়ন, শ্রেণী-ভেদ লোপ পাইবে। সর্ব্বহারার ডিক্টেটরশিপ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাফল্য আসিতে পারে না।

মার্কসের তৃতীয় সূত্র শ্রমমূল্যনীতি হইতেছে এই,—সমস্ত উৎপাদনের মূল

সামাজিক বস্তু (Social Substance) হইতেছে শ্রম; প্রত্যেক দ্রব্য মূল্যবান হয় এইজন্য যে মানুষের শ্রমের ফলে উহা তৈরি হইয়াছে সামাজিক বস্তু বা শ্রম কম বেশী হওয়ার উপর মূল্য নির্ভর করে। মার্কস এই নীতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন,—কোন জিনিষ তৈরিতে শেষ যে শ্রম দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র তাহারই ভিত্তিতে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না; যে কাঁচামাল এবং যে যন্ত্র দিয়া উহা তৈরি হইয়াছে তাহার এবং কারখানার বাড়ীর ও যন্ত্রপাতির মূল্য এই হিসাবে ধরিতে হইবে। যথা,—একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা তৈরিতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম প্রযুক্ত হইয়াছে, শুধু ঐটুকু ধরিলেই চলিবে না, তার আগে তূলার চাষ, ইঞ্জিনের কয়লা বা তেল খনি হইতে তোলার এবং কারখানার বাড়ী, ইঞ্জিন, টাকু প্রভৃতি সব কিছু তৈরিতে যে শ্রম লাগিয়াছে, তাহাও হিসাব করিতে হইবে এবং সমস্ত শ্রম মিলাইয়া তবে সূতার উপর কত শ্রম প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্থির করিতে হইবে। যে শ্রম ক্রয়-বিক্রয় হয় মার্কস তাহাকে বলিতেছেন শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তির মূল্য নির্ভর করিবে দুইটি জিনিষের উপর—একটি দৈহিক, অপরটি সামাজিক বা ঐতিহাসিক। শেষ পর্য্যন্ত শ্রমমূল্য দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করিলেও তার সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উপেক্ষা করা যায় না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হইতেছে যত পারে মজুরী কমাইয়া শ্রমমূল্য সর্ব্বনিম্ন সীমায় নামাইয়া আনা। যে শ্রমমূল্য শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া মালিক আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাই বাড়তি মূল্য (Surplus value), উহাই শিল্পের বা বাণিজ্যের লাভ।

মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ কোন বিশেষ জাতি বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। উহা আন্তর্জ্জাতিক দর্শন, সর্ব্বদেশে উহার মূলনীতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

মুসোলিনী ও ফ্যাসিজম

ভার্সাই সন্ধির পর ইতালিতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সন্ধিতে ইতালির কোনই সুবিধা হইল না। একদিকে হতাশা, অপরদিকে অর্থ নৈতিক

দুর্দ্দশা,—ইতালির অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। কৃষক-বিদ্রোহ এবং কলকারখানায় ধর্ম্মঘট সুরু হইল। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ কমুনিষ্টরা নিতে আরম্ভ করিল। চাষীরা জমি এবং শ্রমিকরা কলকারখানা অধিকার করিল। প্রধানমন্ত্রী নিত্তি এবং তাঁর পরে জিওলিত্তি কেহই শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কমুনিষ্ট বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল।

বেনিতো মুসোলিনী একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করিলেন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ইউনিফর্ম্ম হইল কালো শার্ট এবং প্রতীক চিহ্ন হইল 'ফ্যাসেস' বা দড়ি দিয়া বাঁধা এক বাণ্ডিল কাঠি। এই প্রতীকের জন্য ইহাদের নাম হইল ফ্যাসিষ্ট পার্টি। ইহারা বিপক্ষ দলের উপর বলপ্রয়োগ করিত এবং সভার আগে জোর করিয়া ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইয়া প্রতিপক্ষের বক্তাদের সভায় আসা বন্ধ করিত।

ফাসিষ্ট পার্টি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। ১৯২২-এ মুসোলিনী সদলবলে রোম অভিযান আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ভাবিলেন এই শক্ত মানুষটিকে সঙ্গে পাইলে তাঁহার পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব হইবে। তিনি মুসোলিনীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। পাদ্রীরাও রাজার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেন। ১৯২২ হইতে মুসোলিনী হইলেন ইতালির ভাগ্য বিধাতা।

মুসোলিনীর আদর্শ ও কর্ম্মসূচী হইল এইরূপ—

(১) রাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বোচ্চ, সকল শ্রেণীর উর্দ্ধে।

(২) শৃঙ্খলা রক্ষা শুধু রাজনৈতিক কারণে নহে, নৈতিক দিক হইতেও সর্ব্বাধিক প্রয়োজন।

(৩) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকলেই রাখিতে পারিবে।

(৪) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা সকলে সমাজকে সমৃদ্ধ করিবে।

(৫) ধর্ম্মের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) পারিবারিক জীবন সহজ ও স্বচ্ছন্দ করিতে হইবে।

(৭) জন্মহার বাড়াইতে হইবে।

(৮) ভূমধ্যসাগরে ইতালির সর্ব্বোচ্চ অধিকার স্থাপন করিতে হইবে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুসোলিনী এই কয়টি কাজ করিতে পারিলেন—

(১) সমগ্র দেশে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠন ও চালু করিলেন এবং উৎপাদন বাড়াইলেন।

(৩) বড় বড় পতিত জমি উদ্ধার স্কীম সফল করিয়া চাষের জমি বাড়াইলেন।

(৪) বহু রাজপথ এবং সরকারী বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিলেন।

(৫) দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করিলেন।

মুসোলিনীর শাসনে জনসাধারণ এই কয়টিতে বঞ্চিত হইল—

(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রহিল না, উহার উপর সেন্সরশিপ বসিল।

(২) পার্লামেণ্টারী শাসন ও ব্যবস্থা উঠিয়া গেল।

(৩) শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অধিকার প্রত্যাহৃত হইল।

রাজার সহিত পোপের সুদীর্ঘ শত্রুতা মুসোলিনীর চেষ্টায় বন্ধ হইল, উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

১৯৩৯-এ মুসোলিনী নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। উহা ফাসিষ্ট সিণ্ডিকালিজম নামে অভিহিত। উহার মূল কথা এই :

স্থানীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি নিয়া গঠিত পার্লামেণ্টারি চেম্বার স্থলে "চেম্বার অফ ফাসিও এবং কর্পোরেশন" স্থাপিত হইল। দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিষয় হিসাবে ২২টি কর্পোরেশনে ভাগ করা হইল। খাদ্যশস্য, তেল, মদ, ফুল ও সব্জী, ফল, কাঠ, কাপড়, ধাতবদ্রব্য, কাগজ ও ছাপাখানা, জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ও বীমা, কলা ও রেশম প্রভৃতি বিষয়ক ২২টি কর্পোরেশন হইল। ফাসিষ্ট পার্টি এবং এই ২২টি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নিয়া চেম্বার বা পার্লামেণ্ট গঠিত হইল। প্রত্যেক কর্পোরেশনে মালিক এবং শ্রমিকের আলাদা সিণ্ডিকেট রহিল। উভয়েরই প্রতিনিধি মিলিতভাবে হইবে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি। ইহারাও ফাসিষ্ট পার্টির

লোক হইবে। পার্টির বাহিরের কেহ যাহাতে না ঢুকিতে পারে তার জন্য এই প্রতিনিধিদের নিয়োগে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হইল।

চেম্বারকে আইন প্রণয়নের বা গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইল না। উহা পরামর্শ সভা মাত্র হইয়া রহিল। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিল গবর্ণমেণ্টের হাতে। এই সময়ে চেম্বারে যে সমস্ত আইন পাশ হইত তার একটি নমুনা—"এই আইন হইল যে ইতালির আকাশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নীল।" মুসোলিনী নিজে হইলেন প্রধান মন্ত্রী এবং সব কয়টি বড় পোর্টফোলিও তাঁহারই হাতে রহিল।

দেশের আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পূর্ণ করিবার পর মুসোলিনী সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। ১৯৩৫-এ তিনি আবিসিনিয়া জয় করিলেন। এই ঘটনায় ইতালি এবং বৃটেনের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ঘটিল। জাতিসঙ্ঘ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করিল। এই চাপে ইতালি জার্ম্মেনী এবং জাপানের সঙ্গে গিয়া যোগ দিল। তখন স্পেনে সোশালিষ্টদের সঙ্গে ফাসিষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মেনী ফ্রাঙ্কোকে এবং রাশিয়া সোসালিষ্টদের সমর্থন করিতেছিল। মুসোলিনী জার্ম্মেনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ফ্রাঙ্কোর পক্ষাবলম্বন করিলেন। ১৯৩৯-এ ইতালি আবিসিনিয়া অধিকার করিল। ১৯৪০-এর জুন মাসে ইতালি জার্ম্মেনীর পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল।

যুদ্ধোত্তর জার্ম্মেণী

যুদ্ধবিরতির দুইদিন আগে জার্ম্মেণীতে সোসালিষ্ট বিপ্লব সুরু হইয়া গেল। বিপ্লবের নেতৃত্ব করিলেন কার্ল লিবকেনেক্টে এবং রোজা লুক্সেমবুর্গ। ইঁহারা সোভিয়েট আদর্শে রিপাবলিক ঘোষণা করিলেন। ঐ দিনই কাইজার হলাণ্ডে পলায়ন করিলেন। তখন ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলার ছিলেন এবার্ট। রাশিয়ান সোভিয়েটের অনুকরণে বার্লিনে একটি শ্রমিক ও সৈন্যদের কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল। এই কাউন্সিল সোসালিজম চাহিয়াছে কিন্তু বিপ্লব চায় নাই। তাহারা এবার্টকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করিল। হিণ্ডেনবুর্গ তখন

সৈন্যদলের অধিনায়ক। এবার্ট এবং হিণ্ডেনবুর্গ সঙ্কল্প করিলেন বিপ্লব ঠেকাইতে হইবে; এবার্টের পরামর্শে শ্রমিক ও সৈন্যদের কাউন্সিল গণপরিষদ নির্ব্বাচনে রাজী হইল। বিপ্লবপন্থী এবং বিপ্লববিরোধী সোসালিষ্টদের মধ্যে প্রচণ্ড হানাহানি হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শেষোক্ত দলই জয়ী হইল। কার্ল লিবকেনেক্ট এবং রোজা লুক্সেমবুর্গ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে নিহত হইলেন।

১৯১৯-এর ১৯শে জানুয়ারী গণপরিষদ নির্ব্বাচন হইল। হ্বাইমার সহরে গণপরিষদ বসিল। উহার নেতৃত্ব করিলেন এবার্ট এবং হিণ্ডেনবুর্গ। সংবিধান প্রণীত হইল। ইহাই হ্বাইমার সংবিধান নামে খ্যাত। জার্ম্মেণী রিপাবলিক ঘোষিত হইল। প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইলেন এবার্ট। রিপাবলিক গণতান্ত্রিক হইল কিন্তু সোসালিষ্ট হইল না।

১৯২৬-এর ১৬ই অক্টোবর লোকার্ণো সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। জার্ম্মেণী আলসাস লোরেণ হস্তান্তর স্বীকার করিয়া লইল এবং ফ্রান্স বা বেলজিয়ামের কোন অংশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইতালি লোকার্ণো সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তি বলেই জার্ম্মেণী জাতি সঙ্ঘে যোগ দিল এবং উহাতে স্থায়ী আসন লাভ করিল। লোকার্ণো সন্ধিতে রাশিয়া ভীত হইল। রাশিয়া ভাবিল পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দের সোভিয়েট বিরোধী দলে জার্ম্মেণীও তবে যোগ দিতে চলিয়াছে। রাশিয়ার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য জার্ম্মেনীর বৈদেশিক মন্ত্রী ষ্ট্রেসম্যান ১৯২৬-এর ২৪শে এপ্রিল রাশিয়ার সঙ্গে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। লোকার্ণো চুক্তির পর জার্ম্মেনীতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন আসিতে লাগিল। জার্ম্মেনীর-শিল্প বাণিজ্য পুনর্গঠিত হইল। আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হইল। মজুরী বাড়িল। বেকার সমস্যা কমিল। তবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিল।

১৯২৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত জার্ম্মেণীতে কোন একটি দল গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিল না। কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট চলিতে লাগিল। তখন সেখানে

তিনটি দল প্রধান, তিনটিই বুর্জ্জোয়া দল—কেন্দ্রীয় দল, ডেমোক্রাট দল এবং জনতা দল (People's Party)। বিরোধীদলে রহিল কমুনিষ্ট, সোসাল ডেমোক্রাট এবং জাতীয়তাবাদী দল। ১৯২৮-এর নির্ব্বাচনে সোসাল ডেমোক্রাট এবং কমুনিষ্টরা আরও বেশী ভোট পাইল।

১৯২৯-এ নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে বিপর্য্যয়ের সঙ্গে মন্দার বাজার স্থরু হইল। উহার ধাক্কা বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল জার্ম্মেণীতেও পৌছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য কমিয়া গেল। বেকার সমস্যা দ্রুত বাড়িতে লাগিল। মজুরী কমিতে লাগিল। গ্রামে এবং সহরে সমান দুর্দ্দশা দেখা দিল।

হিটলার এই স্থযোগ গ্রহণ করিলেন। হিটলার ছিলেন প্রথম যুদ্ধে কর্পোরাল।

হিটলার ও তৃতীয় রাইখ

যুদ্ধের পর হিটলার বাভেরিয়ায় চলিয়া গেলেন। বাভেরিয়া তখন মধ্য ইউরোপে কমুনিষ্ট বিপ্লবের একটি বড় কেন্দ্র। বাভেরিয়া তেমনি প্রতি-বিপ্লবেরও কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রকার কমুনিষ্ট বিরোধী, সোসালিষ্ট বিরোধী, রিপাবলিকান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন বাভেরিয়ায় আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রকার গুপ্ত সমিতিতে বাভেরিয়া ছাইয়া গেল। ইহারই মধ্যে একটি দলের নাম ছিল জার্ম্মাণ শ্রমিক দল (German Workers' Party)। ১৯১৯-এ হিটলার এই পার্টিতে যোগ দিলেন এবং উহার সপ্তম সদস্য হইলেন। তার আগে এই "পার্টি"র সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ছয় জন। ১৯২০-তে ইহারই নাম হইল ন্যাশন্যাল সোসালিষ্ট জার্ম্মাণ ওয়ার্কার্স পার্টি। ইহারই সংক্ষিপ্ত নাম নাৎসি পার্টি। নাৎসি পার্টির ব্রাউনশার্ট বাহিনী অল্পদিনেই বিরাট হইয়া উঠিল।

গণতান্ত্রিক হ্বাইমার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই দল সংগ্রাম ঘোষণা করিল। ১৯২৩-এ হিটলার মিউনিক সহরে ব্রাউন শার্ট বাহিনীর এক সমাবেশ করিলেন। প্লাটফর্ম্মের উপর লাফাইয়া উঠিয়া রিভলভার তুলিয়া ছাদের দিকে গুলি ছুঁড়িয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, এই আমাদের জাতীয় বিপ্লব আরম্ভ

হইল। ইহাই "বিয়ার হল পুশ" নামে খ্যাত। পুলিশ অল্পদিনেই শৃঙ্খলা স্থাপন করিল। হিটলার পাঁচবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। জেলে বসিয়া তিনি তাঁর আত্মজীবনী "মাইন কাম্‌ফ" অথবা "আমার সংগ্রাম" লিখিলেন। এক বৎসর পরেই হিটলার মুক্তিলাভ করিলেন।

১৯২৫-শে বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে জার্ম্মেণীর পুনর্গঠন আরম্ভ হইলে নাৎসিদের প্রভাব একেবারে কমিয়া গেল। ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কায় জার্ম্মেণীর অর্থনৈতিক জীবনে আবার বিপর্য্যয় আসিলে হিটলার আবার শক্তি সঞ্চয় আরম্ভ করিলেন।

মন্দার বাজারে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল জার্ম্মেণী। সমস্ত বিদেশী ঋণ প্রত্যাহৃত হইল। ফলে কলকারখানা বন্ধ হইল। ৬০ লক্ষ লোক বেকার হইল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কমুনিষ্ট প্রভাব বাড়িতে লাগিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝিল কমুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা গেলে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইবে। দেশের সকল দুর্দ্দশার মূল ভার্সাই সন্ধির উপর সমস্ত লোক চটিয়া রহিল।

এই কমুনিষ্ট বিরোধী এবং ভার্সাই সন্ধি-বিরোধী মনোভাবকে হিটলার কাজে লাগাইলেন। তিনি এই দুর্দ্দশার দায়িত্ব চাপাইলেন হ্বাইমার রিপাবলিকের ঘাড়ে। তিনি বলিলেন যাহারা খাঁটি জার্ম্মাণ তাহাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে; জার্ম্মাণ জাতি মরিবার বা অপরের দাসত্বের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহারা সমগ্র বিশ্ব শাসন করিবার ক্ষমতা রাখে। দেশের দুর্দ্দশার একটি বড় কারণ ইহুদী সম্প্রদায়—এই ঘোষণার দ্বারা তিনি এক প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলেন।

১৯৩০-এ রাইখষ্টাগ নির্ব্বাচন হইল। হিটলারের নাৎসি পার্টি ১০৭টি আসন অধিকার করিল। তার আগের নির্ব্বাচনে ইহারা পাইয়াছিল ১২টি মাত্র আসন। কমুনিষ্টরা পাইল ৭৭ এবং সোসাল ডেমোক্রাটরা ১৪৩। অর্থনৈতিক মন্দা ও এবং তজ্জনিত দুর্দ্দশা থামিল না। ১৯৩২-এ আবার নির্ব্বাচন হইল। এবার নাৎসিরা পাইল ২৩০টি আসন। রাইখষ্টাগে

তাহারা মেজরিটি না পাইলেও সর্ব্ববৃহৎ দলে পরিণত হইল। একশ্রেণীর জমিদার, রাইনল্যাণ্ডের বৃহৎ ইস্পাত কারখানার মালিক এবং প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় হিটলারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯৩৩-এর ৩০শে জানুয়ারী সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হিটলার চ্যান্সেলার হইলেন।

অল্পদিন পরেই হিটলার নূতন নির্ব্বাচন ঘোষণা করিলেন। নির্ব্বাচনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাইখষ্টাগে আগুন লাগিল। নাৎসিরা বলিল কমুনিষ্টরা আগুন দিয়াছে, কমুনিষ্টরা বলিল নাৎসিরা নিজেরা আগুন দিয়া তাহাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে। হিটলারের উদ্দেশ্য সফল হইল। এই অগ্নিকাণ্ডে কমুনিষ্টদের উপর দেশের লোক ভীষণ চটিয়া গেল। হিটলার শতকরা ৪৪টি ভোট পাইলেন। তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া নিজে ডিক্টেটরের ক্ষমতা হাতে নিলেন। হ্বাইমার সংবিধান বাতিল হইয়া গেল। নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম হইল তৃতীয় রাষ্ট্র বা থার্ড রাইখ। হিটলার বলিলেন, থার্ড রাইখ সহস্র বৎসর টিঁকিয়া থাকিবে।

জার্ম্মেনীর জাতীয় জীবনে বৃহৎ পরিবর্ত্তন আসিল। দেশ হইতে ইহুদী বিতাড়ন সুরু হইল। শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রহিল কিন্তু সমস্ত শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় কণ্ট্রোল বসানো হইল। ১৯৩৬-এ শিল্পোন্নতির জন্য গোয়েরিং-এর নেতৃত্বে একটি চতুর্ব্বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হইল। বিদেশ হইতে যে সব অত্যাবশ্যক কাঁচামাল আমদানী করিতে হইত, জর্ম্মান রাসায়নিকরা তাহার বিকল্প দেশেই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া দিলেন। কৃত্রিম রবার, প্লাষ্টিক, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হইতে লাগিল। দুর্ব্বল দেশগুলি হইতে একরূপ জোর করিয়া গম, কাঠ, তেল প্রভৃতি আমদানী হইতে লাগিল। গোয়েরিং প্লানের পর জার্ম্মেনী পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিদের সঙ্গে সমান হইয়া উঠিল।

নাৎসিবাদ

হিটলার যখন চ্যান্সেলার হইলেন হিণ্ডেনবুর্গ তখন প্রেসিডেন্ট। কমুনিষ্টদের বাহিরে রাখিয়া রাইখষ্টাগে আইন পাশ করাইয়া হিটলার সংবিধান বাতিল

করিলেন এবং নিজের হাতে ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। প্রাদেশিক আইনসভাও বাতিল হইল। গবর্ণরেরা হইলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। ১৯৩৪-এর আগষ্টে হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেণ্ট পদও অধিকার করিলেন। তাঁহার উপাধি হইল—ফুরের। গণভোটে হিটলারের এই কাজ সমর্থিত হইল। তিনি শতকরা ৮৮ ভোট পাইলেন।

কমুনিষ্ট এবং সোসালিষ্ট দল বেআইনী ঘোষিত হইল। ক্যাথলিক এবং রাজতন্ত্রী দলগুলিও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। নাৎসি পার্টিকেই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

প্রচার কার্য্যের ভার দেওয়া হইল গোয়েবেলসের উপর। ১৯৩৩-এর নভেম্বরের নির্ব্বাচনে কোন বিরোধী দল রহিল না। নাৎসি দল শতকরা ৯২টি ভোট পাইল। ৬৬১ জনের পার্লামেণ্টে নাৎসিদলের বাহিরের লোক রহিলেন মাত্র ২ জন।

১৯৩৪-এ হিটলার 'পার্জ্জ' আরম্ভ করিলেন। নাৎসি দলে যাঁহারা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা নিহত হইলেন।

নাৎসীবাদের প্রথম সূত্র হইল জাতিগত পবিত্রতা। তাহাদের বিশ্বাস, নর্ডিক জাতির ভবিষ্যৎ অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণ, তাহারা বিশ্বশাসনে অধিকারী। অপবিত্র ইহুদীদের স্থান জার্ম্মেনীতে নাই। সুরু হইল ইহুদী বিতাড়ন। এক ঈশ্বরের অধীনে সব মানুষ সমান, এক শাশ্বত ন্যায় বিচার এবং সহযোগিতার নীতি সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে—নাৎসীবাদ ইহা মানিল না। তাহারা বলিল—খৃষ্টধর্ম্ম এবং ইহুদী ধর্ম্মের এই আদর্শ পবিত্র নর্ডিক জাতি মানিতে পারে না; তাহাদের সঙ্গে সকলে সমান নয় এবং তাহাদের নেতার স্থান সকলের উর্দ্ধে।

নাৎসিবাদের কোন আদর্শ ছিল না। উহাকে কতকগুলি শ্লোগানের সমষ্টি বলা চলে। তন্মধ্যে প্রধান এই কয়টি—

(১) কমুনিজম উচ্ছেদ,

(২) ইহুদী বিতাড়ন,

(৩) আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা অস্বীকার,

(৪) গৃহকোণে নারীদের স্থান নির্দ্দেশ এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নারীদের বহিষ্কার,

(৫) জর্ম্মান জাতির আর্য্যত্ব দাবী,

(৬) বেকার সমস্যার অবসান,

(৭) শ্রেণী সংযুক্তি (Class amalgamation),

(৮) অস্ত্রসজ্জা এবং সামরিক শক্তি অর্জ্জন।

অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে নাৎসীরা প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। বেকার সমস্যা দূর করিতে পারিয়াছিল।

নাৎসীবাদ কোন বিরোধী মতবাদ সহ্য করে নাই। ব্যক্তিগত অত্যাচার তো করিয়াছেই, বহু ক্ষেত্রে বইগুলিও পোড়াইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ

ইতালি, জার্ম্মেনী এবং জাপানে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের ফলে এই তিন দেশই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করিল। জাতিসঙ্ঘে আমেরিকা যোগ দিল না, জার্ম্মেনী এবং জাপান সরিয়া গেল। তার উপর বৃটেন এবং ফ্রান্সের বিরোধেও জাতিসঙ্ঘ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে ১৯২৩-এ মুসোলিনী জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ফু দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের পিছনে জার্ম্মেনী এবং জাপানেরও সমর্থন রহিল। এক দিকে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে দেশে দেশে অসন্তোষ, অপরদিকে অসন্তুষ্ট জনসাধারণের উপর রুশবিপ্লবের প্রভাব এবং তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় —এই সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ এই কয়টি—

(১) ১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল। জাতিসঙ্ঘ বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক মিশন পাঠাইল। লিটন এই

ঘটনাকে বিনা কারণে আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করিলেন। জাতিসঙ্ঘ প্রতিবাদ করিল কিন্তু জাপানকে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগে বাধ্য করিতে পারিল না। জাপান লিটন রিপোর্ট মানিতে অস্বীকার করিল এবং ১৯৩৩-এর মার্চ্চে জাতিসঙ্ঘ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২) হিটলার অস্ত্রসজ্জা সুরু করিলেন। ১৯৩৩-এর অক্টোবরে জার্ম্মেনী জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিল। ১৯৩৫-এর ১৬ই মার্চ্চ হিটলার ভার্সাই সন্ধি অস্বীকার করিলেন। ১৭ই এপ্রিল জাতিসঙ্ঘ হিটলারের এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিল। জার্ম্মেনী গ্রাহ্য করিল না, অস্ত্রসজ্জা বাড়াইতে লাগিল। জর্ম্মান অস্ত্রসজ্জায় ভীত হইয়া ফ্রান্স ১৯৩৫-এর মে মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে জর্ম্মান আক্রমণে মিলিতভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সন্ধি করিল। জুনমাসে বৃটেন জার্ম্মেনীর সঙ্গে নৌবহর নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্ধি করিল। উহাতে ঠিক হইল জার্ম্মেনী বৃটেনের এক তৃতীয়াংশের বেশী যুদ্ধ জাহাজ এবং বৃটিশ সাবমেরিণের শতকরা ৬০-এর বেশী সাবমেরিন তৈরি করিবে না। এই সন্ধিতে একটি সর্ত্ত রহিল যে যদি জার্ম্মেনী মনে করে যে বিশেষ (exceptional) কোন কারণ দেখা দিয়াছে তবে বৃটেনের সমান সাবমেরিণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। ভার্সাই সন্ধিতে রাইনল্যাণ্ড নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ১৯৩৬-এর মার্চ্চে হিটলার সেখানে সৈন্য পাঠাইলেন। বৃটেন এবং ফ্রান্স মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই চুপ করিয়া গেল।

(৩) ১৯৩৫-এ মুসোলিনী ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব দেখিয়া মুসোলিনী সেখানে বিষাক্ত বাষ্প প্রয়োগ করিলেন। ইথিওপিয়া আত্মসমর্পণ করিল। ইতালির রাজাকে ইথিওপিয়ার সম্রাট ঘোষণা করা হইল। জাতিসঙ্ঘ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—ইতালি উহার সদস্য ইথিওপিয়া আক্রমণ করিয়া লীগের সন্ধিপত্র ভঙ্গ করিয়াছে। ১৯৩৫-এর ১১ই অক্টোবর জাতিসঙ্ঘ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিল। এই ঘোষণায় এত ফাঁক রহিল যে অবরোধ ব্যর্থ হইল। বৃটেন এবং ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইয়াও সুয়েজ-খাল দিয়া ইতালির

সৈন্য ও সমর সম্ভার যাতায়াতে বাধা দিল না। ইথিওপিয়ার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ ইতালিকে ঘায়েল করিতে পারিল না। ইহাতে জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা খুব কমিয়া গেল।

(৪) ১৯৩৬-এর জুলাইয়ে স্পেনে গৃহযুদ্ধ স্থরু হইল। ফ্যাসিষ্ট দলকে জার্ম্মেনী এবং ইতালি সাহায্য দিতে আরম্ভ করিল। সোসালিষ্ট পক্ষকে সোভিয়েট রাশিয়া সাহায্য করিল কিন্তু উহাদের মত বেপরোয়াভাবে করিতে পাবিল না, ভয়ে ভয়ে করিল। বৃটেন এবং ফ্রান্স সোসালিষ্টদের নামমাত্র সাহায্য দিল। ১৯৩৯-এ গৃহযুদ্ধ শেষ হইল। ফাসিষ্টরা জয়লাভ করিল।

(৫) ১৯৩৬-এর অক্টোবরে হিটলাব এবং মুসোলিনী পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। ইহাই রোম বার্লিন এক্সিস নামে খ্যাত। এই সন্ধির পর মুসোলিনী দাবী করিলেন যে গত শতাব্দীতে ইতালির ঐক্য সংগ্রামে ফ্রান্সকে নাইস এবং সাভয় দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফেবৎ দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপ, আফ্রিকার টিউনিস ইতালিকে দিতে হইবে। ১৯৩৯-এর ৭ই এপ্রিল মুসোলিনী আলবেনিয়া আক্রমণ করিলেন। অল্পদিনেই আলবেনিয়া জয় সম্পূর্ণ হইল।

(৬) ১৯৩৮-এর মার্চ্চে হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন এবং উহাকে জার্ম্মেনীর সহিত সংযুক্ত করিলেন। জাতিসঙ্ঘ বাধা দিতে পারিল না।

(৭) ১৯৩৮-এর ১২ই সেপ্টেম্বর চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থদেতেন জর্ম্মানদের দুর্দ্দশার প্রতিবাদে হিটলার এক বক্তৃতা দিলেন। সারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় গোলমাল স্থরু হইল। গবর্ণমেণ্ট সামরিক আইন জারী করিলেন। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে মিউনিকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের উদ্যোগে এক চতুঃশক্তি বৈঠক বসিল। হিটলার, মুসোলিনী, চেম্বারলেন এবং দালাদিয়ের উপস্থিত রহিলেন। সম্মেলনে রাশিয়াকে ডাকা হইল না। মিউনিক বৈঠকে হিটলার জয়ী হইলেন। স্থদেতেন চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে কাটিয়া জার্ম্মেনীকে দেওয়া হইল। আরও কয়েকটি চেক এলাকা কাটিয়া পোলাণ্ডকে

দেওয়া হইল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তের পাহাড়গুলি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় তার এমন অবস্থা হইল যে দেশরক্ষা অসম্ভব হইল। কয়েক মাস বাদে হিটলার ঘোষণা করিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের ভাগ্য ফুরেরের হাতে তুলিয়া দেওয়াই নিরাপদ হইবে। ১৯৩৯-এর মার্চ্চে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ায় সৈন্য পাঠাইলেন। বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া জর্ম্মান "রক্ষাধীনে" গেল। শ্লোভাকিয়াও জার্ম্মেনীকে তার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে "অনুরোধ" করিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার এক প্রান্তে রুমেনিয়ানরা স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। হাঙ্গেরী আসিয়া ঐ এলাকা দখল করিল। হিটলার হাঙ্গেরীর এই আক্রমণ অনুমোদন করিলেন। মাসারিকের চেকোশ্লোভাকিয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। উহার স্বাধীনতাও লুপ্ত হইল।

(৮) পোলাণ্ডকে ডানজিগ বন্দরে যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়ার জন্য পূর্ব্ব প্রুশিয়া দুই টু বা করিয়া উহাব ভিতর দিয়া করিডোর সৃষ্টি হইয়াছিল। ডানজিগ বন্দর সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মান সহর তৎসত্ত্বেও উহাকে জার্ম্মেনী হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া ফ্রী সিটি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হিটলার পোলিশ করিডোর এবং ডানজিগ জার্ম্মেনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ভয়ে পোলাণ্ড ১৯৩৯-এর এপ্রিলে বৃটেনের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের সন্ধি করিল। হিটলার বুঝিলেন বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া একযোগে বাধা দিলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি কঠিন হইবে। রাশিয়ার মন বুঝিবার জন্য বৃটেন এবং ফ্রান্স ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মকালে মস্কোতে মিশন পাঠাইল। কিন্তু বেশী উৎসাহ দেখাইল না। হিটলার রিবেনট্রপকে মস্কো পাঠাইলেন। ষ্টালিনকে তিনি পোলাণ্ডের একাংশ অধিকারের লোভ দেখাইলেন। এই এলাকা প্রথম যুদ্ধের পর রাশিয়া হইতে কাটিয়া পোলাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল। ২৩শে আগষ্ট ১৯৩৯ তারিখে রুশ-জর্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই হিটলার ষ্টালিন সন্ধির সংবাদে সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। সকলেই বুঝিল—যুদ্ধ অনিবার্য।

এক সপ্তাহ পরে—১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের সৈন্য পোলাণ্ডে ঢুকিল। রুশ সৈন্য আসিয়া পোলাণ্ডের অপরার্দ্ধ অধিকার করিল। ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।